ভেদাভেদের কথাসাহিত্য

গৌতম ঘোষদস্তিদার

২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০০৪

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
সুব্রত চৌধুরী

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা ৭০০ ০০৪

ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষদস্তিদার
প্রতিমা ঘোষদস্তিদার
পিতৃমাতৃস্মৃতিধার্যেষু

লেখকের অন্য বই

ক বি তা

পাপকথা
অপেক্ষার দিনরাত
দুঃখের মতো বিকেল
নির্বাচিত কবিতা

কা ব্য না ট ক

নারীর ভিতরে নারী

প্র ব ন্ধ

সিনেমার সুখদুঃখ
মেঠো ইঁদুরের চোখ
কবিতার মায়াপাশ

উ প ন্যা স

মধ্যবর্তী শূন্যতা
অদ্ভুত আঁধার
অসুখের সময়
ধর্ষণের পরে

স ম্পা দ না

গল্পের ভালবাসা
রক্তমাংসের কবিতা
প্রেমের কবিতা
নিজের জীবন, বীজের জীবন

অ ন্য গ দ্য

মানুষের মৃত্যু হলে
কৃত্তিবাসের আড্ডা (সম্মিলিত)

ভেদাভেদের কথাসাহিত্য

আলবেরুনি বলেছিলেন, হিন্দুরা কখনও ধর্মের জন্য প্রাণ দেয় না। কিন্তু, আমরা দেখেছি, পরবর্তী সময়ে বারবার হিন্দু-মুসলমানের রক্তে ভিজে গিয়েছে এ-দেশের মাটি। সে-জন্য ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদকে খুব অনায়াসে দায়ী করা গেলেও, সে-বীজ আসলে সুপ্ত ছিল মানুষেরই মনে। গোষ্ঠীপতি, রাজ্য, রাষ্ট্র কায়েমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই বীজকে বিষবৃক্ষের বিস্তার দিয়েছে। সাধারণভাবে সারা পৃথিবীর ইতিহাস এ-ক্ষেত্রে একই সুতোয় বাঁধা।

বিপরীতে, আমরা দেখেছি, সাহিত্য কখনও এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। সহিতত্ব থেকে যেহেতু সাহিত্যের প্রকল্পনা, সেহেতু মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কগত দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বই সাহিত্যের বিভাব-অনুভাব। বাংলা সাহিত্য এই মূলসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ধর্মীয় শাখা-প্রশাখার প্রযত্নে হলেও তা প্রবল নৈর্ব্যক্তিকতায়, অসীম অসাম্প্রদায়িকতায়, মানবতার চূড়ান্ত রূপায়ণে আজও সমুজ্জ্বল।

বাংলা-কথাসাহিত্যে-বিধৃত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্বরূপটির সন্ধান করেছি আমরা এই গ্রন্থে। প্রসঙ্গত সেই সম্পর্কের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষিতটিও বুঝে নিতে চেয়েছি আমরা। কথাসাহিত্যের আধুনিকতা বোঝার চেষ্টায় পূর্ববর্তী সাহিত্যের শিকড়ও খুঁজতে হয়েছে। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) থেকে তসলিমা নাসরিন (১৯৬২) পর্যন্ত সুবিস্তৃত সময়সীমায় কথাসাহিত্যে-প্রতিফলিত হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্কের ভেদ-অভেদ-চালিকাশক্তির অন্বেষণ বিন্যস্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। এখানে লেখকের ভূমিকা নিছকই সূত্রধরের।

আমাদের আলোচনা সীমায়িত রয়েছে কেবল পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধিতে। বাংলাদেশের লেখক তসলিমা নাসরিন এবং ইমদাদুল হক মিলনের অনুরূপ-বিষয়-সমৃদ্ধ এপার-বাংলা-থেকে-প্রকাশিত দুটি উপন্যাস ও একটি গল্প-সঙ্কলককেই কেবল আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই আলোচনাটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি-মন্ত্রকের 'সিনিয়র ফেলোশিপ' প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়ার সময় স্বভাবতই অনেক পরিবর্ধন-পরিমার্জন করা হয়েছে। তবু অপূর্ণতার আক্ষেপ থাকলই।

যাঁদের আন্তরিক সহায়তায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হল, তাঁদের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী, কৃতজ্ঞ। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক অনুপকুমার মাহিন্দরকে, এ-রকম-একটি বাণিজ্য-সম্ভাবনারহিত গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

ভেদাভেদের কথাসাহিত্য

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

পূর্ব-ভারতের একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখায়, হাজার বছরেরও বেশি সময়সীমায়, বাংলা-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে-জীবনবোধ ও ঐতিহ্য বিস্তারিত হয়েছে, তার শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞান হল বাংলাসাহিত্য। কালের অনিবার্য প্রভাবে রাজপ্রাসাদ, মন্দির-মঠ-মসজিদ একসময় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে; বিভিন্ন যুগের বিবিধ রাজনৈতিক পরাক্রম, সমাজজীবনের নানা স্তর-পরম্পরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু, প্রায় অবিনশ্বরভাবে, বাঙালির সুপ্রাচীন সাহিত্যকীর্তি, অনেকাংশেই, রক্ষা পেয়ে গিয়েছে কালের করাল থাবা থেকে। বাঙালি গবেষকরা এ-পর্যন্ত যে-বিপুল পুথিসম্ভার উদ্ধার করেছেন, গভীর অধ্যবসায়ে তার পাঠোদ্ধার করেছেন, লিখেছেন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তা আমাদের কাছে এক মহান প্রাপ্তি বলে বিবেচিত হয়। সাহিত্যের আধারে আমরা যেমন, এই আধুনিক সময়ে, বুঝে নিতে পারি আমাদের সাহিত্যকীর্তির বিস্তার, চিনে নিতে পারি তার গভীর-প্রোথিত শিকড়; তেমনই জেনে যাই সে-সময়ের সামাজিক বিন্যাস, তার প্রবহমান গতি-প্রকৃতি। কেননা, যুগে-যুগে সাহিত্যেই প্রতিফলন ঘটেছে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও মানুষের চারিত্র্য। রাজনীতি-তথা-রাজায়-রাজায় যুদ্ধবিগ্রহের বৃত্তান্ত কিংবা প্রজা-পীড়ন ও রাজ-মহিমা ইতিহাসের বিবর্ণ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ থাকলেও, তা নিছক মৃত ঘটনার বিবরণ মাত্র। কেননা, সেখানে বাঙালি-জীবনের সামগ্রিক বিস্তার, তার চিন্তা-চেতনার সম্যক পরিচয় একেবারেই দুর্লক্ষ। কিন্তু, সাহিত্য যেহেতু সমাজের গভীরতর দর্পণ, সেহেতু পুথি-নির্ভর সেই সাহিত্যের উজ্জ্বল উদ্ধার আমাদের দেখিয়েছে বাঙালি জীবনের মহামহিম চিত্র—ঐতিহ্যের সেই উদ্ধৃতি আমাদের সমৃদ্ধতর করেছে, আমরা যেতে পেরেছি আধুনিকতার বিস্তারে।

কিন্তু সেই ঐতিহ্য সমকালে অতিক্রম করেছে নানা কণ্টকাকীর্ণ পথ। বাংলার ইতিহাস বারবার বিভিন্ন রাজাধিপত্যের বশীভূত হয়েছে। ফলে, স্বভাবতই, বাংলা সাহিত্যও, প্রাচীন ও মধ্যযুগে, বিভিন্ন রাজন্যবর্গের অধীনস্থ হয়েছে। বাঙালির সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবন যেমন রাজবংশের ইচ্ছানুসারে প্রভাবিত হয়েছে, সাহিত্যেও লেগেছে তার পরাক্রমী প্রভাব। পর্যায়ক্রমে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-যুগে রাজধর্ম যে-ভাবে সমাজ-জীবনকে বশীভূত করেছে, তেমনই বাংলার সাহিত্যও সেই প্রভাবকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি।

আর্য-ইতিহাসে বাংলা ও বাঙালির—পূর্বজনবাসী গৌড়-বঙ্গ-সূহ্ম-সমতটের তেমন সশ্রদ্ধ উল্লেখ নেই। এমনকী, প্রাচীন আর্য-গ্রন্থে আমরা অঙ্গ-বঙ্গবাসী আর্যেতর জনগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা ও বীতরাগ বিচ্ছুরিত হতেই দেখেছি। বস্তুত, সে-সময় 'দেশোঽনার্য-নিবাসঃ' জনপদে এলে আর্যরা পতিত হতেন। তাঁদের চিহ্নিত করে 'ব্রাত্যস্তোম' যজ্ঞ করার বিধানও ছিল। সেই যজ্ঞের ফলে তাঁদের ব্রাত্যভূমিতে আসার প্রায়শ্চিত্ত হত। তাঁরা ফের আর্যমণ্ডলে ঠাঁই পেতেন।

অবশ্য ক্রমশ এই অবস্থার পরিবর্তনও হল। বঙ্গ-জনগোষ্ঠীর উল্লেখ দেখা গেল পাণিনি-

পতঞ্জলির গ্রন্থে, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে, রামায়ণ-মহাভারত এবং বৌদ্ধ-জৈনগ্রন্থে। এই উল্লেখে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি ছিল। বস্তুত, উত্তরাপথের আর্য-সংস্কার, সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য-স্মৃতি-সংহিতার প্রভাবও পড়েছে অস্ট্রীয়-গোষ্ঠীভুক্ত বাঙালির জাতীয় সত্তায়।

ড. নীহাররঞ্জন রায় এই বঙ্গভূমির একটি সাধারণ সীমারেখা নির্দেশ করেছেন তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন :

> *'উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটনিরাজ্য; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওনঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।...এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙ্গালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।'*

এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের ইতিহাস উত্তরাপথের রাজ্যপ্রণালী ও রাজশাসনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। মৌর্য ও কুষাণযুগে উত্তরাপথের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলাদেশের সামান্য ভূমিকা থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত শাসনকালেই (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক) তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করে নেয়। গুপ্ত শাসনকালের বিস্তৃত দুই শতকে (পঞ্চম-ষষ্ঠ) ব্রাহ্মণ্য *স্মৃতি-সংহিতার* প্রভাবে বাংলায় আর্য-সংস্কৃতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। পরে হুন-আক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন হলে সপ্তম-শতকে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক কিছুকাল বাংলাকে ঐতিহাসিক গৌরবে মহিমান্বিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর বঙ্গভূমিতে 'মাৎস্য ন্যায' কায়েম হয়। সমাজজীবনে চলে চূড়ান্ত অরাজকতা। সাধারণ মানুষ সেই অরাজকতার শিকার হন। সে-সময় অত্যাচারিত জনসাধারণ ও বিব্রত রাজবংশীয়রা গোপাল নামে এক সেনাপতিকে বাংলার রাজ-সিংহাসনে বসান। সেই প্রথম প্রজাদের নির্বাচনে অ-রাজবংশীয়-কেউ সিংহাসনে আসীন হন। রাজা গোপালদেব খ্রিস্টীয় আট শতকে বাংলার সিংহাসনে বসে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। গোপালের নামানুসারে বাংলায় স্থাপিত হয় পালবংশের শাসনকাল। অষ্টম শতকের শুরু থেকে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—সুদীর্ঘ তিনশো বছরেরও বেশি বাংলার রাজ্যাধিকার পালবংশের করায়ত্ত থাকে।

দ্বাদশ শতকে পারিবারিক কলহে পালবংশ ক্রমশ হীনবল হতে থাকে। আর এই সুযোগে সামন্তগোষ্ঠী ক্ষমতা-লাভের জন্য চক্রান্ত শুরু করে। বহিঃশক্তি সেই সুযোগে বাংলার সিংহাসন-দখলের জন্য তৎপর হয়। সুদূর কর্নাটকের সেন-বংশীয় ব্রাহ্মণরা (বৃত্তিগতভাবে ক্ষত্রিয়) অবশেষে বাংলা জয় করতে সক্ষম হয়। সেন-বংশের আদি পুরুষ সামন্ত সেন কর্নাট ত্যাগ করে রাঢ়দেশে বসবাস করেছিলেন। তাঁর পৌত্র বিজয় সেন গৌড়রাজ্যের রাজা-রূপে অভিষিক্ত হন। তিনি খুব কম সময়েই পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে নিজের আধিপত্য

বিস্তার করেছিলেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তাঁর কুড়ি বছরের শাসনকাল-অন্তে, ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে, সিংহাসনাসীন হন লক্ষ্মণ সেন।

পাল-শাসনকালে রাজধর্মের কদর থাকলেও, মহাযানী বৌদ্ধ পাল-রাজারা হিন্দুধর্মের প্রতি কখনও বিরাগ বা অশ্রদ্ধা পোষণ করেননি। ফলে পাল-শাসনকালে গৌড়বঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতির সূচনা ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সেন-বংশের শাসনকালে দেখা গেল একেবারে বিপরীত প্রবণতা। ব্রাহ্মণ্য বিদেশি সেন-রাজাদের রাজসভায় উচ্চ-সমাজের বিশিষ্টজনেরা বিশেষ আনুকূল্য পেলেও, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহারিক ও আত্মিক সম্পর্ক একেবারেই ক্ষীণ হয়ে গেল। বিশেষত, বৌদ্ধ-বাঙালিকে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদের বশীভূত করার চেষ্টা চালান সেন-রাজারা। ফলে, বঙ্গদেশে সে-সময় প্রথম ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সূচনা হয়। বৌদ্ধ-বাঙালির উপর রাজবংশের প্রভাব চাপাবার জন্য শাসককুল সংস্কৃত সাহিত্য, বৈদিক যাগযজ্ঞ ও স্মৃতিসংহিতাকে অবলম্বন করেন। বৌদ্ধ জনসাধারণ ক্রমশ নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির উপর এই রাজরোষ অনুভব করে শাসকগোষ্ঠীর উপর ক্ষুব্ধ হতে থাকে। বিশেষত, পালযুগে, সদ্য-ভূমিষ্ঠ বাংলাভাষার বিকাশ সংস্কৃতের প্রভাবে প্রায়-রুদ্ধ হয়। বস্তুত, বৌদ্ধ পাল-যুগে বাঙালি প্রাথমিকভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চায় যে-ভাবে ব্রতী হয়েছিল, সংস্কৃতবাদী ব্রাহ্মণ্য সেনা-রাজকূলের প্রতিকূলতায় তা আর বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। পাল-যুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল। ওইসময় অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত *রামরচিত* নামে দুটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সেন-যুগের সংস্কৃত-প্রাধান্যকে আধুনিক সাহিত্য-ইতিহাসকাররা অবশ্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, সংস্কৃত সাহিত্যের সংস্পর্শে না-এলে বাংলা সাহিত্য যে-ভাবে বিকশিত হয়েছে, তা হত না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সে-ক্ষেত্রে লোকসাহিত্যের ঊর্ধ্বে উন্নীত হত কি না, তাতে বিশেষ সংশয় প্রকাশ করেছেন সাহিত্য-ইতিহাসকাবেরা।

তবে, বাংলার সেন-রাজাদের শাসনকালের স্থায়িত্ব খুব বেশিদিনের নয়। লক্ষ্মণ সেন যখন বৌদ্ধ-বাঙালিকে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদে বন্দি কবতে চাইছেন, তখনই অতর্কিতে বাংলায় ঘটে গেল মুসলমান-আক্রমণ। তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হওয়ার আগেই তুর্কি আক্রমণে পরাভূত হলেন তিনি। কথিত আছে, তুর্কি-নেতা ইখতিয়ার-উদ্দিন-মহম্মদ বিন-বখতিয়ার খিলজি মুষ্টিমেয় অনুচরের সাহায্যে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। মাত্র সপ্তদশ ছদ্মবেশী অশ্বারোহীর আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় লক্ষ্মণ সেন আত্মরক্ষা বা প্রতি-আক্রমণের কোনও চেষ্টা না-করে খিড়কি-পথে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। ইতিহাসের এই বিস্ময়কর জয়-পবাজয়ের ঘটনা ১১৯৯ বা ১২০২ খ্রিস্টাব্দের। বখতিয়ার খিলজি এর আগে, প্রায় একইভাবে, বিহারের রাজা ইন্দ্রুমানকে পরাভূত করেছিলেন। সেখানকার বৌদ্ধ বিহারগুলি অবলীলায় ধ্বংস করেছিলেন তিনি। লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আরও কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপ-তথা-গৌড়বঙ্গ অধিকারের আর-কোনও

চেষ্টাই করেননি। এই অবকাশে বঙ্গভূমিতে প্রায় বিনা বাধায় ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-সময় গণ-ধর্মান্তরকরণ ও মঠ-মন্দির চূর্ণ করার ঘটনা ঘটে। বাংলায় যুগপৎ মুসলিম শাসন ও মুসলিম-ধর্ম-সংস্কৃতির সূচনা ও বিকাশ হতে থাকে।

অবশ্য ক্ষমতালোভী আমির-ওমরাহরা বখতিয়ার খিলজিকেও বেশিদিন ইসলামি ক্ষমতা ভোগ করতে দেননি। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ অবস্থায় এক আমিরের আক্রমণে নিহত হলেন তিনি। এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত খিলজি ওমরাহ ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন। এ-সময় হুসাম উদ্দিন (গিয়াস-উদ্দিন-ইয়াজ খিলজি নামে সমধিক পরিচিত) বাংলায় সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করলে দিল্লির পাঠান-সুলতানদের টনক নড়ল। তাঁরা বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করে একশো বছরেরও বেশি (১২২৭-১৩৪০) সময়সীমায় বাংলাকে দিল্লির অধীনস্থ করে রাখেন। খর্ব হয় অঙ্গরাজ্যের শাসকবর্গের ক্ষমতা।

ইতিমধ্যে দিল্লির পাঠান-সুলতানদের মধ্যেও শুরু হয় ক্ষমতা-দখলের জন্য সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেই সুযোগটি গ্রহণ করেন সাম্‌স-উদ্দিন-ইলিয়াস-শাহ (১৩৪১-১৪১৩)। পাঠান সুলতানদের বিবাদের সুযোগে তিনি গৌড়বঙ্গের সিংহাসন দখল করেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা হয় ইলিয়াস শাহী-বংশের। দুটি পর্যায়ে ১৩৪২ থেকে ১৪১৩ এবং ১৪৪২ থেকে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশ বাংলার মসনদে আসীন ছিল। মাঝখানে হিন্দু-রাজা গণেশ কিছুকাল সিংহাসনে বসেছিলেন। যদিও, শেষপর্যন্ত, তিনি তাঁর পুত্র যদুকে ইসলামান্তরিত করতে বাধ্য হন। যদু জালাল উদ্দিন নাম নিয়ে গৌড়ের সুলতান হলেন। ঘটনাচক্রে তিনি প্রবল হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন। হিন্দু-সমাজের প্রতি তিনি খুবই অত্যাচার চালিয়েছিলেন। কিন্তু ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র সাম্‌স-উদ্দিন আহমেদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দেশে আবার অরাজকতা দেখা দেয়। সেই সুযোগে ইলিয়াস শাহী-বংশ ফের শাসনক্ষমতা অধিকার করে। ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত তা স্থায়িত্ব পেয়েছিল। এরপর হাবসি খোজারা সুলতানকে খুন করে ক্ষমতা দখল করে। ১৪৮৭ থেকে ১৪৯০ পর্যন্ত এরা বাংলার শাসন-ক্ষমতা ভোগ করে। হাবসি-বংশের শাসন বস্তুতপক্ষে এক স্বৈরাচারের শাসন। হত্যা, লুঠ আর অত্যাচারের পৃষ্ঠপোষক হাবসি-শাসনের অবসানও ঘটে হত্যার মাধ্যমে। হুসেন খাঁ নামে এক বিবেকবান রাজকর্মচারী হাবসিদের অত্যাচার থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে সুলতানকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। পরবর্তিকালে তিনিই সুলতান হুসেন শাহ্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় হুসেন শাহ-বংশ। চৈতন্যদেবের প্রথম জীবন ও যৌবন কাটে এই রাজত্বকালে।

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহ্ বাংলার মসনদ দখল করেন। হুসেন শাহ্-র নামোল্লেখ কেবল রণ-রক্তের ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ নেই—সমকালীন কবিদের রচনায়ও তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। তিনি শাসনকার্যে উগ্র ইসলামি মানসিকতার পরিচয় দেননি। হিন্দু-ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তাঁর বিরাগ ছিল না। অন্তত ক্ষমতার মত্ততায় তিনি হিন্দুদের ধর্মাচরণ বা সংস্কৃতি-চর্চায় তেমন বাধা দেননি।

হুসেন শাহর পুত্র নুসরৎ শাহ্‌-ও পিতার মতো অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নুসরতের মৃত্যুর পর তাঁর এক পুত্র কিছুকাল শাসনক্ষমতা পেয়েছিলেন। তাঁর হত্যার পর গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ ১৫৩৩ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন-ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ পরাজিত হন এবং পরাজয়-শোকে মারাও যান। এরপর শের খাঁ বাংলার শাসনক্ষমতা অধিকার করলেন। শের শাহের সুরবংশ ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের সিংহাসন রক্ষা করেছিল। ইতিমধ্যে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন বিল্বগ্রামের যুদ্ধে শের খাঁ-র কাছে পরাজিত হলে শের খাঁ 'শের শাহ্' নাম নিয়ে দিল্লির মসনদেও আসীন হন। তখন গৌড়ের শাসনভার তিনি অর্পণ করেছিলেন সুর-বংশীয় দলপতিদের উপর। জায়গিরদার প্রথায় সুদূর দিল্লি থেকে মোটামুটি সুস্থিরভাবে বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন তিনি।

শের শাহ্ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বঙ্গভূমিকে কয়েকটি জায়গিরে ভাগ করেন। একেকটি জায়গির একেকজন ভুঁইয়ার হাতে ন্যস্ত করেছিলেন তিনি। শের শাহ্ খুব অল্প সময়ই শাসনক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু সেই অল্প সময়েই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শের শাহ্‌র পুত্র ইসলাম শাহ ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে হুমায়ুন হৃত-গৌরব অনেকটাই ফিরিয়ে আনলেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আকবর জয়ী হলে সুরবংশ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। এ-সময় বাংলায় আফগান-দলপতিরা বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাজা খাঁ করবানি নামে এক আফগান-নেতা বাংলায় করবানি-বংশের শাসনক্ষমতা বলবৎ করলেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় করবানি-বংশের শাসন বলবৎ ছিল। এ-সময় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ফের মাথা চাড়া দেয়। কথিত আছে, সুলেমান খাঁর নির্দেশে পুরীর জগন্নাথ মন্দির 'কলুষিত' করা হয়। সুলেমান খাঁর মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে তাঁর দুই পুত্র বায়োজিদ ও দাউদ শাসনকার্য চালান।

১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ বাংলা-জয়ের জন্য আক্রমণ সংগঠিত করলেন। ১৫৭৫ সালে, বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পরে, মেদিনীপুরের দাঁতনের নিকটবর্তী এক প্রান্তরে হল বিষম যুদ্ধ। মোগল-বাহিনী পরাভূত হলেও পরের বছর ফের আঘাত হানল আকবর-বাহিনী। এ-বার করবানি বংশ পরাভূত হল। বাংলায় মোগল-অভিযান চলতে থাকল জায়গিরদার ও ভুঁইয়াদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর বাংলায় পাঠালেন মানসিংহকে। সুবেদার মানসিংহ হত্যা করলেন আফগান ভুঁইয়া ইশা খাঁকে। কেদার রায়ের মতো স্বাধীনচেতা ভুঁইয়াও বাধ্যত সম্রাটের অধীনতা মেনে নিলেন। ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানসিংহ্ বাংলার সুবেদার ছিলেন। এই সময়সীমায় তিনি পাঠান ও ভুঁইয়াদের ক্ষমতা হ্রাস করে বাংলায় মোগল-আধিপত্য বিস্তারের পথটি সুগম করে দেন।

মোগল-আধিপত্যের যুগে বাংলার নৈরাজ্যদশা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। বাংলার আর্থিক সম্পদ অনেকটা দিল্লিতে চলে গেলেও সাধারণ মানুষ আগের তুলনায় অনেকটা

নিশ্চিন্তে দিনযাপনের সুযোগ পেল। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্মাচরণ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের বাতাবরণও তৈরি হল। চৈতন্যদেব এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এ-সময় রুদ্ধ বৈষ্ণবীয় ভাবধারার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হলেন। বাংলার বৈষ্ণব-দর্শন ও রসশাস্ত্র বহির্বঙ্গেও বিশেষ সমাদৃত হল।

অবশ্য, পাশাপাশি, আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বঙ্গভূমি সেই প্রথম মোগলের উপনিবেশে পরিণত হল। সুবেদার-দেওয়ানরা এখানে এসে প্রভূত অর্থ-সংগ্রহ করে দিল্লি, লাহোর, আগ্রা বা লখনউয়ে নিয়ে যেতেন। সামন্তরা কর দিতে-দিতে নিঃশেষিত হয়ে পড়লেন। স্বভাবতই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও ক্রমশ অবনত হতে থাকল।

এই শোষণ অব্যাহত ছিল ইংরেজের ভারত-জয় পর্যন্ত। তারপর ইংরেজ-রাজত্বে কেবল বঙ্গভূমি নয়, গোটা ভারতভূমিই হয়ে পড়ল তাদের উপনিবেশ। সুদীর্ঘকালীন ইংরেজ-অধীনতায় ভারতের লাভ যেটুকু, তা শিক্ষাবিস্তার। কিন্তু সে-জন্য কম মূল্যও দিতে হয়নি দেশবাসীকে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পলাশির আম্রকুঞ্জে বাংলার স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হল। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লা সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতায় শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলেন। প্রথমত তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও, পরে গ্রেফতার হয়ে খুন হলেন। ইংরেজ-বণিকরা সিরাজের সেনাপতি মিরজাফরকে সিংহাসনে বসাল। বিশ্বাসঘাতক. ক্ষমতালোভী. অপদার্থ মিরজাফরও বেশিদিন ক্ষমতাভোগ করতে পারলেন না। তাঁর জামাতা মিরকাশিম আলি তাঁকে ইংরেজদের সহযোগিতায় ও ষড়যন্ত্রে সিংহাসনচ্যুত করলেন। মিরকাশিম ইংরেজদের অধীনতা অস্বীকার করে সামান্য স্বাতন্ত্র্য দেখাবার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। তাঁকেও হত্যা করে ইংরেজরা। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মিরজাফরকে ফের সিংহাসনে বসানো হলেও অচিরেই মারা গেলেন তিনি। তাঁর পুত্র নাজমউদ্দৌল্লা উপঢৌকনের বিনিময়ে সিংহাসন পেলেন।

এই পরিস্থিতিতে বাংলার জনজীবনে নেমে এল গভীর নৈরাজ্য, অন্ধকার। একদিকে তথাকথিত নবাবদের অর্থলালসা, অন্যদিকে ইংরেজ বণিকদের শোষণনীতির চাপে পড়ে বাঙালির শোচনীয় দশা হল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ দিল্লির বাদশাহর কাছ থেকে দেওয়ানি পেলেন। দেশ-শাসনের ভার নবাবের উপর থাকলেও লর্ড ক্লাইভ জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করতে থাকলেন। এই দ্বৈতনীতির ফলে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল।

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬) দেশ জুড়ে দেখা দিল অভাবনীয় দুর্ভিক্ষ। প্রাথমিকভাবে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের কারণ হলেও এর পিছনে মানুষের লোভের হাতও কম ছিল না। একদিকে ইংরেজের রাজস্ব-আদায়ের চাপ, অন্যদিকে নবাবি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে গোটা বাংলা জুড়ে নেমে এল গণমৃত্যুর বিভীষিকা। প্রায় এক কোটি মানুষের মৃত্যু হল

এই মন্বন্তরে। দেশে খাদ্যের যোগান যতটা ছিল, তা যেমন কুক্ষিগত হয়ে রইল ; তেমনই স্বার্থপর নবাব বা মুনাফা-লোভী ইংরেজ অতিরিক্ত খাদ্য-যোগানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। বরং দুই পক্ষই মন্বন্তব থেকে মুনাফা-অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গেল।

এখানেই শেষ নয়। এরপরও, আঠাবো শতকের শেষাংশে, ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস, স্যর জন শোর, ওযেলেসলি প্রমুখ ইংরেজ গভর্নরবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যাচারের মাত্রা আরও তীব্রতর করে তুললেন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি দিল ইংরেজরা। কর্নওয়ালিসেব 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-র ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিব অর্থভাণ্ডার আরও স্ফীত হয়ে উঠতে থাকল। স্বভাবতই এ-সময সাধাবণ মানুষের দুর্দশা উত্তবোত্তব বেড়ে চলে। মন্বন্তবে যেখানে মূলত নিম্নবিত্ত কৃষকশ্রেণি প্রায়-লুপ্ত হয়েছিল, সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে বাংলায় মধ্যবিত্ত সমাজের উপব সবাসবি আঘাত নেমে এল।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওযেলেসলি বাংলার গভর্নব-জেনাবেল হয়ে বাংলায় এলেন। বণিকের মানদণ্ড ইতিমধ্যে বাজদণ্ড-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। মুসলমান-শাসনশক্তির অবসান ঘটেছে। কেবল বাংলায নয, ভাবতের অন্যান্য প্রদেশেও বিভিন্ন রাজশক্তি ইংবেজেব পবাক্রমেব কাছে নিঃশেষিত হযে পড়েছে। স্বযং মোগল-বাদশাহ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয়েছেন। এই পবিস্থিতিব সুযোগ পুবোপুবিই গ্রহণ কবে সাম্রাজ্যবাদী ইংবেজ। যার ফলে, অবশেষে, লালকেল্লায় ওড়ানো হয ব্রিটেনেব পতাকা। ভাবতভূমি সম্পূর্ণভাবে ইংবেজের অধীনস্ত হযে পড়ে।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংবেজেব জয় মোটেই আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর আগে তাবা যেমন মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা ইত্যাদি উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাণিজ্য-বিস্তাবেব স্বার্থে নিজেদেব শক্তি-সন্নিবেশ ঘটিয়েছিল, ঠিক তেমনই দেশের ভিতর সুপবিকল্পিতভাবে তৈরি করেছিল দালাল ও মুৎসুদ্দিশ্রেণি। সমুদ্র-কেন্দ্রিক বাণিজ্য-পবিচালনাব জন্য ইংরেজ মাদ্রাজ ও বোম্বাইযের মতো কলকাতাকেও নির্বাচন কবেছিল। কলকাতায নিরুপদ্রবে বাণিজ্য চালাবার অভিপ্রায়ে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত না-হযে ইংরেজ বণিকেব উপায় ছিল না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতের অর্থনীতি, প্রশাসন ও সংস্কৃতি তিন ধবনের দ্বন্দ্বমূলকতায জড়িয়ে পড়ে। প্রথমত, ইংরেজ-পোষিত নব্য ধনিকশ্রেণিব সঙ্গে ইংরেজ-পূর্ব যুগের ধনিকদের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব শুরু হয় ; দ্বিতীয়ত ইংরেজি-শিক্ষায়-শিক্ষিত হিন্দু-জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চাদপদ মুসলিম-সম্প্রদাযের দ্বন্দ্ব বাধে চাকরি ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করে; তৃতীয়ত, ইংরেজ-স্বার্থের-সঙ্গে-যুক্ত দেশীয় মধ্যবিত্ত ধনিক সম্প্রদাযের সঙ্গে দবিদ্রশ্রেণির দ্বন্দ্ব তৈবি হয়।

এই দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে তৃতীয় দ্বন্দ্বটিই পলাশি-যুদ্ধেব পর থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহি-বিদ্রোহ পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। অন্য দিকে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প এবং অসমের চা-

শিল্প ১৮৬০ সাল থেকে গড়ে তোলে নতুন শ্রমিকশ্রেণি। আর, স্বভাবতই, ইতিহাসের নিয়মে, শিল্প-শ্রমিকের সঙ্গে শিল্প-মালিকের শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব, প্রথমাবধিই, তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় থেকে ভারত প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হয়ে পড়ে। যার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সুবাদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। মূলত মধ্যবিত্তশ্রেণির নেতৃত্বে দেশজুড়ে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও আছড়ে পড়ে সেই আন্দোলনের ঢেউ, প্রবাহিত হতে থাকে যুগপৎ অহিংস ও সহিংস পথে।

কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল-হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। কংগ্রেসেব অহিংসাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি, নিছক স্ববাজ পাওয়াব লক্ষ্যে নয়, সার্বিক স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দল বা শাখা প্রবল পরাক্রমী ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের নানা প্রান্তে বিচ্ছিন্ন আঘাত হানতে থাকে। কংগ্রেসের ভিতরেও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো নেতারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের দার্শনিক পন্থার বদলে চবম পন্থার কথা বলেন।

দেশের ভিতব স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রণোদনা এবং গতিবেগ যত বৃদ্ধি পায়, ইংবেজ-শাসককুলও তত হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। একদিকে কংগ্রেসেব ভিতরকাব দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে স্বাধীনতা-আন্দোলনে মুসলমান-সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের অভাব, প্রায়শই তাদেব দূবে ঠেলে রাখা—এইসব সুযোগগুলি গ্রহণ করে ইংরেজ। চতুর সাম্রাজ্যবাদ এ-ক্ষেত্রে তাব বিভেদনীতিকে কাজে লাগায। সম্প্রদাযগত বিভেদকে কাজে লাগিয়ে ১৯০৫ সালে ইংবেজ বঙ্গভঙ্গ করে। যদিও এর বিরুদ্ধে ক্রমশ আন্দোলনও জোরদার হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ 'রাখিবন্ধন' উৎসবের সূচনা করেন। শেষপর্যন্ত, আন্দোলনেব চাপ এবং প্রশাসনিক অসুবিধার কাবণে, দীর্ঘ ছয় বছব পব, ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ইংরেজ বঙ্গভঙ্গ বদ করে ফের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গকে একীভূত করে।

বাহ্যত এই বদ দুই-বাংলা-তথা-হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রদায়কে একীভূত করলেও, চতুর ইংরেজেব অভীষ্ট পূবণ হয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে-বিষগাছের বীজ ইংরেজ রোপণ কবেছিল, কংগ্রেস যে-ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরেই সরিয়ে বেখেছিল, তাতে ভঙ্গ বঙ্গ ফের সংযুক্ত হলেও, ক্ষতচিহ্নটি থেকেই গেল। ইতিমধ্যে ইংরেজের পরোক্ষ উদ্যোগেই যথাক্রমে ১৯০৬ ও ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয 'সারা ভারত মুসলিম লিগ' ও 'সারা ভারত হিন্দু মহাসভা' নামে মুসলমান ও হিন্দু উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণির নেতৃত্বাধীন দুটি সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক দল। দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ই এই দলদুটিব ছত্রছাযায নিশ্চিত বোধ করে, নিজেদের আশা-আকাঙক্ষার প্রতিরূপ ভাবে দলদুটিকে।

পরবর্তিকালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তীব্রতা, বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের প্রভাব এবং

সর্বোপরি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের জড়িয়ে পড়া—সবকিছুই অনিবার্য করে তোলে ভারতের স্বাধীনতা। কিন্তু, শেষপর্যন্ত, ইংরেজ দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেও, স্বাধীনতার আগের বছরে বিখ্যাত নোয়াখালি-দাঙ্গায় দুই সম্প্রদায়কে যেমন সুপরিকল্পিতভাবে প্ররোচিত কবেছিল, তেমনই স্বাধীনতার শর্ত হিসাবে ভারত ভেঙে ভাগ করতেও সক্ষম হয়েছিল তাবা। কেননা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু মহাসভা' বা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্র 'মুসলিম লিগ' কেউই নিজের অবস্থান ছাড়তে নারাজ থেকেছে। আর সেই ঘোলা জলে মাছ ধরেছে কংগ্রেস। রক্তস্রোতের উপর ক্ষমতার সিংহাসন পেতেছে তারা।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাস এই সম্প্রদায়গত বিভেদের উপরই তার ভিত্তি রচনা করে। লাহোর ও দিল্লিব মধ্যে কেবল ভৌগোলিক নয়, দুস্তর মানসিক ব্যবধানও তৈরি হয়। এর আগে ১৯২০-২২ সালে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে দেশের দুই সম্প্রদায় কিছুটা নিকটবর্তী হলেও, সেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও ফেব প্রাধান্য পেতে থাকে। এবং সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সুচতুর ইংরেজ ভারত-ভাগেব সিদ্ধান্ত কার্যকব কবে। পাকিস্তান সবাসরি 'ইসলামি' রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের পবিচিত করলেও, হিন্দু-নেতারা ভাবতকে তথাকথিত 'ধর্ম-নিবপেক্ষ' দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেন।

স্বাধীনতা-উত্তব ভাবতে ধর্ম-নিবপেক্ষতার আদর্শও যে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কার্যকবী হযনি, হিন্দু-মুসলমানেব সম্পর্ক যে সার্বিকভাবে সরলখাতে প্রবাহিত হযনি, সম্প্রদায়ের টানাপোডেনে, বিভেদে, বাজনৈতিক অভিসন্ধিতে, বাববার দুই সম্প্রদায়ের রক্তে ভিজেছে এ-দেশেব মাটি, তা আমবা লক্ষ করেছি। বস্তুত, অখণ্ড ভাবত ও খণ্ডিত ভারতের ইতিহাস যেন এইভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কেরই ইতিহাস।

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

'রাজা কালস্য কারণম'—রাজ-নীতিই সময়কে নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণভাবে দেশ, জাতি, সমাজের ইতিহাস এইভাবেই যুগে-যুগে রাজা, রাজনীতি আর যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস বলেই পরিগণিত। কিন্তু রাজা, রাজ-পরিবার, শাসন-নীতির বাইরে যে-বিপুল জনসমষ্টি, ইতিহাসকাররা সে-দিকে তেমন নজর দেন না। ইতিহাসের প্রধান অসুবিধা সম্ভবত এই যে. রাজা বা রাজনীতি নিজের ক্ষমতার সুবাদে যে-ভাবে কালে-কালে নিজেদের মাহাত্ম্যগাথা রচনায় সমকালীন রাজ-ঐতিহাসিকদের নিযুক্ত করেছেন, সাধারণ মানুষের ইতিহাস-রচনায় তাঁরা সে-ভাবে প্রণোদিত হননি। বিচ্ছিন্নভাবে জনজীবনের পরিচয় ইতিহাসের রক্তাক্ত পৃষ্ঠায় কখনও বিচ্ছুরিত হলেও, সার্বিক ও ধারাবাহিক কোনও জনচিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দুর্লক্ষ্যই। সে-ক্ষেত্রে সমকালীন সাহিত্য, সরকারি আদেশনামা, বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং নানা লোকগাথা ইত্যাদি উপকরণই আমাদের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করে।

এই অসুবিধার বাধা পেরিয়েই আমাদের অনুধাবন করতে হয় মধ্যযুগের ইতিহাস। মধ্যযুগের সময়সীমায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ঐতিহাসিক মতভেদও দুস্তর ও পরস্পরবিরোধী। যেমন, হিন্দু-ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, মুসলমান-শাসনের ইতিহাস সম্পূর্ণতই অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সন্ত্রাস ও রক্তপাতের ইতিহাস। বিপরীতে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা ইসলামি শাসকদের-তথা-শাসনকাজের নানা সদর্থকতা আবিষ্কার করেছেন এবং সেইসব রাজা ও রাজনীতির প্রশংসায়ও হয়েছেন পঞ্চমুখ। তাঁরা জানিয়েছেন, হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠী কখনওসখনও পারস্পরিক নৈকট্যে এলেও, স্থায়ীভাবে সেই মিলন বস্তুতই এক অসম্ভব ও অলীক আকাঙ্ক্ষা--সেই আকাঙ্ক্ষার যেমন কোনও তীব্রতা নেই, তেমনই তার বিন্দুমাত্র বাস্তব ভিত্তিও নেই। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই দ্বিবিধ সম্প্রদায়ের মিলন এক সাধারণ-কৃষ্টি-তথা-জাতিসত্তার উদ্ভবও সম্ভব করেছিল।

এইসব মতামতগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে নৃশংসতার একটি সম্পর্ক অবশ্যই ছিল। যুদ্ধের সঙ্গে এইরকম হিংস্রতা খুবই মানানসই। যুদ্ধের ইতিহাস মানেই খুন, লুঠ, রক্তপাত আর অসহিষ্ণুতার ইতিহাস। জয়ী-পক্ষ সবসময়ই বিজিত-পক্ষের উপর এই অত্যাচার চালিয়েছে, পৃথিবীতে সব যুদ্ধের ইতিহাসই একরকম। এ-ক্ষেত্রে জয়ী-পক্ষ যেহেতু মুসলমান এবং বিজিত-পক্ষ হিন্দু, সেহেতু মঠ-মন্দিরের উপর আক্রমণও ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সে-ক্ষেত্রে জয়ী রাজারা যে সততই ধর্মের প্রেরণাযই অন্য ধর্মের উপর আঘাত হেনেছেন, তা নয়। আসলে মন্দিরগুলি সে-সময় ছিল সম্পদের ভাণ্ডার। ফলে, লুঠেরা সুলতানরা সেই সম্পদ লুণ্ঠনের বাসনায়ই

মন্দিরগুলি চূর্ণ করেছেন। অন্যদিকে, বিজিত-পক্ষকে অধীনস্ত ও সন্ত্রস্ত করার অভিপ্রায়েও তাঁরা হিন্দুর মন্দির, বৌদ্ধর মঠ ধ্বংস করেছেন, এমন অনুমানও অবাস্তব নয়।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের মুসলমানি শাসনের প্রশংসা সবক্ষেত্রে হয়তো যথার্থ নয়। কিন্তু, ওই পরিব্যাপ্ত সময়সীমায় কোনও শাসনকর্তাই সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন না, এমন মনে করায়ও যথেষ্ট অতিশয়োক্তি থাকে। এইসব ঐতিহাসিকরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে-সব ঘটনার বিবরণ উপস্থাপিত করেছেন, তাকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' এবং 'অতিরঞ্জিত' মনে করার মধ্যেও একধরনের সাম্প্রদায়িকতা প্রচ্ছন্ন থাকে। বস্তুত, বিপরীত-মতবাদী ঐতিহাসিকরা যে অনেকক্ষেত্রেই দুই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভেদকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক দূরত্বকেই আরও বাড়িয়ে তুলেছেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রণিধানযোগ্য, তা হল, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবধান তথা-স্বাতন্ত্র্যবোধ এতটাই প্রবল ছিল, দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উন্নাসিকতা ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা এতটাই তীব্র ছিল, যে, দুই সম্প্রদায়ের স্থায়ী ঐক্যের সম্ভাবনা ছিল সম্পূর্ণই সুদূরপরাহত। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করে দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছিল। সম্মিলিত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিনিময়ে দুই সম্প্রদায়ের মিলন সাধিত হয়েছিল অনেকক্ষেত্রেই।

কিন্তু, গোটা বিষয়টিই ছিল রাজনীতি সাপেক্ষ। রাজনীতির ইচ্ছায় সামাজিক জীবন কখনও সহজ-স্বাভাবিক ছন্দে প্রবাহিত হত, কখনও তা সংকীর্ণ খাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত। ইতিহাস কখনওই মিলনের সেই ছবি আঁকেনি। ঐতিহাসিকরা যেহেতু সততই রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতেই সমধিক আগ্রহী ছিলেন, সেহেতু সামাজিক মিলনের এই স্বাভাবিক পরিচয় তাঁদের রচনায় প্রায়শই অলিখিত থেকে গিয়েছে। রাজানুকূল্য এবং পৃষ্ঠপোষকতাই যেখানে ঐতিহাসিকের পাথেয়, সেখানে রাজ আধিপত্যই যে ইতিহাসের অবলম্বন হবে, তাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকে না। কিন্তু রাজার ও রাজনীতির তথাকথিত গৌরবের অন্তরালে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে মিলনাকাঙ্ক্ষা ও মিলন চেষ্টার বাস্তবতা প্রবাহিত ছিল, ইতিহাসকার তাকে বিন্দুমাত্র গুরত্ব না দিলেও, সাধারণ মানুষের কাছে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সেই আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের চিত্র লিখে রাখে সাহিত্য। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ, সেহেতু সাহিত্যই এ-ক্ষেত্রে আমাদের কাছে প্রামাণ্য এবং দিশারী বলে মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসকারেরা যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রায়শই যেহেতু রাজা ও রাজনীতির প্রভাব কাটিয়ে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেননি, সেহেতু সাহিত্যের অভিজ্ঞান গ্রহণ করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়েছেন। সাহিত্যের আশ্রয়ে ইতিহাস যেখানে সত্য, সবিশেষ ও গভীরতর হতে পারত, এ-ক্ষেত্রে তা একেবারেই হয়নি। ফলে, দুর্ভাগ্যত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাসের বিবরণ হয়ে পড়েছে একপেশে, সংকীর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েনের ইতিহাসে রাজনীতির প্রভাব একটি মুখ্য বিষয়। আমরা জানি, ব্যক্তি-বিশেষে এই সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত—রাজার আগ্রহ বা অনীহাই ছিল সেই নিয়ন্ত্রণের একমাত্র চালিকাশক্তি। এ-ক্ষেত্রে আমরা আকবর বা ঔরংজেবের দৃষ্টান্ত মনে রাখতে পারি। আকবর যে-ভাবে সাহিত্য-শিল্প বা জীবনচর্যার ক্ষেত্রে অনুকূলপন্থী ছিলেন, ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টান্ত ঠিক তার বিপরীত। সংঘর্ষ, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ সত্ত্বেও আকবরের শাসনকালে সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। সে-সময় সম্মিলিত জাতির উদ্ভবের চেষ্টাগুলি নানা প্রতিকূলতায় অভিপ্রেত পরিণতিতে পৌঁছয়নি ঠিকই, কিন্তু তাতে চেষ্টাগুলির গুরুত্ব বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না। এই মিলনের আকুতি ও আবেগের বিচ্ছিন্ন চিত্র আমরা তৎকালীন সাহিত্যে বারবার পেলেও, ইতিহাস সে-ভাবে তাকে গুরুত্ব দেয়নি।

আমাদেব ইতিহাস সে-কাবণেই কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস-চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে বহু পরে। সমকালীন মুসলমান-ঐতিহাসিকরা সম্রাট, সুলতান, উজির, আমিব, ওমরাহদের জয়গাথা লিখতে যতখানি উৎসাহী হয়েছিলেন, সামাজিক ইতিহাসের তাৎপর্য অনুধাবন করতে ঠিক ততটাই ব্যর্থ হযেছিলেন। তাঁরা কখনওই নিজের ধর্ম বা সম্প্রদায়েব উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। একই পথের পথিক ছিলেন পূর্ব ও পরবর্তী হিন্দু বা ইংরেজ-ইতিহাসকাররা।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির এই ইতিহাস-অভাবের দিকে প্রথম দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন। *বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা* শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন,* ১২৮৭, *অগ্রহায়ণ*) তিনি লিখেছিলেন .

> *... আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিবর্থক উপাধিধারণ করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগেব জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহাব কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতি-গৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।*
>
> ...
>
> *বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?*

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির ইতিহাস-অভাবের বিষয়টি সঠিক অনুধাবন করেছিলেন। যেমন, তিনি বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ-বিজয়ের ঘটনার ঐতিহাসিকতাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি। *বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা* প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্‌হাজ্ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন।...তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর।...এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এইমাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিন্‌হাজ্ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন।

কিন্তু, তিনিও যে এখানে, বিপরীত অর্থে, কিঞ্চিৎ সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের ওই প্রবন্ধেই রয়েছে। তিনি প্রকৃত ইতিহাস বলতে যা বুঝেছিলেন, তা সাধারণভাবে মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা বলে অনায়াসেই বিবেচিত হতে পারে। বঙ্কিম লিখেছিলেন .

...দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র পববর্তিকালে এই ইতিহাস-চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসগুলি। কিন্তু, সেখানেও যে তিনি সতত খুব উদার মানসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তা নয়।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে সফল তুর্কি-অভিযান কেবল যে বাংলায় রাজনৈতিক ইতিহাসেই এক যুগান্তর আনে, তা নয়। বাংলার সামাজিক জীবনেও এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয় তথাকথিত সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়। তুর্কি-বিজয়ের আগে বঙ্গভূমিতে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতি। গুপ্তযুগ থেকে এই দুই ধর্ম বাংলায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সংঘর্ষ ঘটে, তার প্রশমন ঘটে পাল-যুগে। বস্তুত, বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী পাল-রাজত্বের চারশো বছরের ইতিহাস এক পরম সৌহার্দ্যের ইতিহাস, মহিমময় সম্প্রীতির ইতিহাস। পাল-রাজারা বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর ও মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর মেলবন্ধন ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতি রাজ-আনুকূল্য পেয়ে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই, পরধর্ম-সংস্কৃতি-সহিষ্ণু হয়। ফলে সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে।

কিন্তু দক্ষিণ ভারত থেকে সেন ও বর্মন-বংশের রাজারা বাংলায় আধিপত্য বিস্তার

করলে বাংলার সামাজিক চিত্রটি একেবারেই পাল্টে যায়। ওইসব ব্রাহ্মণ্য রাজগোষ্ঠী একাধারে ছিলেন রক্ষণশীল ও পরধর্ম-অসহিষ্ণু। তাঁরা প্রথমাবধিই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাকেই একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেন। নিজ-ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য ধর্ম-সংস্কৃতিগুলি স্বাভাবিক নিয়মেই অবহেলিত হতে থাকে। ফলে দেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর একটি ভেদ-সম্পর্ক তৈরি হয়। এবং সেই স্বেচ্ছাচারিতার মূল্য দিতে হয় লক্ষ্মণ সেনকে। সম্ভব হয় তুর্কি-বিজয়।

তুর্কি-শাসকেরা বঙ্গভূমি জয় করে অবশ্য একই গোঁড়ামির পরিচয় দেয়। বরং তারা তুলনায় আরও-বেশি নৃশংস হয়ে ওঠে। প্রথমেই তারা আঘাত করে বৌদ্ধ-বিহার এবং হিন্দু-মন্দিরগুলির উপর। এই আক্রমণের পিছনে যত-না ছিল ধর্মীয় উন্মাদনা, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের প্রণোদনা। ধর্মপ্রাণ জাতির আরাধনাস্থল ধ্বংস করলেই যে মানুষের মনের রং গেরুয়া থেকে সবুজে রূপান্তরিত হবে এমন সরল বিশ্বাস নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদী সুলতানের ছিল না। আসলে ধনসম্পদ-লুণ্ঠনের সঙ্গে-সঙ্গে তারা মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে শাসনবন্দি করতে। এই আকস্মিক আক্রমণে বিহ্বল ও বিভ্রান্ত বৌদ্ধ-শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নেপাল, মিথিলা, উড়িয্যা, কামরূপ ও ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে গেলেন। পরবর্তিকালে আবিষ্কৃত *শূন্যপুরাণ* গ্রন্থের *নিরঞ্জনের রুস্মা* শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা ওই নির্বাসনী পর্বের পরিচয় পাই :

ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বস হেতু নিরঞ্জন,
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়,
হাতে পুথি কর‍্যা কত দেয়াসি পালায়।
ভালের তিলক যত পুঁছিয়া ফেলিল,
ধর্মের গাজনে ভাই যবন আইল।
দেউল-দেহারা যত ছিল ঠাঁই ঠাঁই,
ভগ্ন করি পাড়ে তারে না মানে দোহাই।

বহিরাগত মুসলমানরাই যে এ-দেশে প্রথম আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তা নয়। প্রাচীন যুগে পারসিক, গ্রিক, শক-পহ্লব, হুন ইত্যাদি নানা বৈদেশিক আক্রমণের মুখে পড়েছে ভারতভূমি। কিন্তু সেইসব বিদেশিরা ভারতের জনজীবনে তেমন-কোনও সদর্থক বা নঞর্থক ভূমিকা বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু, মুসলমান-শাসকদের সঙ্গে এই সমস্যা দেখা দিল কেন? কেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুস্তর সামাজিক, ধর্মীয়, মানসিক ব্যবধান তৈরি হল? ঐতিহাসিকদের মতে, পূর্বোক্ত বিদেশিরা এ-দেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, উন্নত আরব-সংস্কৃতি ও সুদৃঢ় ইসলাম-ধর্মের ধারক মুসলমানরা সে-ভাবে সম্পৃক্ত হয়নি। অন্যদিকে, হিন্দু-জনগোষ্ঠীও তাদের গ্রহণ করতে

অনীহ হয়েছিল। এ-ভাবেই দু-পক্ষের মাঝখানে গড়ে ওঠে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। দুই সম্প্রদায়ই অবশ্য পারস্পরিক দোষারোপের ক্ষেত্রে একই মানসিকতা অবলম্বন করেছিল। বস্তুত, সেই মধ্যযুগ থেকে একবিংশ শতকের শুরুর সময়েও ওই মিল অটুট রয়েছে।

একাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট মুসলমান-পণ্ডিত-তথা-ভারতবিদ আলবেরুনি দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যবধানের কারণ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "*হিন্দুরা সমস্ত বিষয়েই আমাদের থেকে আলাদা।*" ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণগত অমিলের কথা যেমন বলেছিলেন তিনি, তেমনই মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দু-জনসাধারণের সাধারণ উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকেও দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন। হিন্দু-জনগোষ্ঠী মুসলমানদেব যে-ভাবে 'ম্লেচ্ছ' প্রতিপন্ন করে তাদের সঙ্গে বিবাহ বা অন্য-কোনওরকম সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্ক-স্থাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা কবেছে, তার সমালোচনা করেছিলেন আলবেরুনি। তিনি লিখেছিলেন :

> *তারা আমাদের থেকে ধর্মে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা যা বিশ্বাস করে, আমরা তা করি না, এবং আমবা যা বিশ্বাস কবি, তাবা তা করে না।...তৃতীয়ত সমস্ত আচার আচরণেও তারা আমাদের সঙ্গে তফাত কবে। তাদের বিদ্বেষ এতটাই যে তাদেব শিশুদের পর্যন্ত আমাদের থেকে তফাতে রাখে। পোশাকাশাক, এবং রীতি-নীতিতেও তারা আমাদের থেকে আলাদা। হিন্দুরা আমাদের 'শযতানের সন্তান' বলে অভিহিত করে।...তাদেব ধর্মীয় গোঁড়ামি এতটাই তীব্র যে অন্য সকলকেই, সমস্ত বিদেশিকেই তারা অপছন্দ করে এবং 'ম্লেচ্ছ' বলে চিহ্নিত করে। তাদের সঙ্গে দুস্তর বজায় রেখে চলে। আমাদের সঙ্গে বিবাহ বা অন্য-কোনও সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রেও তাদের প্রবল অনীহা রয়েছে। একসঙ্গে বসা-শোয়া পানভোজনের কোনও বিধান নেই হিন্দুদের। তারা মনে করে এতে তাদের জাত যাবে, কলুষিত হবে তারা। কোনও বিদেশির স্পর্শে জল ও আগুনও তাদের কাছে অপবিত্র মনে হয।...এব ফলে তাদের সঙ্গে ন্যূনতম সম্পর্ক গড়ে তোলা খুবই দুরূহ। ফলে তাদের আর আমাদের মধ্যেকার বাধা বেড়েই যাবে, কমবে না।*
>
> — *Sachan, Alberunis India (1) অনুবাদ : বদরুদ্দিন উমর*

মনে হতে পারে, আলবেরুনি এ-ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত ভাবনার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু বিষয়টি আদতে তেমন নয়। কেননা, আলবেরুনি নিজ-ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমালোচনাও কম করেননি। মুসলমানদের নিষ্ঠুরতা এবং মঠ-মন্দির চূর্ণ করার তীব্র সমালোচনা কবেছেন তিনি। বস্তুত, হিন্দুদের সমালোচনা করলেও তিনি ছিলেন তাদের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তেমন-কোনও উল্লেখ নেই। পনেরো শতকে বিদ্যাপতির রচনায় বিচ্ছিন্নভাবে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

হিন্দু তুরকে মিলল বাস
একক ধম্মে অওকো উপহাস।
কতহুঁ বাঙ্গ কতহুঁ বেদ,
কতহুঁ মিলিমিস, কতহুঁ ছেদ।
কতহুঁ ওঝা কতহুঁ খোজা,
কতহুঁ নকত কতহুঁ রোজা।
কতহুঁ তম্বারু কতহুঁ কুজা,
কতহুঁ নামাজ কতহুঁ পূজা।
কতহুঁ তুরক বর কর,
বাট জাইতেঁ বেগার ধর।
ধরি আনএ বাভন বড়ুআ,
মথাঁ চড়ার এ গাইক চুড়ুয়া।
ফোট চাট জনউ তোড়,
উপর চড়ার এ চাহ ফোড়।
ধোআ উরিধানে মদিরা সাঁধ,
দেউল ভাঁগি মসীদ সাঁধ।
গোরি-গোমঠ পুরিল মহী,
পত্ররহু দেবাক চাম নহী।
হিন্দু বোলি দূর হি নিকার,
ছোটেও তুরুকা ভভকী মার।

একজন ইতিহাসতাত্ত্বিক ও একজন কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক তফাত থাকবেই। তবু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান দু-জনেই যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা, আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মধ্যযুগ ছাড়িয়ে আধুনিকতর যুগে পৌঁছেও আমরা সেই দুস্তর ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারিনি, বরং বাড়িয়েই চলেছি।

রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব যে কেবল মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগেরই লক্ষণ, তা নয়। আমরা জানি, একেবারে প্রাচীন যুগ থেকেই এই বৈশিষ্ট্যটি সুপ্রোথিত হয়েছিল। গ্রিক মনীষী প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তিনি শাসকশ্রেণিকে উপদেশ দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে আয়ত্তে রাখার জন্য এক অলীক সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রচারের। সেই সৃষ্টিতত্ত্বে কী বলতে হবে, তা-ও শিখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে বোঝাতে হবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই পূর্ব-নির্দিষ্ট। কেননা, তিনিই বিভিন্ন মানুষ সৃষ্টি করার সময়, এই বিন্যাস বজায় রাখার জন্য, কারও মধ্যে সোনা, কারও

মধ্যে রুপো, আর বাকিদের মধ্যে তামা ও লোহা মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ীই মানুষের গাত্রবর্ণ-তথা-শ্রেণি-পরিচয় নির্দিষ্ট হয়েছে। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থেও ঈশ্বরের অলীক অনুশাসনের প্রচার করে প্রজাদের শাসন করার উপদেশ রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন তিনি বর্ণাশ্রম প্রথা তৈরি করেছেন। *কোরান শরিফ* ও *হাদিস শরিফেও* ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গ হিসাবেই দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে ধর্মযুদ্ধের (জেহাদ) কথা। আধুনিক যুগেও সারা পৃথিবীতেই এই প্রবণতা সুবিস্তৃত। রাজনীতি সুবিধামতো ধর্মকে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে। বাংলার সমাজ-জীবনে মুসলমান-শাসনের প্রভাব খুবই তীব্রতর হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন, মুসলমান-শাসকরা প্রায়শই কেবল শাসনক্ষমতা অধিকার করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা ক্ষমতার প্রতাপ আরও বিস্তৃত করার সার্বিক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সে-ক্ষেত্রে প্রথমেই তাঁরা দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন ধর্মের দিকে। সাধারণভাবে মুসলমান-শাসকদের উপর ধর্মের প্রভাব ছিলই। ইসলামি অনুশাসনে বাঁধা ছিলেন ক্ষমতাপিপাসু সুলতানরাও। ফলে সে-সময় থেকেই ধর্ম, সুলতানের সুবাদে, জড়িয়ে গিয়েছিল সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে। বলা হয়, মুসলমান-শাসকরা এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে কোরান নিয়ে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই ধারণা সর্বাংশে সত্য না-হলেও, এর আংশিক সত্যতা থাকতেই পারে। কেননা, আমরা লক্ষ করেছি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে ধর্ম জড়িয়ে যাওয়ায় ইসলাম অনেক বেশি প্রচারিত ও প্রসারিত হতে থাকে। রাষ্ট্রীয় পোষকতাই যে এর কারণ, তা সহজেই অনুমেয়।

কোরানে যদিও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে বলপূর্বক ধর্মপ্রচার অধর্ম (*'লা ইকরাহা ফিদ্দিন'*)। কিন্তু তা যে সবক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে, তা নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের ঘটনা অনেকই ঘটেছে। বস্তুত, বাংলায় ইসলাম প্রবর্তিত হয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই উপায়েই। প্রত্যক্ষ পথের মধ্যে ছিল বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, স্বেচ্ছা-ধর্মান্তর, ধর্মে আগ্রহীকরণ এবং বহিরাগত মুসলিম-অভিবাসন। অন্যদিকে মসজিদ, মাদ্রাসা ও পির-ফকিরদের জনহিতকর ও দিব্য কার্যকলাপেও হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার প্রয়াস সক্রিয় ছিল।

বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের সত্যতা মেনে নিতে চাননি মুসলমান-ঐতিহাসিকেরা। বিপরীতে, হিন্দু-ইতিহাসকাররা এই বিষয়টির উপরই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মুসলমান-ঐতিহাসিকরা মনে করেন দেশে সংখ্যাগুরু হিন্দু-বৌদ্ধ-জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু মুসলিম-সম্প্রদায়ের পক্ষে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেখানে শাসকগোষ্ঠীর মদত-প্রাপ্ত, সেখানে এই তত্ত্বটির যৌক্তিকতা যথেষ্ট অসাড় মনে হয়। দেশে যখন মঠ-মন্দির ভাঙার ও লুঠ, ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তখন সন্ত্রস্ত মানুষ যে প্রাণের চেয়ে ধর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, তাতে সন্দেহ কী!

তত্ত্বগতভাবে ইসলাম ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাসী। সকল ধর্মমতের মতো ইসলামও চিরকাল নিজের ধর্মকে 'শ্রেষ্ঠতম' বলে প্রচার করেছে। প্রচারের অন্যতম অবলম্বন হিসাবে

ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীকেও টানতে চেয়েছে নিজের দিকে। এই মনোভাব সাধারণভাবে উদার মানসিকতার পরিচায়ক বলে গণ্য হলেও, অনেকক্ষেত্রেই তা বিপরীত অভিঘাতও তৈরি করেছিল। হিন্দুত্ববাদ যেখানে স্বীয় ধর্মাবলম্বীকে অনাচারের দায়ে পতিত জ্ঞান করে, গো-মাংস ভক্ষণ করলে যেখানে তার হিন্দুত্ব অবসিত হয় ; ইসলাম সেখানে সকলের জন্য দরজা খুলে রেখে উদারতার পরিচয় দেয়। হিন্দুত্ববাদ যেখানে পরধর্মীকে 'ম্লেচ্ছ' ছাড়া আর-কিছু মনে কবে না—মুসলমানত্ব তেমন গোঁড়া নয়। যে-কেউ তা গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত, মুসলমানের সংখ্যা বাড়ানোই ইসলামের নির্দেশ। সুলতানরা বঙ্গবিজয়ের পরে সেই ব্রতই নিয়েছিলেন। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী, রক্তপিপাসু সুলতানরা যে নিছক ধর্মীয় ভাবাবেগেই ইসলাম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা বিশ্বাস করা শক্ত। শাসনক্ষমতা ভোগ করাব জন্য বিরুদ্ধবাদীকে স্বধর্মে বশীভূত করার রাজনৈতিক তাগিদই সেখানে মুখ্য হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। কেননা, বিরুদ্ধবাদীর চেয়ে অধীনস্থ প্রজাকে শাসন করা অনেক বেশি সহজসাধ্য। সন্ত্রাসের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা ভোগ করতে এবং টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন সুলতানেরা।

অবশ্য, কেবল বাহুবলেই নয়, স্বেচ্ছা-ধর্মান্তরের একটি সুবিস্তৃত অধ্যায়েরও সূচনা হয় এই সময় থেকে। ইতিহাসেব সঙ্গে মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও এর উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণীয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসমষ্টিই এই স্বেচ্ছা-ধর্মান্তরে আগ্রহী হয়েছিল। ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকরা এর সম্যক কারণ-নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মতে এই ধর্মান্তরের কারণ যতখানি না ধর্মীয়, তার চেয়ে বেশি আর্থ-সামাজিক।

হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পূর্ব-ভারতে কখনওই সে-ভাবে সর্বজনীন প্রভাববিস্তাব করতে পারেনি। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তুলনায় পূর্ব-ভারতে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুত্ববাদীরা সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ ছিল না। বৌদ্ধধর্ম এখানে তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণিকে কখনও বিশেষ সুনজরে দেখেনি। ফলে, ব্রাহ্মণ্য আচার-বিচার, জাতপাত অন্ত্যজশ্রেণিকে দূরে ঠেলে রেখেছিল। জমির মালিকানা উচ্চবর্ণের করগত থাকায় শ্রেণি-শোষণও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এইসব অবমাননা ও শোষণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে মুসলমান-বিজয়ের আগেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মের অনুগামী হয়েছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তখন চরম বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই ছিল। পাল-যুগের বৌদ্ধরা সেন-যুগে নিগৃহীত হয়েছিলেন। সেই নিগৃহীত জনগোষ্ঠীকে মুসলমানরা সাদরে আশ্রয় দিয়েছিল দল ভারী করার তাগিদেই।

সেন-যুগে বৌদ্ধধর্ম অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরাও তন্ত্রমতের আকর্ষণে জড়িয়ে পড়েন। পাল-যুগে সমাজের সমস্ত শ্রেণিই রাজানুকূল্য পেয়েছিল। কিন্তু সেন-যুগে কৃষকশ্রেণি ও তথাকথিত নিম্নবর্গীয় জনসাধারণ অবহেলা ও শোষণের শিকার হয়েছিল। তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণ-শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ ও

ক্রোধই বৌদ্ধদেব লক্ষ্মণ সেনেব বিবোধী কবে তোলে। বৌদ্ধ-ভিক্ষুবা মহম্মদ ইক্তিযাবউদ্দিন ইবন বক্তিযাব খিলজিব চববৃত্তিও কবেছিলেন।

ঐতিহাসিক ড বমেশচন্দ্র মজুমদাব তাঁব *ডিকলাইন অফ বুদ্ধইজম* গ্রন্থে লিখেছেন, অত্যাচাবিত বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীবা হিন্দু-বাজাদেব প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষে মুসলমান-শাসককে সমর্থন কবেছিল। *ধর্মপূজাবিধান*-এব মধ্যেও আমবা এইবকম তথ্য পাই। ধর্মঠাকুবেব পূজাবিধিব মধ্যে আমবা যে-তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মেব বীতিনীতিব সংমিশ্রণ লক্ষ কবি, তা এই সময থেকেই হযেছিল। বস্তুত, ব্রাহ্মণ্য অত্যাচাবেব ফলে অন্ত্যজ হিন্দুদেব নিযে এই ধর্মীয শাখাটি গডে ওঠে। ইসলামকে 'মুক্তিব দূত' হিসাবে গণ্য কবেছিলেন বৌদ্ধবা। কেননা, বর্ণ হিন্দুদেব অত্যাচাবে তাবা ক্রমশই সমাজে কোণঠাসা হযে পডেছিলেন। এই ধর্ম-শাখাটিব সঙ্গে সে-কাবণে মুসলমান-ধর্মেব এক মিশ্রণ লক্ষ কবা যায। হিন্দু দেব-দেবীবা সে-সময মুসলমান-নামে রূপান্তবিতও হযেছে। মধ্যযুগীয ইতিহাসেব বিশ্লেষণে ড বমেশচন্দ্র মজুমদাব দেখিযেছেন, এই সংমিশ্রণে ধর্ম হল যবন, বিষ্ণু হন পযগম্বব, ব্রহ্মা পাকাম্বব, শিব আদম, গণেশ গাজি, কার্তিক কাজি, চণ্ডী হাযাবিবি, পদ্মাবতী বিবি নুব ইত্যাদি।

এ ভাবেই বর্ণ-ব্রাহ্মণেব নিপীডন এডাতে অন্ত্যজশ্রেণিব মানুষ ইসলামে আকৃষ্ট হন, তাকে স্বাগত জানান। এই শ্রেণিব মানুষ স্বেচ্ছায ইসলামে ধর্মান্তবিত হন। পূর্ববঙ্গেব ধীবব, কৃষক, নিযাদ, জলদস্যু-শ্রেণিব কাছে মুসলমান-ধর্ম প্রচাবকবা ইসলামেব একেশ্ববাদ ও সাম্যেব বাণী প্রচাব কবে এই শ্রেণিকে আকৃষ্ট করেন। একদিকে মৌলবিদেব কাছে এই অন্ত্যজশ্রেণি উন্নততব জীবনবোধেব সন্ধান পায, অন্যদিকে ইসলাম যেহেতু এইসব মানুষকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখে, সেহেতু তাবাও নিজেব ধর্ম বিসর্জন দিযে ঘোব হিন্দুবিদ্বেষী তথা-কট্টব-মুসলমান হযে ওঠে। গাযেব জোবে ধর্মান্তবকবণেব চেযে এই ধর্মান্তব সামাজিকভাবে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে।

বলপূর্বক ও স্বেচ্ছায ধর্মান্তবেব পাশাপাশি ঐহিক লাভালাভেব আশাযও ধর্মান্তবেব ঘটনা ঘটেছিল বাংলায। মর্যাদালাভেব আশায অনেকেই স্বেচ্ছায ধর্মান্তবিত হযেছেন। অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক সুবিধালাভেব লোভে ধর্মান্তবেব ঘটনা কম ঘটেনি। হিন্দু-সমাজে যেহেতু এইসব মানুষ আর্থ-সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত ছিল, সেহেতু এবা বিকল্প পথও খুঁজেছিল খুব স্বাভাবিক প্রবণতায। মুসলমান হলে বাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থেকে অনেকাংশে মুক্তি মিলত।

অন্যদিকে, ড সুকুমাব সেন তৎকালীন সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিযে জানিযেছেন যে, কেবল নিম্নবর্ণেব হিন্দুবাই নন, অনেক উচ্চবর্ণজাত হিন্দুও সে-সময সামাজিক, বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক লাভালাভেব উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায ধর্মান্তবিত হযেছেন। বৃন্দাবন দাসেব পদ উদ্ধৃত কবে সুকুমাব সেন তাঁব মন্তব্যেব যাথার্থ্য নিরূপণ কবেছেন

হিন্দুকূলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ,
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম,
আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।

বৃন্দাবন দাস ধর্মের নিরিখে এ-জাতীয় ধর্মান্তরে বিদ্রূপ পোষণ করলেও, সামাজিক প্রেক্ষিতে এ-জাতীয় ধর্মান্তরের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য, এ-জাতীয় ধর্মান্তরের কার্যকারণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কেননা, নিম্নবর্ণের জনসাধারণের ইসলামধর্ম-গ্রহণের কারণাকারণ যতটা সহজবোধ্য, এ-ক্ষেত্রে তা নয়। কেননা, বর্ণ-হিন্দুদের ক্ষেত্রে স্ব-সমাজের শোষণ এবং অবমাননা-অবহেলার প্রশ্ন ওঠে না। অনুমান করা হয়, এ-ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে 'পতিত' হওয়াই অন্যতম কারণও। হিন্দু-অনুশাসন উপেক্ষা করে এই জাতীয় বর্ণ-হিন্দুরা প্রায়শই স্ব-সমাজে পতিত হয়ে পড়তেন। সাধারণত, অপেয় পানীয় (মদ), অমেধ্য খাদ্য (গোমাংস), অবৈধ প্রণয় বা বিবাহ, ম্লেচ্ছদের (মুসলমানদের) সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দুসমাজে 'একঘরে' করার রীতি খুবই প্রচলিত ছিল। 'জাতিনাশের' কারণে সমাজে সে অপরাধী বলে গণ্য হত। শাস্তিস্বরূপ তার যাবতীয় সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার উপায়গুলি কেড়ে নেওয়া হত। এর ফলে অনেকেই আত্মঘাতী হতেন, যেতেন দেশান্তরেও। যাঁরা তা করতেন না, তাঁরা ধর্মান্তরকেই শ্রেয় মনে করে ইসলামে দীক্ষা নিতেন। তাতে আশ্রয় ও ইনাম দুই-ই মিলত।

অনেকক্ষেত্রে অবশ্য বর্ণহিন্দু নিজের অজ্ঞাতে ফাঁদে পা দিয়েও ফেলতেন। প্রতিবেশী বা শত্রু-মনোভাবাপন্ন মুসলমান প্রতিবেশী ষড়যন্ত্র করে নিষিদ্ধ খাদ্য-পানীয় খাওয়াত বর্ণ-হিন্দুকে, বা প্ররোচিত করত অবৈধ প্রণয়ের প্রতি। পরে বিচারের মুখে পড়ে বিড়ম্বিত হতেন অভিযুক্ত হিন্দুরা। হয় তাঁকে গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী হতে হত, না-হয় 'যবনাচার' মেনে ইসলামের বশবর্তী হতে হত। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে আমরা দেখেছি সুলতান হুসেন শাহ্ কোতোয়াল সুবুদ্ধি রায়কে নিষিদ্ধ 'কারোয়ার পানি' দিয়েছিলেন। অজ্ঞাতে তা পান করে তিনি মনোবেদনায় সংসার ত্যাগ করেন। পরে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় বৃন্দাবনবাসী হন। বিপরীতে, হিন্দুদের কঠোর আচার-বিচার মুসলমানদের কাছে ছিল চক্ষুশূল। কেননা, এইরূপ উন্নাসিকতায় একদিকে যেমন ইসলাম অপমানিত হয়, তেমনই তাতে শাসককুলও অপদস্ত বোধ করে। ফলে এ-জাতীয় কঠোর অনুশাসনকে চূর্ণ করার তাগিদও শাসকশ্রেণির কম ছিল না। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* (আদি) গ্রন্থে যবন হরিদাস-আখ্যানে আমরা এইরূপ ঘটনার বিবরণ পাই। যবন হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজির অভিযোগের ভিত্তিতে সুলতান হুসেন শাহ্ হরিদাসকে অবর্ণনীয় অত্যাচারে পীড়িত করেন। তিনি হরিদাসকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার
ভালমতে তারি আনি করহ বিচার।

ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদের ঘৃণা করে তাদের যেমন 'যবন' আখ্যা দিয়েছিল, মুসলমানরাও হিন্দুদের প্রতি একইরকম মনোভাবাপন্ন ছিল। ব্রাহ্মণরা নিজেদের যেমন 'শ্রেষ্ঠধর্মজাত' মনে করত, মুসলমানরাও একইভাবে নিজেদের 'মহাবংশজাত' বিবেচনা করত। সেই অহঙ্কারে সুলতান হরিদাসকে বললেন :

আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত,
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত।

অবশ্য, এ-ক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে, হিন্দু-কবির এহেন রচনাংশে কিঞ্চিৎ স্বীয় ধর্ম-প্রবণতা কাজ করে থাকতে পারে। যদিও, আমরা বিশ্বাস করতে চাই, সত্য বলা ছাড়া আর কোনও দায় নেই কবিতার। কিন্তু, পাশাপাশি এ-কথা মনে করারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে, মধ্যযুগের বাংলা-কাব্যগুলি যেহেতু ধর্মকাব্য—হিন্দুধর্মের নবজাগরণ ঘটাবার কারণেই সেগুলি লিখিত, সে-কারণে ওইসব কাব্যপ্রণেতারা স্বীয় ধর্মের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর তাগিদেই অন্য ধর্মকে কিছুটা অনুজ্জ্বল করার প্রয়াস পেতেই পারেন।

ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি-অভিযানের আগেই বাংলায় মুসলমান-ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, ভারতে ইসলামের প্রচার প্রাথমিকভাবে বলপূর্বক ও রক্তপাত ঘটিয়ে হয়নি। মুসলমান-সাধুসন্তরাই এর সূত্রপাত করেছিলেন। অনুমান করা হয়, তুর্কি-বিজয়ের অনেক আগেই বাংলাদেশে এসেছিলেন বাবা আদম শহিদ, শাহ সুলতান রুমি প্রমুখ সুফিসন্ত ও ধর্মীয় প্রবক্তারা। মনে হয়, পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সঙ্গে মুসলিম-যোগাযোগ ইসলামের সূচনার কয়েকশো বছরের মধ্যেই হয়েছিল। পণ্ডিতেরা বলেন, সৈন্যবাহিনী আসার আগেই ধর্মবাহিনীর পদার্পণ ঘটে। আবদুল করিম, ক্ষিতিমোহন সেন, জাফর শরিফ, রিস্‌লে প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের রচনা এই মতকেই সমর্থন করে।

এহেন শান্তিপূর্ণ উপায়েও ইসলাম এ-দেশে প্রচারিত হয়। বিদেশি অনুপ্রবেশের ফলে বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ক্রমশ ইসলাম প্রসারিত হয়ে পড়ে। ইংরেজ ঐতিহাসিক রিস্‌লে দেখিয়েছেন প্রধানত নিম্নবর্ণের হিন্দু ও উপজাতিদেরই ধর্মান্তর হয়েছিল। হিন্দুধর্মে প্রচারের বিষয়টি গৌণ। কেননা, হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরের কোনও উদ্দেশ্য নেই। অন্য ধর্মাবলম্বীকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করার বিধি হিন্দুধর্মে অনুসৃত হয় না। কেননা, হিন্দুত্ব অর্জিত হয় জন্মসূত্রে, অন্য ধর্ম ছেড়ে হিন্দুত্ব গ্রহণ করা যায় না। যদিও হিন্দুত্ব ছেড়ে অন্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েও পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' করে হিন্দুত্বে ফিরে আসার বিধান শাস্ত্রে রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মতো (খ্রিস্টান, বৌদ্ধ) ইসলামধর্মেও প্রচারেব বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রচারে স্বভাবতই হিন্দুধর্ম-সহ সকল ধর্মই, নিজ-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। ইসলাম যেহেতু ধর্মান্তরকে সবিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করে, সেহেতু সে-ধর্মে প্রচারের গুরুত্বও অপরিসীম।

লক্ষণীয় যে, ইসলামে নির্দিষ্টভাবে যাজক বা পুরোহিত নেই। ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিজেই পরম শক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রণিপাত করতে পারে। একেশ্বরবাদী ইসলাম যেমন মূর্তিহীন আরাধনায় বিশ্বাসী, সেহেতু তার ধর্মচারণা পুরোহিত-নিরপেক্ষভাবেই সাধিত হতে পারে। ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিজেই নিজের ধর্মের প্রচারক। অবশ্য, পির, ফকির, দরবেশ, গাজি, কাজি বা মৌলবিদের বিশেষ ভূমিকা ইসলামে রয়েছে। এইসব ধর্মজ্ঞানী পির-ফকিরদের সাধারণ জীবনযাত্রা, বাণী এবং ক্ষেত্রবিশেষে নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে সাধারণ মানুষ বিশেষ প্রভাবিত হতেন। মধ্যযুগে ইসলাম-ধর্মপ্রচারে এইসব প্রচারকেরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদেব উদ্যোগে বাংলায় অনেকগুলি শিক্ষা-ধর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। পরে সেইসব কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে পূর্ব-ভারতে গড়ে ওঠে বিহার শরিফ, সাতগাঁও, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, শ্রীহট্ট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শহর।

বাংলায় ইসলামধর্ম-প্রচারে সুফি-সাধকেরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা সকলেই অবশ্য বহিরাগত ছিলেন না, ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুফি-সন্তরাও এই প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। কেবল সাধারণ মানুষের উপরেই নয়, শাসকগোষ্ঠী-তথা-বৃহত্তর-ধর্ম-সমাজেও এঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। মধ্যযুগে যে-সব সুফি-সাধক ইসলাম-ধর্মপ্রচারে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন আলাওল হক, তাঁর পুত্র নুর কুতুব আলম, শেখ জালালুদ্দিন তবেজি, শাহজালাল প্রমুখ।

রক্ষণশীল, অনুশাসনগ্রস্ত, জাতপাত বিশ্বাসী হিন্দুসমাজে সুফি, পির, ফকির, দরবেশরা বিশেষ আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্ম নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষ ইসলামের বাণীকে তখন পরম-গ্রহণীয় মনে করেছিল। আর, ইসলামি প্রচারকরাও সমাজ ব্যবস্থার এই সুযোগটি গ্রহণ করেছিলেন।

কোরানের নির্দেশ-অনুসারে আল্লাহর বাণী প্রচার করে ইসলামি প্রচারকেরা যেখানে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে বিপুল সংখ্যায় ধর্মান্তরিত করে দেশে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিলেন, অনুরূপভাবে নানা কারণে বঙ্গদেশে বিদেশি মুসলিম-জনগোষ্ঠীর অভিবাসন ঘটে। এর ফলেও দেশে মুসলিম-জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মূলত তুর্ক, ফারসি, আরবি, মোগল-জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত কাজের সূত্রে এ-দেশে আসে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তারা। এর ফলে বাংলার সামাজিক জীবনেও এক নতুন অভিঘাত তৈরি হয়।

এই বিদেশি আগমনে বাংলার জনজীবন বিশেষ আলোড়িত হয়। এরা অনেকেই হিন্দু-নারীকে বিয়ে করে—যার ফলে মুসলিম-জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে। এইসব বিদেশি পুরুষদের মধ্যে স্পষ্টতই কয়েকটি স্তরভেদ ছিল। ভারত-আক্রমণের প্রথম যুগে মুসলমান-যোদ্ধারা সঙ্গে নিজস্ব নারী আনেনি। যুদ্ধজয়ের পর, দেশে ইসলাম-আধিপত্য সুদৃঢ় হলে, এ-দেশে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হলে, তারা অনেকে দেশ থেকে স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসে। অন্য অনেকেই হিন্দু-নারীর দ্বার-পরিগ্রহ করে। ইসলাম

যেহেতু বহু-বিবাহে অনুমোদন দেয়, সেহেতু অনেক বিবাহিত মুসলমানও ফের একাধিক হিন্দু-নারীকে বিবাহ করে। হিন্দু-নারী একদিকে তাদের কাছে যেহেতু নতুন অভিজ্ঞতা. সেহেতু প্রবৃত্তির বশেই তারা এই সংসর্গে আকৃষ্ট হয়। অন্যদিকে, এইরূপ বিবাহে যেহেতু মুসলমানের সংখ্যা বাড়ে, সেহেতু ইসলামও এই বিবাহ কেবল অনুমোদনই করে না, এইরকম বিবাহকে অনুপ্রাণিতও করে। এইসব বিবাহে বাহুবল এবং দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট ভূমিকা থাকত। এর পিছনে নিহিত ছিল একটি নৃশংস প্রণোদনাও। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে নারীর ভাগ্য-নির্ধারণ ছিল মধ্যযুগের এক মান্য রাজনৈতিক বিষয়। জয়ী-পক্ষ বিজিত-পক্ষের সমস্ত নারীর ভোগ-অধিকারী হত। বিশেষত, হিন্দু-নারীকে করায়ত্ত করে মুসলমান-বিজেতারা নিজেদের জয়োল্লাস এবং হিন্দুদের চূড়ান্ত অবমাননা উপভোগ করত। বিজিত নারীদের কেউ হতেন স্ত্রী, কেউ-বা দাসী। স্ত্রী বা দাসী যা ই হোন না কেন, সকলকে সর্বাগ্রে হতে হত মুসলমান। হিন্দু-রাজারাও একইভাবে অনেক মুসলমান-কন্যাদের বিয়ে করেছিলেন।

তুর্ক-আফগান যুগে এ-রকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হিন্দু-মুসলিম বিবাহের তালিকা দিয়েছেন ঐতিহাসিকরা। যেমন, ইলিয়াস শাহর (১৩৪২-৫৭) সঙ্গে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের ব্রাহ্মণ-কন্যা ফুলমতির, রাজা গণেশের সঙ্গে সুলতান আজম শাহর বিধবা-পত্নী ফুলজানির, যদু জয়মল্লের (পরে সুলতান জালালুদ্দিনে নামান্তরিত) সঙ্গে আজম শাহর কন্যা আশমানতারার, হোসেন শাহর কন্যার সঙ্গে ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ মদন ভাদুড়ির পুত্র কন্দর্পদেবের, হোসেন শাহর একাদশ কন্যার সঙ্গে মদন ভাদুড়ির একাদশ পুত্রের, হোসেন শাহর উজির চতুরঙ্গ খানের (তিনি ধর্মান্তরিত মুসলমান। নিজের মুসলমানত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করতে তিনি মুসলমান-রমণীকে বিয়ে করেন) সঙ্গে জনৈক মুসলিম-কন্যার, পির খান জাহান আলির সঙ্গে সোনামণির (স্বামীর মৃত্যুর পর সোনাবিবি ঘোড়াদিঘিতে আত্মহত্যা করেন। জাহান আলির মুসলমান পত্নী বাঘিবিবি ওই দিঘির পশ্চিমপ্রান্তে সমাধিস্থ), এক ফকিরের সঙ্গে সাতক্ষীরার রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীর (ওই ফকির রাজাকে হত্যা করে রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। সাতক্ষীরার অদূরে চম্পাবতীর কবর হিন্দু-মুসলমানের যৌথ তীর্থক্ষেত্রের মহিমা পেয়েছে।), ইউসুফ শাহর সঙ্গে হিন্দু-নর্তকী মীরার (পরে মীরার নামকরণ হয় লোটনবিবি। গৌড়ের এক মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করে ইউসুফ শাহ বিবির নামে সেই মসজিদের নামকরণ করেন। সংলগ্ন দিঘিটিরও অনুরূপ নামকরণ হয়।) এবং মুর্শিদাবাদের মুর্তজা খানের সঙ্গে বৈষ্ণব-রমণী আনন্দময়ীর বিবাহের বিবরণ নানা লোকগাথায় ছড়িয়ে রয়েছে। নিছক বাহুবলে মুসলমান বা হিন্দু-পুরুষেরা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান রমণীকে বিয়ে করে কতখানি হাহাকার আর কতখানি প্রণয় অর্জন করেছিলেন, ইতিহাস তা লিখে রাখেনি। কিন্তু এই বিবাহ-প্রথা যদি প্রণয়বাহিত হত এবং সমাজের সার্বিক অনুমোদন পেত, তাহলে যুদ্ধবিগ্রহ আর কূপমণ্ডুকতার মধ্যযুগ যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক দিশা তৈরি করত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পরিবর্তে এইসব যুগপৎ নৃশংস ও করুণ বিবাহ কেবল দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম-জিঘাংসার উপকরণ হয়েই থেকে গিয়েছে।

এইসব প্রত্যক্ষ পথ ছাড়া পরোক্ষ পথেও ইসলাম বাংলায় প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। রাজনৈতিক বিজয়ের পরই জয়ী সুলতানেরা মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করতেন বিজয়সৌধ হিসেবে। মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক আলিম ও মৌলবিরা সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন পেতেন। ক্রমশ এঁরা অঞ্চল-বিশেষে প্রবল ব্যক্তিগত প্রভাব তৈরি করে ফেলতেন। মসজিদ বা কবরস্থান-সংলগ্ন উৎসবে, অনাথালয় (ইয়াতিমখানা) এবং অতিথিশালায় (মেহমানখানা) নানা জনহিতকর কাজকর্ম করতেন এইসব ইমাম এবং মৌলবিরা। সাধারণ মানুষ এ-সবে বিশেষ আকর্ষণবোধ করতেন। অন্যদিকে পির-ফকিরদের ঘিরে নানা অলৌকিক কাহিনী পল্লবিত হত। এই সবকিছুরই নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তরকরণ। সব মিলে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে ইসলাম বিপুলভাবে বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্মীয় বিস্তার প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অটুট ও প্রসারিত করার একটি উপায়-মাত্র। মধ্যযুগের ইতিহাসকে যতই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হোক না কেন—তুর্ক-আফগান-মোগল যুগকে যতই ধর্মীয় প্রবর্তনার যুগ বলে চিহ্নিত করা হোক, তা আসলে ছিল রাজনীতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মুসলমান-শাসকরা বিষয়টিকে যে-ভাবে রূপায়িত করেছেন, তাতে মনে করা হয়, ধর্মই ছিল মুখ্য, রাজনীতি গৌণ। কিন্তু, বিষয়টি মোটেই অত সরল ছিল না। আসলে, ধর্মকে সামনে রেখেই ধুরন্ধর সুলতানেরা রাজনীতির আখের গুছিয়েছিলেন।

বাংলায়-তথা-ভূ-ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক বিন্যাসটি লক্ষ করলেই আমরা বুঝতে পারি, এখানেও মুসলমান-শাসকেরা একধরনের উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বাংলা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য। এখানেও দিল্লির প্রশাসনিক নীতি-অনুযায়ী হিন্দু-প্রজাদের কোনও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। কোনও অ-মুসলমান নাগরিক এখানে পূর্ণ নাগরিক-মর্যাদা পেতেন না। কেবলমাত্র জিম্মিদের (যাঁরা রাষ্ট্রের সঙ্গে আশ্রয়ের পরিবর্তে শ্রম-প্রদান ও জিজিয়া কর দেওয়ার চুক্তি করতেন) কিছুটা সহ্য করা হত। হিন্দুরা ছিলেন আক্ষরিক অর্থে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। নানা বিধিনিষেধের বেড়াজালে বন্দি ছিলেন তাঁরা। যেমন তাঁদের ঘোড়ায় চড়া বা অস্ত্র-ব্যবহারের কোনও অনুমতি ছিল না, তাঁদের পছন্দমতো পোশাকের বদলে বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হত, তাঁরা কাজির কাঠগড়ায় সাক্ষী হতে পারতেন না, প্রকাশ্যে কোনওরকম ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান করতে পারতেন না তাঁরা। শেখ হামদানি তাঁর *জাখিরত-উল-মুলুক* গ্রন্থে জিম্মিদের উপর আরোপিত কুড়িটি বিধিনিষেধের উল্লেখ করেছেন। এইসব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডের ফরমান ছিল। এ-সব ফরমানের স্পষ্ট রাজনৈতিক কারণ ছিল। বিজিত-শ্রেণির বিদ্রোহ-সম্ভাবনার কথা ভেবেই সুলতানরা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের মধ্যে রাখতেন।

ধর্মকে সামনে রেখে শাসকগোষ্ঠী যে-সামাজিক বিন্যাস তৈরি করে, তার মুখ্য

উদ্দেশ্যই ছিল শোষণ ও ক্ষমতা বলবৎ ও নিরঙ্কুশ রাখা। তাঁরা মিশ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে 'ইসলামি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজ-দরবারে দীর্ঘ দুশো বছর কোনও হিন্দু উচ্চপদে আসীন হতে পারেননি। কোনও নীতি-নির্ধারক পদে তাঁদের নিয়োগ বন্ধ ছিল যে স্পষ্টতই রাজনৈতিক কারণে, তা সহজেই অনুমেয়। এর ফল যা হওয়াব, তা-ই হয়েছিল। হিন্দুরা দাঁতে দাঁত চেপে মুসলমান-শাসনের নিষ্পেষণ সহ্য করেছেন, আর অপেক্ষা করে থেকেছেন প্রতিশোধ নেওয়ার। গড়ে উঠেছে এক মেরুকরণ-সর্বস্ব সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং তার পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। এর একটি সামাজিক প্রকাশও থাকতে পারে। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। কোনও ব্যক্তি-মানুষ তাঁর স্বীয় ধর্মকে স্বীকার বা অস্বীকারও করতে পারে, করতে পারে ধর্মের অস্তিত্বকেই অস্বীকার, সে ইচ্ছে করলে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করে জীবনধর্ম, মানবধর্মে ব্রতী হতে পারে—এ-ও তার ধর্মীয় অধিকারের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত ধর্ম-ভাবনাকে বিন্দুমাত্র আমল দেয় না পৃথিবীর কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। ধর্মের সঙ্গে প্রাচীন যুগ থেকেই রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, আর তখন থেকেই ধর্মভিত্তিক মেরুকরণও স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছে। ফলে ব্যক্তি-মানুষের ধর্মভাবনা, ধর্মবিশ্বাস গুরুত্ব হারিয়েছে।

ধর্ম যখনই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, তখনই বিপরীতবাদী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত ধর্ম তাত্ত্বিকভাবে মানবপ্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলেও বারবাব একে অন্যের সঙ্গে বিরোধে, যুদ্ধে, রক্তপাতে, শক্তিক্ষয়ে নিয়োজিত হয়েছে। রাজনীতির ধর্ম এবং ধর্মেব বাজনীতি ব্যক্তি-মানুষের উপর তৈরি করেছে প্রবলতর চাপ। নিজস্ব ধর্মের চাপ ছাড়াও ক্রমশ তৈরি হয়েছে অন্য ধর্মেরও চাপ। প্রতিটি ধর্মই বারবার সোচ্চারে বলেছে, 'আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ। এসো, আমি তোমাকে মুক্তির দিশা দেখাব।' কখনও লোভে, কখনও ভয়ে, কখনও প্রেরণায় মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাতে ব্যক্তি-মানুষের আত্মার কোনও মুক্তি হয়নি। বরং সে নানা ব্যবহারিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। লাভ যা হযেছে, তা প্রতিষ্ঠানের—ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার।

বাংলায় মুসলমান-আধিপত্যের আগে হিন্দু-যুগে হিন্দুরা যে-ভাবে মুসলমানদের সামাজিক নিগ্রহ এবং অবমাননার মধ্যে বেখেছিল, পরবর্তিকালে মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে তাবই প্রতিশোধ নেয়। এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রাতিষ্ঠানিকতাব চাপে সাধারণ মানুষের অবস্থা যে দুর্বিষহ হয়েছিল, সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দুস্তর ব্যবধান, তা আমরা দেখেছি।

আসলে, তত্ত্বগতভাবে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মধ্যেই বয়েছে বিভেদের বীজ। একটু লক্ষ করলেই একটি ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মৌলিক বিরোধ চোখে পড়ে। এই বিরোধ যে কেবল ব্যবহারিক, তা নয়। তত্ত্বগতভাবেও ধর্মগুলির মধ্যে বিরোধ রয়েছে—রয়েছে পরস্পরবিরোধী মতবাদ। বস্তুত, ধর্মের এতরকম পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা রয়েছে যে

তাতে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে পড়ে। কেননা, এক ধর্মের সংজ্ঞার সঙ্গে অন্য ধর্মের সংজ্ঞা বিন্দুমাত্র মেলে না। এক ধর্মের ঈশ্বর অন্য ধর্মের কাছে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। হিন্দুধর্মে যেমন মূর্তিপুজোর বিধান রয়েছে, ইসলামে মূর্তি তেমনই নিষিদ্ধ। আবার হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তর একটি প্রধান বিষয়। অন্যদিকে ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মে জন্মান্তরবাদ বলে কিছু নেই। ইসলাম অথবা খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস করে, মানুষ এই পৃথিবীতে কেবল একবারই জন্মায়। মহম্মদ একবারই পৃথিবীতে জন্মেছেন, যিশুও তাই। কিন্তু বুদ্ধ আগে নানা জাতক হয়েছেন, বুদ্ধ হয়ে জন্মাবার পর তিনি বোধি লাভ করেছেন, নির্বাণ পেয়েছেন। হিন্দুধর্মে জন্মান্তরবাদে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাউল-তত্ত্বে তো একলক্ষ চুরাশি হাজার যোনি-ভ্রমণের কথা রয়েছে। খ্রিস্টধর্মেও পৌত্তলিকতার কিছুটা স্থান রয়েছে।

তত্ত্বগতভাবে হিন্দুত্ব আর ইসলাম এতটাই পরস্পরবিরোধী যে, কোনওভাবেই দুই সম্প্রদায়ের মিলন বা মিশ্রণ সম্ভব ছিল না। আমরা জানি, হিন্দুত্ব অন্তর্নিহিত পরমার্থে বিশ্বাসী, আর ইসলাম বিশ্বাস করে জ্ঞানাতীত আল্লাহর আদেশে। হিন্দুর ঈশ্বর সাকার, ইসলাম নিরাকার। হিন্দুরা বহু প্রতিমায় ঈশ্বরকে কল্পনা করে, পূজা করে ; অন্য দিকে ইসলামে মূর্তিপূজা, বহু-ঈশ্বরবাদের কোনও স্থানই নেই। ইসলাম এমনকী এক-পরগম্বরের (রসুল) অস্তিত্ব ছাড়া অন্য পয়গম্বরের কথা কল্পনাও করে না। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এর ফল হয় বিষময়। শাসক-মুসলমানদের কাছে হিন্দুর মন্দির ও মূর্তিগুলি চক্ষুশূল হয়ে পড়ে।

এইসব মৌল অমিলগুলিই প্রতিটি ধর্মের মধ্যে তৈরি করেছে বিভেদরেখা। বিশেষত, ইসলামের একেশ্বরবাদ এবং হিন্দুত্বের বহুত্ববাদ ; ইসলামের নিরাকার ধর্ম ও হিন্দুত্বের সাকার ধর্ম ; ইসলামের সর্বজনীনতা ও হিন্দুত্বের সঙ্কীর্ণতা, ইসলামের ধর্মান্তর ও হিন্দুত্বের অবিকল্প হিন্দুত্ব—এইসব তত্ত্বগত বিভেদও যে দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মিলনের পক্ষে বাধাস্বরূপ, তা আমাদের মনে রাখা দরকার। কেননা, দুই ধর্মই জানায় যে, সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অন্যটি অকিঞ্চিৎকর। এই শাস্ত্রীয় অহমিকাই মিলন ও গ্রহণকে করে তোলে সুদূরপরাহত। সে-ক্ষেত্রে মিলন সম্ভব কেবল ধর্ম ত্যাগ করলে। দুটি ধর্মহীন মানুষ নিজেদের ধর্ম ছেড়ে মিলতে পারে পারস্পরিক প্রেমে। সেখানে গড়ে ওঠে একটি তৃতীয় ধর্ম—মিলনের ধর্ম। ফকির ও বাউল-সম্প্রদায় সেই চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র কখনওই সেই ধর্মহীন-ধর্ম মেনে নেয় না। ফলে ফকির-বাউলদের চিরকাল সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশেই বসবাস করতে হয়। ইতিহাসে আমরা যে এইরকম মিলন-প্রয়াস দেখিনি, তা নয়। সম্রাট আকবর দীন-ইলাহি নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে হিন্দু ও মুসলমান-মনকে মেলাতে চেয়েছিলেন। দারা শুকো কোরান আর উপনিষদের সংমিশ্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিককালে বিনোবা ভাবে বিভিন্ন ধর্মের সারাৎসার সংকলন করে একধরনের ধর্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেইসব প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ধর্ম যেহেতু ভাবাবেগ, সেহেতু বিজ্ঞানের রসায়ন এখানে কার্যকরী হয়

না—হাইড্রোজেন-অক্সিজেন মিলে জল তৈরি হলেও, দুটি ধর্ম মিশিয়ে তৃতীয়, নতুন ও অপূর্ব একটি ধর্ম তৈরির প্রয়াস বস্তুত ব্যর্থতারই নামান্তর।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কও কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। দুটি সমান্তরাল ধর্ম, দুটি পরস্পরবিমুখ রাজনৈতিক শক্তি, দুটি ধর্ম ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিপরীতমুখিতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্পর্কের টানাপোড়েন।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদার অবনমনেও দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্মীয় সম্পর্কে আরও বেশি ব্যবধান গড়ে ওঠে। লক্ষ করার যে, এর আগে যে-সব আক্রমণকারী বাংলা অধিকার করেছিলেন, তাঁরা সংস্কৃতিগতভাবে হিন্দু-বাঙালির তুলনায় দুর্বলতর ছিলেন। ফলে তাঁরা রাজ্যজয় করলেও সংস্কৃতি ও ধর্মে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তাঁরা মিশে গিয়েছিলেন হিন্দুত্বের মূল স্রোতে।

যদিও মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটনা-প্রবাহ একেবারে বিপরীত দিকে গড়িয়েছিল। কেননা, ইসলাম এক নবীন বিশ্বজনীন ধর্ম-হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। মধ্য-প্রাচ্যের বিকশিত সভ্যতার পটভূমিকায় ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, জরোথুস্ট্রীয়বাদ, নয়া প্লেটোবাদ, বৌদ্ধধর্ম ও বেদুইন-সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত ইসলামধর্ম ইতিমধ্যেই পৃথিবীব নানা দেশে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এক আল্লাহ, এক রসুল, এক ধর্মগ্রন্থ ও এক সাম্রাজ্যের বাণী নিয়ে ইসলাম এক সহজ, সুদৃঢ় ও মৌলিক ধর্ম হিসাবে বিশ্বের নানা প্রান্তে ক্রম-প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তুলনায়-উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিজেদের হীনবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রতিহত করার ক্ষমতা হিন্দুদের ছিল না।

এই নবগঠিত ধর্ম তথা-ধর্মাবলম্বীরা সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে ভারতেও প্রবেশ করে। বাংলায় তুর্কি-আধিপত্য-বিস্তার একদিকে যেমন খর্ব করেছিল হিন্দু-শাসকদের রাজনৈতিক আধিপত্য, তেমনই তা ধর্মের উপরও প্রভাব-বিস্তার করতে থাকে। দুই ধর্মের তত্ত্বগত ও আচরণগত পার্থক্য সৃষ্টি করে অনিবার্য সংঘাত। বাঙালি-হিন্দু যেমন প্রথমাবধি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দেখেছে উন্নাসিকতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে, মুসলমানরাও তেমনই এর জবাব দিয়েছে তীব্রতর প্রতিহিংসায়।

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে আমাদের কাছে মুসলমান-সমাজ-বিন্যাস অনেক বেশি আধুনিক ও প্রগতিশীল মনে হয়। ইসলাম শ্রেণিগত, জাতিগত ও বর্ণগত ভেদগুলি সামাজিক ক্ষেত্রেও বর্জন করে। ইসলাম প্রথম থেকেই সাম্যের কথা বলেছে। অন্যদিকে হিন্দুধর্ম বর্ণাশ্রম প্রথা কেবল তৈরিই করেনি, তা সামাজিক জীবনে কঠোরভাবে বলবৎও করেছে। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মে এক পরম-গ্রহণীয় বিষয় বলে গণ্য হয়েছে একেবারে প্রথমাবধি। সামাজিক প্রথাগুলিতেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দুস্তর তফাত রয়েছে। হিন্দুর বিবাহ-সম্পর্ক যেখানে চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য, মুসলমানরা সেখানে অনায়াসেই

বিবাহবিচ্ছেদে (তালাক) ধর্মীয় সমর্থন পায়। নারীর বৈধব্য-পালনের কঠোর হিন্দু-বিধানের পাশে বিধবা মুসলমান-রমণীর পুনর্বিবাহে ধর্মীয় সমর্থন রয়েছে ইসলামে। প্রাত্যহিক জীবনচর্যায়ও দুই সম্প্রদায়ের পার্থক্য অনেক। খাদ্যাভ্যাস ও আহার-গ্রহণে দুই ধর্ম ভিন্নমুখী। হিন্দুরা যেহেতু গো-দুগ্ধ পান করে, সেহেতু গো-নিধনকে তারা মাতৃহত্যা বলেই মানে। অন্যদিকে, মুসলমানরা গো-দুগ্ধ পান করেও গো-মাংসকেই সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য বিবেচনা করে। পাশাপাশি শূকর বা কচ্ছপের মাংস মুসলমানের কাছে ত্যাজ্য (হারাম) হলেও, হিন্দু-সমাজে তা সম্পূর্ণ-বর্জনীয় নয়। হিন্দুধর্ম জাতপাত-নির্বিশেষে একত্রে খাদ্য-গ্রহণ অনুমোদন করে না। ব্রাহ্মণ যেমন কায়স্থের পাক খায় না, কায়স্থও তেমন নমো-শূদ্রের খাদ্য গ্রহণ করে না। সর্বোপরি, সমস্ত সম্প্রদায়কে একসঙ্গে বসে খাদ্য-গ্রহণের কোনও সুযোগই হিন্দুধর্ম দেয় না। এ-ছাড়া, পোশাক, সৎকার, অভিবাদন পদ্ধতি, উত্তরাধিকার আইন, কালগণনার পদ্ধতি ইত্যাদি নানা বিষয়েও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

মুসলমান-সুলতানরা যে সবক্ষেত্রেই হিন্দুদের উপর বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন, তা নয়। হিন্দু-সমাজের নানা রীতি-নীতিই তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। অনেকক্ষেত্রে ইসলাম-অননুমোদিত বহু আচার-আচরণও তাঁরা হিন্দু-জনগোষ্ঠীকে পালন করতে দিয়েছিলেন। হিন্দুদের বহু সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানও তাঁরা বন্ধ করেননি। প্রকাশ্যে পূজা-পার্বণ, বলি, প্রতিমা-শোভাযাত্রা, কীর্তন, সৎকার, মদ বিক্রি, কচ্ছপ ও শূকরের মাংস বিক্রি ও খাওয়ায় তাঁরা বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *দিল্লি সুলতানেট* গ্রন্থে এইসব নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

তবু ক্রমশ দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন এক গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়। হিন্দু-জনগোষ্ঠী সততই অবিশ্বাস ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাত। পাশাপাশি বাস করেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিপ্রেত সম্মিলন গড়ে ওঠেনি। শাসক-মুসলমান ও শাসিত-হিন্দুর মধ্যে এক অদ্ভুত স্বাভাবিক টানাপোড়েন, দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।

কেবল সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক অবস্থানেও দুই সম্প্রদায় বিভেদের বশবর্তী হয়ে পড়ে। এ-ক্ষেত্রেও কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেই ধর্ম। মুসলমান-শাসকরা যেখানে মূর্তি-ভাঙা আর মন্দির-বিনাশকে 'ধর্মসম্মত' মনে করে গৌরববোধ করতেন, হিন্দুরা তেমনই সেই ধর্মনাশের ঘটনায় বিচলিত, বিষণ্ণ, ক্রুদ্ধ হতেন। মুসলমানরা ধর্ম-প্রবণতায়, ইসলামের অনুপ্রেরণায় যে-জেহাদকে গৌরবজনক মনে করে উল্লসিত হত, হিন্দুরা সেই ঘটনায় হীনম্মন্য হত। ফলে, সুযোগ পেলে ভারতীয় হিন্দু-রাজারাও নানাসময়ে প্রতিশোধকামী হয়ে মসজিদ চূর্ণ করেছেন, মুসলমান নারীদের অবমাননা করেছেন। মহারাজা কুম্ভ মুসলমান-নারীদের বন্দি করেছিলেন, একটি মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন। মালবদেশের মেদিনী রায় মুসলমান-নারীদের ক্রীতদাসী করেছিলেন। বিজয়নগরের রাজারা মুসলমানদের হত্যা করেছিলেন, লুণ্ঠন করেছিলেন মুসলমান-নারী ও সম্পদ। সবক্ষেত্রেই

ছিল ধর্মের দোহাই। অবশ্য, এ-রকম লিপিবদ্ধ তথ্য তুলনায় অনেক কম। অনুমান করা যেতে পারে, মুসলমান-ঐতিহাসিকেরা যে-ভাবে সুলতানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিজয় উৎসাহদীপ্ত হয়ে বর্ণনা করেছেন, যেহেতু তা তাঁদেরও মুসলমান-হিসাবে গর্বিত ও উদ্দীপিত করেছিল, মুসলমান-নিগ্রহ ও পরাজয়কে তাঁরা বিপরীত কারণেই উহ্য রাখতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, মুসলমান আমলে কোনও হিন্দু সে-ভাবে রাজ-ঐতিহাসিক হওয়ার সুযোগ পাননি। ফলে সেইসব তথাকথিত হিন্দু-বিজয়ের ঘটনা হিন্দু-কলমে লিপিবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়নি। সর্বোপরি, হিন্দুরা এইসব ভাঙনের খেলার বিশেষ সমর্থক ছিলেন বলেও মনে হয় না। ফলে উক্ত ঘটনাগুলিকে তাঁরা হিন্দুত্বের সহনশীলতা এবং রক্ষণশীলতার পরিপন্থী, কলঙ্কজনক অধ্যায় বিবেচনা করেই সম্ভবত গোপন রেখেছিলেন। কিংবা, যাঁরা রাজসভার দাক্ষিণ্য পেয়েছিলেন, তাঁরা বিপরীতে আখ্যান রচনার দায় নেননি।

চতুর্দশ শতকে মুসলমান-পরিব্রাজক ইবন বতুতা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের নানা চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যেও এর নানা বিবরণ রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও রয়েছে মুসলমান-শাসনের নানা বৃত্তান্ত।

মুসলমান-শাসনের প্রথম যুগে সুলতানরা শত্রুপক্ষীয় হিন্দুদের কোনওরকম উচ্চ রাজপদে বসাননি। কেননা, তাঁদের পক্ষে হিন্দু-প্রশাসকদের বিশ্বাস ও নির্ভর করা স্বাভাবিকভাবেই দুরূহ ছিল। কিন্তু, ঘটনাচক্রে এই অবস্থার অনেক পরিবর্তনও হয়। ক্রমশ হিন্দু-আমলারা যেমন সুলতানের আস্থা অর্জন করেন, তেমনই অনেকক্ষেত্রে মুসলমান উজির-ওমরাহরাও বিদ্রোহ শুরু করেন। ফলে সুলতানি প্রশাসনে ধীরে-ধীরে হিন্দু-আধিপত্য বাড়তে থাকে। মুসলমান আমির ও জায়গিরদাবরা প্রায়শই সুলতানের প্রাপ্য কর-প্রদানে অসম্মত হতেন। এই অবস্থায় হিন্দু-জমিদারদের ক্ষমতা-প্রদান করতে থাকেন মুসলমান-শাসকেরা। আমরা দেখেছি, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭) বহু হিন্দুকে রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। আমির খসরুর বিবরণে জানা যায়, গৌড়ের সুলতানের পক্ষে হিন্দু-সেনারা উড়িষ্যা-অভিযানে অংশ নিয়েছিল। অন্যদিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও হিন্দুদের কিছু-কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়। কর-আদায়ের দায়িত্ব বর্তায় হিন্দু-জমিদারদের উপর। গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের নিজস্ব প্রাচীন শাসন-ব্যবস্থাও মুসলমান-শাসকগোষ্ঠী বহাল রেখেছিলেন। এ-সময় সমাজে 'ভুঁইয়া' নামে একটি শ্রেণির জন্ম হয়। এঁরা আসলে হিন্দু 'ভৌমিক'-বংশীয়। এঁরা জমিদার-হিসাবে প্রশাসনিক খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস এই শ্রেণির উপর বিশেষ নির্ভর করতেন। এই উচ্চশ্রেণির আর্থিক স্বার্থ সুলতানের সঙ্গে জড়িত থাকায় দুই পক্ষের একধরনের প্রয়োজনভিত্তিক বোঝাপড়া হয়। উত্তরবঙ্গের ভুঁইয়ারা নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও গঠন করেছিলেন। ক্রমশ এই শ্রেণি সুলতানদের কাছে খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভাদুড়িয়া (ভাতুরিয়া) পরগনার হিন্দু-জায়গিরদার জগদানন্দ ভাদুড়ি শামসুদ্দিনের প্রধান উজির ছিলেন।

এ-কথা স্বীকার করতেই হয় যে, ব্যবহারিক কারণে হলেও, সুলতানদের সঙ্গে হিন্দু-জনগোষ্ঠীর একাংশের একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ক্রমশ একধরনের সম্প্রীতির আবহও তৈরি হচ্ছিল। বস্তুত, সুলতান হুসেন শাহ ছিলেন এই ধারার পথিকৃৎ। পরে গণেশ (১৪১০-১৮) ও জালালুদ্দিনের (১৪১৮-৩৩) শাসনকালে গৌড়-দরবারে হিন্দু-পণ্ডিত ও প্রশাসকদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়। পরে সেই ধাবা অনুসৃত হয় অন্য সুলতানদের আমলেও। রাজস্ব ও সেনাপতিত্বের দায়িত্বেও বহাল হন হিন্দুরা। মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসে আমরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য হিন্দু-শ্রেণির আধিপত্য লক্ষ্য কবেছি। সুলতানবা প্রশাসনের অনেক গুরু দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। গণেশ ও জালালুদ্দিনের সময় পণ্ডিত ও প্রশাসকরূপে বৃহস্পতি মিশ্র বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কয়েকজন গৌড়াধিপতির মন্ত্রী হয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিভিন্ন শাসককে প্রীত করে তিনি কবিচক্রবর্তী, কবিপণ্ডিতচূড়ামণি, পণ্ডিতসার্বভৌম, রাজপণ্ডিত, মহাচার্য, বায়মুকুট ইত্যাদি খেতাব এবং হার, কুণ্ডল, রতনচূড়, ছত্র ও তুরগ উপহার পেয়েছিলেন।

সুলতান হুসেন শাহর আমলেও ব্রাহ্মণরা রাজসভায় বিশেষ সমাদৃত হয়েছিলেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামী নামে দুই পণ্ডিত ও কবি-ভ্রাতার বিবরণ আমরা ড. সুকুমার সেনেব *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথমপর্ব) গ্রন্থের *মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী* শীর্ষক অধ্যায়ে পাই। এই দুই ভ্রাতা ছিলেন একাধারে প্রশাসক ও কবি. সনাতন ছিলেন 'দবীর-খাস' (ব্যক্তিগত সচিব) এবং রূপ ছিলেন 'সাকর মল্লিক' (রাজস্ব সচিব)। এঁদের পূর্বপুরুষ কর্নাটের রাজা বা ভূস্বামী ছিলেন। রূপেশ্বর সম্পত্তি-বঞ্চিত হয়ে শিখরভূমে বাস কবেন। তাঁর পুত্র পদ্মনাভ রাজা দনুজমর্দনের অনুরোধে নরহট্টক (অধুনা নৈহাটি) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁব কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দর পুত্র কুমারের তিন পুত্র—সনাতন, রূপ ও বল্লভ। বল্লভের পুত্র জীব। বল্লভ মুদ্রাশালার অধ্যক্ষর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এঁদের অন্যান্য আত্মীয়রাও উচ্চ-রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কায়স্থ-শ্রেণির প্রভাবও যথেষ্ট ছিল মুসলমান-শাসনে। প্রশাসন-পরিচালনা ও সেনাবাহিনীর সংগঠনে এই শ্রেণিব বিশেষ অধিকার ও প্রতিপত্তি তৈরি হয়েছিল। রাকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪) মালাধর বসু নামে এক হিন্দু-কায়স্থকে প্রধান রাজ-কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর বংশধরেরাও রাজ-দরবারে বহু দায়িত্বশীল পদে বৃত ছিলেন। অন্যদিকে গৌর মল্লিক নামে এক সেনাপতি ও রামচন্দ্র খান নামে এক প্রশাসকের উল্লেখও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই রামচন্দ্রের সহায়তায়ই শ্রীচৈতন্যদেব, সুলতান ও উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সংঘর্ষের সময়ে, বাংলা-সীমান্ত পেরিয়ে নীলাচলে (উড়িষ্যা) গিয়েছিলেন। হুসেন শাহর এক উজির ছিলেন বর্ধমানবাসী গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খান। বৃন্দাবন দাসের *শ্রীচৈতন্যভাগবত* ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এইসব হিন্দু-রাজপুরুষদের বিবরণ রয়েছে।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছাড়া বৈদ্য-সম্প্রদায়ও সুলতানি আমলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাজ-পরিবারের অন্তঃপুরে বিশ্বস্ত বৈদ্যরা ছাড়া অন্য কেউ সঙ্গত কারণেই চিকিৎসার সুযোগ পেতেন না। হুসেন শাহর প্রধান চিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দ দাশ (গুপ্ত)। এই বৈদ্য-শ্রেণি পাল ও সেন-বংশোদ্ভূত। এ-ছাড়া ছত্রী ও বণিকদের মধ্যে কেশব ছত্রী ও কুলধরের উল্লেখ পাওয়া যায় সুকুমার সেনের গ্রন্থে। মুসলমান-রাজসভায় হিন্দু-রাজ-কর্মচারীরা যে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে বিবাজিত ছিলেন, তা বোঝা যায় বিভিন্ন পদবি-খেতাবের ব্যবহারে। মুসলমান-বিজয়ের প্রথম দুশো বছর নৈরাজ্য ও অশান্তিতে অতিবাহিত হলেও চতুর্দশ শতকের শেষে বাংলায় স্বাধীন ইলিয়াস শাহী-বংশের আধিপত্য স্থাপন হলে দেশে সুস্থিতি ফিবে আসে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও অনেক কমে। সুলতানরা নিজেদেব স্বার্থেই প্রশাসনে হিন্দু-কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। তাঁদের যথাবিহিত সম্মান প্রদানও করেছিলেন সুলতানবা। এই উদ্দেশ্যে দ্বিস্তর পদবি-প্রদান-পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন তাঁবা। প্রথম (প্রাচীন) স্তরে ছিল নিয়োগী, চৌধুরী (মুকুন্দরাম লিখেছেন : *'নিয়োগী চৌধুরী নহি না করি তালুক'*।) এবং দ্বিতীয় (নবীন) স্তরে ছিল শিকদার, ডিহিদার, মজুমদার, বক্‌সি ইত্যাদি।

এ-সময় হিন্দু-বাঙালির পরিচ্ছদে মুসলমানি প্রভাব লক্ষিত হয়। রাজ-দরবারে হিন্দু-বাজা ও সেনাপতিরা মুসলমানি পোশাক পরা শুরু করেন। আচার্য সুকুমার সেন সম্পাদিত রূপরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল* কাব্যে (সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত) আমরা এই তথ্যের সমর্থন পাই :

পরিল ইজার খাসা নাম মেঘমালা
কাবাই পরিল দশ দিগ করে আলা
পামরি পটুকা দিয়া বান্ধে কোমর বন্ধ...

সুলতানের (শাহ্‌সুজা) হিন্দু-সেনাপতি লাউসেনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন রূপরাম। বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের তারতম্য লক্ষ করা যায় শহরে ও গ্রামে। সাধারণত গ্রামীণ জীবনে এই সম্পর্ক অনেক প্রীতিপূর্ণ ছিল। বস্তুত, গ্রাম-জীবনে স্বার্থের প্রশ্নটি যেখানে অনেকটাই সীমায়িত, সেখানে সম্পর্কের জটিলতাও ছিল হ্রস্ব। ব্রাহ্মণরা তথাকথিত ম্লেচ্ছ-আচার বর্জন করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। মুসলমানবাও হিন্দু-পণ্ডিতদের প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

প্রসঙ্গত আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব ও কাজির বাদানুবাদ-অংশে কাজির সংলাপে এই গ্রাম-সম্পর্কের বিবরণ লক্ষ করতে পারি। চৈতন্যদেবের প্রকাশ্যে কীর্তনের উপর কাজি নিষেধাজ্ঞা জাবি করায় চৈতন্যদেব সদলবলে কাজির বাড়িতে চড়াও হন। কাজি চৈতন্যর রুদ্রমূর্তি দেখে তাঁর সঙ্গে চৈতন্যর গ্রাম-সম্পর্কের উল্লেখ করেন :

গ্রাম-সম্পর্কে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা,

দেহ-সম্বন্ধে হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা,
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার কাজির এই উক্তিকে বিদ্রূপ বলে গণ্য করেছেন। তবু এহেন গ্রাম-সম্পর্ক একেবারে তুচ্ছ মনে করারও কোনও কারণ নেই। আমরা দেখেছি, ধর্মান্তরের পরেও বহু মুসলমান পূর্বের হিন্দু-নাম রক্ষা করে চলতেন। 'বিবি মালতী' বা 'শুভোধন' ইত্যাদি নামগুলি এই সত্যের প্রতিষ্ঠা দেয়। হিন্দুদের নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানদের অংশগ্রহণও ক্রমশ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজিরা প্রাতিষ্ঠানিক কারণে নাম-সঙ্কীর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও সাধারণ মুসলমান-সমাজ তা যথেষ্ট উপভোগ করতেন। বিজয়গুপ্তর *মনসামঙ্গল* এবং বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* (আদি) গ্রন্থে অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

মধ্যযুগে সারা পৃথিবীর ধর্ম ও সমাজ ছিল অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত। এশিয়া ও ইউরোপের চিত্রটিও ছিল একরকম। ভারতের ক্ষেত্রেও তার কোনও অন্যথা ছিল না। বাংলায় ধর্ম-কেন্দ্রিক শাসন-পদ্ধতি দুই সম্প্রদায়কে পরস্পর-বিদ্বেষী করে তুলেছিল। সুলতানরা রাজ্যজয়ের পর ইসলামের প্রসারের প্রতীক হিসাবে মসজিদ নির্মাণ করতেন, মন্দির চূর্ণ করতেন। অনেক সময় মন্দিরই রূপান্তরিত হত মসজিদে। অনেক বৌদ্ধস্তূপেও মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

অবশ্য এর একটি অন্য দিকও রয়েছে। এইসব রূপান্তরিত মসজিদ, দরগা, কবর, মাজারগুলিকে কেন্দ্র করে পরবর্তিকালে হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠী এক অন্যতর ঐক্যে পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়। বহু দরগা বা মাজারে দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ই যুক্তভাবে উপাসনায় ব্রতী হয়েছে। এখনও সে-রকম দৃষ্টান্ত কম নেই। মালদহে সুলতান সিকন্দর শাহ-নির্মিত আদিনা মসজিদ বা নুর কুতুব আলমের মসজিদ ও দরগা, গৌড়ে ভাগীরথীর তীরে জালালুদ্দিন ফতে শাহর গুণবন্ত মসজিদ, রাজশাহীর নিমাই শাহের দরগা, চব্বিশ পরগনার হাড়োয়া গ্রামে বৈষ্ণব গোরাচাঁদের মসজিদ বা ঘুটিয়ারি শরিফে পিরগাজি মুবারক আলির দরগা ও মসজিদ, মল্লিকপুরের কাছে মহিনগরে হুসেন শাহের উজির পুরন্দর খানের (হিন্দু-নাম গোপীনাথ বসু) মসজিদ, সুন্দরবনে অঞ্চলে ধবধবি গ্রামে বরখান গাজির দরগা (এখানে স্থাপিত গাজির মূর্তির সামনে এখনও প্রতি শুক্রবার মুসলমানরা নামাজ পড়েন), লক্ষ্মীকান্তপুরে মণিবিবির কবর ও মসজিদ, গোবরডাঙ্গায় পির ঠাকুরের থান বা ওলাবিবির থান, বীরভূমের পাথরচাপুড়িতে দাতা মাহবুব শাহর মাজার, কালনায় বদর সাহেব ও মজলিম সাহেবের কবর ইত্যাদি অজস্র হিন্দু-মুসলমান যৌথ ধর্মাচরণের ক্ষেত্র রয়েছে।

এ-ছাড়া মুসলমানের মহরম-তাজিয়ার সঙ্গে হিন্দু-পৌত্তলিকতার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন মুসলমান-সংস্কারকরা। হিন্দুর দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন বা রথযাত্রার সঙ্গে মহরমের সমূহ সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন গোঁড়া মুসলমানরা। একে তাঁরা ধর্মবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান

রূপেও চিহ্নিত করেছিলেন। জেমস ওয়াইস জানিয়েছিলেন, পাটনা ও বিহার শরিফ-অঞ্চলের ১৪০০ তাজিয়া শোভাযাত্রার মধ্যে ৬০০টির পরিচালনায় যুক্ত ছিল হিন্দুরা। প্রাতিষ্ঠানিকতার বিপরীতে সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ এ-ভাবেই প্রবাহিত হয়েছিল।

স্থানীয় লোকাচারগুলির সঙ্গেও হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভাবাবেগ জড়িয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র, ওঝা, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি বিষয়ে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যথেষ্ট সাদৃশ্য তৈরি হয়েছিল। বাংলা-বিহারের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ওলাওঠা রোগের কবল থেকে বাঁচতে দুই সম্প্রদায়ই 'ওলাদেবী'-তথা-'ওলাবিবি'-র পূজা সেই মধ্যযুগ থেকে আজও করে থাকেন। একইভাবে ছুরি-পরিকে দুই সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করে এসেছে। হিন্দুর সহমরণ-প্রথানুসরণে জীবিত মুসলমান স্ত্রী-ও ক্ষেত্রবিশেষে মৃত স্বামীর সঙ্গে কবরস্থ হয়েছেন। ক্রমশ হিন্দুর বিবাহ-পণপ্রথা বা আড়ম্বর মুসলমান-সমাজেও স্থান করে নিয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই বিবাহিতা মুসলিম-রমণীর কপালে-সিঁথিতে সিঁদুরচিহ্ন লক্ষ করা যায়।

অর্থাৎ লক্ষ করার, সমাজের বা রাজনীতির উপর-স্তরে স্বার্থবাহিত যে-ভেদবুদ্ধি প্রবহমান ছিল, নীচের মহলে প্রবাহিত হয়েছে তার বিপরীত মিলনাভিলাষী ঢেউ। হয়তো শিক্ষার অভাবে সমাজেব নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষ নানা কুসংস্কারের ক্ষেত্রেই একীভূত হয়েছিল। কিন্তু, উচ্চবর্ণের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ যে-উন্নাসিকতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে পবিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হতেন বা হন, তাকেও খুব সু-সংস্কার বলা যায় না। রাজনীতি, বিধান বা শরিয়তের বাইরে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জীবনের প্রয়োজনে, আবেগেব বশে সম্মিলনের যে-গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল, তা নিশ্চয়ই ছোট করে দেখাব নয়। স্থানীযভিত্তিক নানা লোকাচার-তথ্যেব গভীর অনুধাবনই বোঝায, ধর্ম বা রাজনীতি নয়—মানুষই শেষ কথা।

বাংলার সুফি-সাধক ও পরিবর্তিকালে বাউল-সম্প্রদায় এই সমন্বয়ের বাণীই প্রচার করেছিলেন। অন্যদিকে মুসলমান-শাসনে-নাভিশ্বাসগ্রস্ত হিন্দুধর্মের নবজাগরণের জন্য একক প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬ ১৫৩৩)। মুসলমান-শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন নাম-সঙ্কীর্তনের মায়ায়। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হিন্দুধর্ম এক নবজাগরণের মুখোমুখি হয়। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে স্থান হয়েছিল যবন হরিদাসেরও। তিনি মুসলমান-শাসনের বিরোধিতা করলেও মুসলমানকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করেননি। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতাই করেছিলেন তিনি। ঠিক যে-ভাবে 'দিন ইলাহি' নামে এক নব্যধর্মের অবতারণা করে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছিলেন সম্রাট আকবর।

মোগল-পাঠান-যুগেব অবসানে ভারতে যখন ইংরেজ-শাসনের যুগ শুরু হল, তখন সুসংস্কৃত জাতি ইংরেজও ফের ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে গড়িয়ে দেওয়ার প্রযাস পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের পুরনো টানাপোড়েনকে তারা প্রথমাবধি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। বারবার নানা উপায়ে খুঁচিয়ে দিয়েছে পুরনো ক্ষত।

ইতিহাসের সারণি লক্ষ করলে আমরা দেখব, ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কংগ্রেসের নেতৃত্বে শুরু হয়ে ক্রমশ তা একপেশে হয়ে পড়ে। দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা কবা, তার সঙ্গে পৌত্তলিকতাকে ওতপ্রোত করে ফেলা, অনগ্রসর মুসলমান-সমাজকে আন্দোলনের মূল স্রোতে না-আনা—এইসব কার্যকারণে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। মুসলমান-জনগোষ্ঠী ক্রমশ এই আন্দোলন থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সুযোগটি ভালভাবেই কাজে লাগায় ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদ। তারা হিন্দু ও মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনায় দুই সম্প্রদায়কেই নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়াব ইন্ধন যোগায়। কেবল উৎসাহ যোগানোই নয়, তারা বাংলায় এর অনুকূল পরিস্থিতি-সৃষ্টিরও নানা উদ্যোগ নেয়। দুই সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলার নানা চক্রান্ত ফলপ্রসূ করে তোলে তারা। শেষপর্যন্ত, ১৯০৫ সালে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বৃহত্তর বাংলাকে বিভক্ত করার উদ্যোগ নেয় তারা। যদিও সে-ক্ষেত্রে আয়তনের বিস্তৃতির অজুহাত দেখানো হয়েছিল—বলা হয়েছিল প্রশাসনিক অসুবিধার কথা। কিন্তু, এর মধ্যে আসলে নিহিত ছিল ইংবেজের সুকৌশলী মনোভাব। হিন্দু-মুসলমান-সমৃদ্ধ বৃহত্তর বাঙালি-জনগোষ্ঠীকে বিভাজিত করলে যে সম্মিলিত শক্তি অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হবে, তা বুঝতে পেরেছিল শাসকগোষ্ঠী। বিখ্যাত 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি প্রযোগ করে সাম্রাজ্যবাদী ইংবেজ সাবা ভাবতেব মতো বাংলায়ও একাধিপত্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হযেছিল। সেই উদ্দেশ্যেই ইংবেজ-সরকাব একদিকে পশ্চিমবাংলা, বিহার, উডিয্যা ; অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ ও অসমকে রেখে বৃহত্তর বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে। এর ফলে সাম্প্রদাযিক রাজনীতি সামাজিকভাবেই প্রতিষ্ঠা পায়।

বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িয্যা ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ছিল একটি প্রাদেশিক শাসনের অধীনে। ১৮৭৪ সালে অসমকে অবশ্য একজন পৃথক মুখ্য প্রশাসকের অধীনে এক পৃথক প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এর আগে ভৌগোলিক-কারণে-সংযুক্ত বাংলাদেশকে শাসন করার কিছু প্রশাসনিক অসুবিধা হচ্ছিল ঠিকই। ফলে সেই বিরাট প্রদেশকে প্রশাসনিক কারণে বিভক্ত করারও কিছু যৌক্তিকতা ছিল। ব্রিটিশ-ভাবতীয় সরকার আপাতভাবে বঙ্গভঙ্গেব জন্য এই যুক্তি দেখালেও, তাব পিছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল মুখ্য, তা পরবর্তিকালে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ-ভারতীয় সবকারের বিভিন্ন নীতি, সরকারি ভাষ্য ও নানা নথিপত্র ঘেঁটে ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করেছেন।

বস্তুতপক্ষে, বঙ্গ-বিভাগের আসল কারণটি ছিল রাজনৈতিক। আমরা দেখেছি, মুসলমান-শাসনকাল থেকে শুরু করে ইংরেজ-শাসনের প্রথম পর্ব পর্যন্ত মুসলমান-জনগোষ্ঠী কেবল ধর্মকে কেন্দ্র করে জীবন কাটিয়ে গিয়েছে। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের বিন্দুমাত্র উদ্যোগ যেমন নেওয়া হয়নি, মুসলমানরাও সে-রকমভাবে শিক্ষাগ্রহণের কোনও আগ্রহও দেখায়নি। ফলে, ক্রমশই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ-শাসনের শুরু থেকে সিপাহি-যুদ্ধের আগে পর্যন্ত হিন্দুরা

ব্রিটিশের সঙ্গে যে-রকম সহযোগিতা করেছে, মুসলমানরা তা করেনি। নবগঠিত হিন্দু-ধনিকশ্রেণি নিজেদের স্বার্থে ইংরেজের সঙ্গে এই সহযোগিতার পথে চললেও উচ্চবিত্ত মুসলমানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন করেননি। ইংরেজিশিক্ষা-গ্রহণে মুসলমানরা আগ্রহ-বোধ করেননি, হিন্দুরা যেমন করেছিলেন। তার ফলে মুসলমানরা ক্রমশই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে ছিটকে পড়ছিলেন। বিপরীতে, একদিকে ইংরেজ-সহযোগিতা, অন্যদিকে ইংরেজি-শিক্ষা হিন্দুদের অর্থনৈতিকভাবেও ক্রমশ সম্পন্ন করে তোলে। আর এই অর্থনৈতিক বিভেদের ফলে দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাও ফের মাথাচাড়া দেয়। হিন্দু-ভূস্বামীরাও সে-সময় শ্রেণিস্বার্থে মুসলমান প্রজা ও কৃষি-শ্রমিকের উপর নানা অত্যাচার ও শোষণ চালায়।

১৮৫৭ সালে সিপাহি-বিদ্রোহ ইংরেজকে একটি বড় ধাক্কা দেয়। মুসলমান-উচ্চবিত্ত-সমাজও ক্রমশ নিজেদের স্বার্থে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার অবস্থান গ্রহণ করে। আর সুচতুর ইংরেজও এই সুযোগটি গ্রহণ করে। কেননা, ইতিমধ্যেই হিন্দু-উচ্চবিত্তশ্রেণি কংগ্রেসের মাধ্যমে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে, তাতে ব্রিটিশ-সরকার সঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, ওই আন্দোলন ক্রমশ সুদূরপ্রসারী হবে। ফলে তারা সূচনায়ই তা প্রতিরোধ করার জন্য সক্রিয় হয়েছিল। নিজেরা আড়ালে থেকে এই প্রতিরোধের কাজটি তারা করাতে চাইল কোনও অভ্যন্তরীণ শক্তিরই সাহায্যে। সে-ক্ষেত্রে দেশের মুসলমান-সমাজকেই তারা নিজেদের স্বার্থপূরণের অবলম্বন হিসেবে নির্বাচন করল। অন্যদিকে কংগ্রেস দেশের মুসলমান-সম্প্রদায়কে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সে-ভাবে শামিল করতে পারেনি। ব্রিটিশ-সরকার এই সুযোগটিও গ্রহণ করল। মুসলমানদের এ-কথা বোঝানো খুবই সহজ হল যে, ওই আন্দোলনের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বার্থের ন্যূনতম যোগ নেই। কেবল বোঝানোই নয়, মুসলমান-সম্প্রদায়কে তারা প্ররোচিত করল হিন্দুদের বিরুদ্ধে, সৃষ্টি করল সংঘর্ষের পরিবেশ। হিন্দু-মধ্যবিত্তশ্রেণির অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিকাশ এবং তাদের রাজনৈতিক অবস্থান সঙ্কুচিত করার জন্য এই তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী পথ তারা খুব ভেবেচিন্তেই খুঁজে নিয়েছিল।

লর্ড কার্জনের তৎকালীন কয়েকটি ভাষণ এবং চিঠিপত্র উদ্ধৃত করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তাঁর *দি স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল—১৯০৩ ১৯০৮* গ্রন্থে এই তত্ত্বই প্রতিপাদ্য করেছেন যে, হিন্দু-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের ব্রিটিশ-বিরোধিতাকে লর্ড কার্জন মুসলমান-বিরোধিতার দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। এবং সেই তাগিদে বঙ্গবিভাগ ছিল তাদের সার্বিক পরিকল্পনারই অঙ্গ। এবং, অবশেষে, ইংরেজ সেই পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে সমর্থ হয় ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর। সে-দিনই বঙ্গবিভাগের ঘোষণা সরকারিভাবে প্রচারিত হয়।

প্রকাশ্যে প্রশাসনিক অসুবিধার কথা বলে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ইংরেজ যুক্তি-বিস্তার করলেও কার্জনের পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মিন্টো ১৯০৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি

ভাবতসচিব মর্লির কাছে লেখা একটি চিঠিতে বঙ্গভঙ্গের নিহিত উদ্দেশ্যটি জানান :

বাঙালী রাজনৈতিক আন্দোলনের হ্রাসপ্রাপ্তি উদ্বেগের একটি গুরুতর কারণ দূরীভূত কবতে সাহায্য করবে। ...অতীব বুদ্ধিগত উৎকর্ষতা ও নিজেদের বক্তব্য প্রচারের ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী, যে জনগোষ্ঠী ভারতের অন্যান্য অনেক জাতির মধ্য থেকে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে শক্তিশালী না হলেও আমাদের জনমতকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। পুরাতন প্রদেশের প্রশাসনিক অসুবিধার কথা বাদ দিলেও তাই আমি বিশ্বাস করি বিভাগের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি।

—সুমিত সরকার, দি স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল। অনুবাদ : বদরুদ্দিন উমর

দেশে খুব স্বাভাবিক কারণেই এর প্রভাব হল অপরিসীম। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক এর ফলে আবার এক দ্বন্দ্বমূলকতাব মধ্যে পড়ে। মুসলমান-সম্প্রদায় এর ফলে সাময়িকভাবে উপকৃত হলেও, বঙ্গভঙ্গ যে তাদেব কোনও সার্বিক উন্নয়নের দিশা দেখাতে পারবে না, তা তখনও অনুধাবন করেনি সাধারণ মুসলমান-সমাজ। অন্যদিকে, সম্পত্তিগত ও চাকুরিগত ক্ষেত্রে হিন্দু-মধ্যবিত্ত-সমাজ অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও, জমিদাবি ব্যবস্থা ক্রমশই অবনতির মুখোমুখি হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা হিন্দু-কুক্ষিগত আর্থিক সুবিধাগুলিতে ভাগ বসানোয় বাঙালি-হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা অনেকটাই খারাপ হতে থাকে। তাদেব মধ্যে সামাজিক অস্থিরতা ক্রমশই বেড়ে চলে। স্বভাবতই তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখান। গড়ে উঠতে থাকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গেব হিন্দুবা এই আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হন। কেবল হিন্দুবাই নয়, দুই বাংলার মুসলমানদেব একটি অংশও এই রাজনৈতিক-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বঙ্গভঙ্গকে নীতিগতভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তারা এক-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে ধর্মের নামে বিচ্ছিন্ন করার সুদূরপ্রসারী ফল যে কোনও সম্প্রদাযের পক্ষেই ভাল হবে না, তা সঠিক বুঝতে পেরেছিল। এইসব সচেতন মুসলমানবা হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। আবুল কাসেম, লিয়াকত হোসেন, আবদুল গফুর, রসুল, গজনভি, আবুল হোসেন, দীন মোহম্মদ, দেদার বক্স এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজি প্রমুখ বেশ-কয়েকজন মুসলমান-নেতা এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তবে তাঁদের প্রগতিশীল চিন্তাধারা যে সমগ্র মুসলমান-সমাজকে যুক্ত আন্দোলনে প্রাণিত করতে পেরেছিল, তা নয়। ক্রমশই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই বেশি অধিকার করে নিচ্ছিল সামগ্রিক মুসলমান-সমাজকে। এ-ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ ও অসমের লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার প্রবল প্ররোচনা যুগিয়েছিলেন। অন্যদিকে, হিন্দু-স্বাদেশিকতার সঙ্গে মুসলমান জাতীয়তাবাদীদের মানসিক সংযোগেবও অভাব ঘটছিল। এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক বদরুদ্দিন উমর তাঁর *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি* গ্রন্থে লিখেছেন .

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকারী হিন্দুবা ছিলেন প্রধানত মধ্যশ্রেণীর লোক এবং

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। এ কারণে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁরা বঙ্কিমরচিত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা প্রদান করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সভা সমিতিতে সেই সঙ্গীত গীত হতে থাকে।...মুসলমানরা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সে সময় খুব সন্দেহের চোখেই দেখতেন এবং তার থেকে দূরে থাকতেন।

এই পরিস্থিতির সুযোগ ইংরেজ সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করে। মুসলিম লিগের মাধ্যমে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ তৈরিতে সমর্থ হয় তারা। এমনকী, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দুই বাংলায় তীব্র গণ-আন্দোলনের চাপে ইংরেজ ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ-প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর পূর্ব ও পশ্চিমবাংলাকে একীভূত করে একটি সংযুক্ত প্রদেশ গঠন করা হলেও, ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যে-ভাবে উত্তপ্ত হয়েছিল, তা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হল। অবশ্য নিয়ন্ত্রণ করার কোনও সদিচ্ছা ইংরেজ-সরকারের ছিলও না। আন্দোলনের চাপে ইংরেজ বঙ্গভঙ্গ-প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেও, দীর্ঘ পাঁচবছরে তাদের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়—হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হয়। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিশিয়ে দেওয়ার মৌলিক ষড়যন্ত্রটি হাসিল হয়।

১৯২০ সালে ভারতের সামগ্রিক রাজনীতিতে 'খেলাফত' ও 'অসহযোগ' আন্দোলন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। দুই সম্প্রদায় আলাদাভাবে আন্দোলনদুটি শুরু করলেও এর মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ফলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতা কিছুটা হ্রাস পায়। অবশ্য এই আন্দোলনদুটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়াকে বিশেষ প্রাধান্য না-দিয়ে ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। ফলে, খুব অল্প সময়েই এই আন্দোলন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আবার সামনে এসে যায়। বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হলেও ১৯৪০ সাল থেকে মুসলিম লিগ আরও বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দেশভাগের দাবি তোলে। বাংলার মুসলমান-সমাজকেও নিজস্ব ভূখণ্ডের স্বপ্নে শামিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ। প্রাথমিকভাবে দেশের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি তুলেছিল মুসলিম লিগ। কিন্তু লিগের লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) আপাতভাবে খণ্ডিত রাষ্ট্র গড়ার কথা বলা হলেও, আসলে মুসলিম লিগ শুরু থেকেই অখণ্ড পাকিস্তান গঠনের কথাই ভেবেছিল।

দীর্ঘ ছয় বছর পর মুসলিম লিগের বঙ্গীয় প্রাদেশিক-নেতারা লাহোর-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে নব-নির্বাচিত লিগ-বিধায়কদের সম্মেলনে জিন্নাহ সরকারিভাবে অখণ্ড পাকিস্তানের দাবি তোলেন। প্রস্তাবে বলা হয় .

That zones comprising Bengal and Assam in the North-East and Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan in

the North-West of India, namely Pakistan zone where the Muslims are in a dominant majority be constituted into a sovereing independent state and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay.

জিন্নাহর এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন মুসলিম লিগের বঙ্গীয় প্রাদেশিক-শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসিম। যদিও তিনি শেষপর্যন্ত পাকিস্তান-গঠনের দাবি থেকে জিন্নাহ-পন্থীদের সরাতে পারেননি। ইংরেজও নীতিগতভাবে সেই দাবি মেনে নিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলার গভর্নর স্যর ফেভারিখ বারোজের সঙ্গে দেখা করে বাংলাকেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করার জোরালো দাবি পেশ কবেন। তাঁর দাবি ছিল, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভারত-ভাগ হলে, একই যুক্তিতে বাংলাকেও দ্বিখণ্ডিত করা উচিত। শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য সমর্থন করেন তৎকালীন কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য কৃপালনী। কেবল কৃপালনী একা নন, অসাম্প্রদায়িক-তথা-সমাজবাদী হিসাবে বহুল-পরিচিত জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যের সমর্থক ছিলেন। বস্তুত, শ্যামাপ্রসাদের আগেই তিনি একই যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ জানুয়ারি তিনি স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে একটি চিঠিতে লেখেন :

The British Government has to decide once for all its policy in regard to this matter. It can no longer sit on the hedge. It can not force Pakistan on India, in the form demanded by Jinnah, for that certainly will lead to civil war...Even if the Muslims as a whole support the League and Pakistan, that can only mean a division of both Punjab and Bengal—Jinnah has indignantly rejected this. What then? Compulsions of other areas to join Pakistan, that is inconceivable and impossible. Thus the crux of the Pakistan issue is this : A Pakistan consisting of only part of Punjab and part of Bengal, or no separation at all.

— Partition of Bengal — 1947, Journal of Indian History,
A K Majumdar

অর্থাৎ হিন্দু মহাসভাকে 'সাম্প্রদায়িক' হিসাবে চিহ্নিত করার আগে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের মৌলিক সাম্প্রদাফিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও ইতিহাসেব সূত্রে আমাদের মেনে নিতে হয়। বিশেষত, জিন্নাহর আগেই যখন নেহরু সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবকে খণ্ডিত করার দাবি তোলেন, এবং তার রূপায়ণে চাপ সৃষ্টি করেন, তখন স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ভাবতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রচারিত মহিমা আমাদের কাছে অনেকটাই ম্লান হয়ে আসে।

ইতিমধ্যে দেশজুড়ে জ্বলে ওঠে দাঙ্গার আগুন। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে দাঙ্গা

হয়, ১৯৪৭ সালের মার্চে উত্তর ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, দুই সম্প্রদায়ের রক্তে ভিজে যায় ভারতের মাটি। এইসব দাঙ্গার পিছনে যে ইংরেজের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল, তা এখন আর আমাদের অজানা নয়। ইংরেজ ততদিনে ক্ষমতা যে ছেড়ে দিতে হবে, তা ভালভাবেই বুঝে নিয়েছে। ফলে ক্ষমতা-হস্তান্তরের আগে একটি শেষ ষড়যন্ত্র তারা খুব সফলভাবেই রচনা করেছিল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এই পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়ণ করেছিলেন। লক্ষ করার যে, মুসলিম লিগ, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা একযোগেই ধর্মীয় জনসংখ্যার নিরিখেই বাংলাকে ভাগ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। অখণ্ড ভাষা-সংস্কৃতির সূত্রটিকে তারা আমল দেয়নি। গ্রাহ্য করেনি মানুষের নিজস্ব ভূমির ভাবাবেগও। শরৎচন্দ্র বসুর মতো কয়েকজন নেতা এ-বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলেও তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সার্বভৌম বাংলার দাবিও তুলেছিলেন কেউ। বাংলার '*সাধারণ ভাষা, সাধারণ সংস্কৃতি এবং সাধারণ ইতিহাসের*' কথা রবীন্দ্রনাথের মতো উপনিষদবাদী মনীষী মনে করিয়ে দিলেও, তাতে কর্ণপাত করেননি কেউ। শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীজিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। অন্যদিকে, মুসলমান-নেতা সুহরাওয়ার্দির সার্বভৌম বাংলা-গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, ভারত যদি শেষপর্যন্ত অবিভক্তও থাকে, তাহলেও বাংলাকে ভাগ করতে হবে (সূত্র : *মহাত্মা গান্ধী : দ্য লাস্ট ফেজ, পেয়ারেলাল। দ্বিতীয় খণ্ড*)।

এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন :

> *সার্বভৌম বাঙলার বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থিত সাম্প্রদায়িক ও হিন্দু মহাসভাপন্থী নেতারা যেমন নিজেদের তৎপরতা শুরু করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে বাঙলার মুসলীম লীগের মধ্যে চরম সাম্প্রদায়িক এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলীম লীগ নেতৃত্ব থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া অংশটিও সার্বভৌম বাঙলার বিরুদ্ধে নিজেদের তৎপরতা শুরু করে। খাজা নাজিমুদ্দীন সার্বভৌম বাঙলা রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে মুসলীম লীগের পক্ষে, শরৎ বসু প্রভৃতি কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে যৌথ আলোচনায় একদিন উপস্থিত থাকেন এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার পক্ষে তাদের মধ্যে কেউ কেউ দু-একটি বিবৃতি প্রদান করলেও তাঁরা সুহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশীমের নেতৃত্বাধীন সার্বভৌম বাঙলা রাষ্ট্রগঠনের বিরোধী ছিলেন এবং সেই বিরোধিতা করতে গিয়ে নানা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও এ-সময় সাম্প্রদায়িক বক্তব্যকেই সামনে নিয়ে এসে তাঁরা অখণ্ড বাঙলায় মুসলমানদের আধিপত্য এবং ইসলামের মূল নীতি প্রতিষ্ঠার কথাই জোরে জোরে প্রচার করতে থাকেন।*
>
> —*প্রাগুক্ত*

কংগ্রেসের অবস্থানও আলাদা-কিছু ছিল না। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস গড়ে উঠেছিল সম্পদশালী ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের প্রতিনিধিস্থানীয় দল হিসাবেই। সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থকে তারা প্রথমাবধি উপেক্ষাই করে এসেছে। কিন্তু, কার্যত, কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক দল হিসাবে নিজেদের প্রচার করত। বস্তুত, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ উপেক্ষা করার জন্যই যে তারা 'অসাম্প্রদায়িক' বলে নিজেদের পরিচিত করত, তা-ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। কংগ্রেসের তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক চারিত্র্য বিশ্লেষণ করে বদরুদ্দিন উমর তাঁর *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িকতা* গ্রন্থে লিখেছেন :

> *...বিভিন্ন ধরনের সংখ্যালঘু স্বার্থ, বিশেষত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে উপেক্ষা করাই কার্যক্ষেত্রে ছিল কংগ্রেসের সুস্পষ্ট নীতি। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির আড়ালে হিন্দু সম্পত্তিশালী এবং অগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার উপযোগী বাস্তব পরিস্থিতির কারণে কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রভাব প্রথম থেকেই ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে।...সে কারণেই বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, আচার্য কৃপালনী প্রভৃতির মতো হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী ব্যক্তিরা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।*

১৯৪৭ সালের জুন মাসে শরৎচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

> *আমার ভাবতে কষ্ট হয় যে, যে কংগ্রেস একদা এক মহান্ জাতীয় প্রতিষ্ঠান তা দ্রুত কেবলমাত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে।*
>
> —*আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, আবুল হালিম।*

আমরা দেখেছি, কংগ্রেসের শীর্ষ-নেতৃত্বে আসীন হয়ে জওহরলাল নেহরু বল্লভভাই প্যাটেলের সহযোগিতা ও সমর্থনে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ হাসিল করতে জিন্নাহর চেয়েও চরমপন্থী হয়েছিলেন। এমনকী, মাউন্টব্যাটন এবং তাঁর স্ত্রীর প্রীতিভাজন হিসেবে তিনি বাংলা ও পাঞ্জাব-ভাগের ইংরেজ-সিদ্ধান্তে সম্মত হয়েছিলেন। কেবল সম্মত হওয়াই নয়, নানা ঐতিহাসিক নথিপত্র ঘেঁটে ঐতিহাসিকরা আমাদের এ-কথাও জানিয়েছেন যে নেহরু সে-ক্ষেত্রে 'মাউন্টব্যাটেনের এক অতি প্রীতিভাজন এজেন্ট হিসেবেই কাজ করেছিলেন। (*বদরুদ্দিন উমর, বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*')।

হিন্দু ও মুসলমান দুই জনগোষ্ঠীকেই তাদের রাজনৈতিক নেতারা বুঝিয়েছিলেন, বাংলা-ভাগ হলে, ভারত-ভাগ হলে স্ব-স্ব জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সুদিন সম্ভব হবে। এ-ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের নেতারাই প্রাধান্য দিয়েছিলেন কেবলমাত্র ধর্মে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এ-ক্ষেত্রে ক্ষমতালোভী কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নিছক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছিল। মুসলমানরা যেমন বোঝেনি ধর্ম ছাড়া হিন্দুদের সঙ্গে তাদের কোনও অমিল নেই সংস্কৃতি ও জীবনচর্চায়, বোঝেনি সুদূর আরবের

আরোপিত সংস্কৃতি তার নিজস্ব কৃষ্টি নয়—এই বাংলার জল-মাটি-আলো-বাতাসেই নিহিত রয়েছে তার প্রাণ, গান, সংস্কৃতি। আরবীয় কোর্মা-কাবাব-পোলাওয়ে নয়, তার ক্ষুন্নিবৃত্তি তৃপ্ত হয় হিন্দুর মতো মাছ-ভাতেই, সত্যনারায়ণের সিন্নিতে আগ্রহী তারা হিন্দুর মতোই। কেননা, আরবে নয়, তাদের শিকড় প্রোথিত এই বাংলায়ই। অন্যদিকে, হিন্দুরাও প্রতিবেশী মুসলমানকে মানতে পারেনি অন্ধ উন্নাসিকতায়। ফলে কাঁটাতার পড়েছে সীমান্তে। গৃহহীন, ভূমিহীন মানুষ দাবার ঘুঁটির মতোই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, খেলার শেষে। ভাঙা ঘর, পরিত্যক্ত ভূমি, আর প্রতিবেশীর শবের উপর উড়েছে নিরর্থক স্বাধীনতা-ধ্বজা—অশোকচক্র আর চাঁদতারা-উজ্জ্বল ক্ষমতার প্রতীক হয়ে।

এই পরিস্থিতিতে যা অনিবার্য ছিল, হয় তা-ই। নোয়াখালির ভয়ঙ্কর দাঙ্গা, বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তির বিনিময়ে, ভারত-ভাগের বিনিময়ে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইংরেজ। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। সৃষ্টি হয় পাকিস্তানের। পাকিস্তান সূচনা থেকেই 'মুসলিম রাষ্ট্র' হিসেবে আত্ম-পরিচিত হলেও, ভারত নিজেকে তথাকথিত 'ধর্মনিবপেক্ষ' রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে, ক্ষমতা পাওয়ার লোভে, নেহরুর অসাম্প্রদায়িক মুখোশ যেমন খসে পড়েছিল, তেমনই স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কুরশিতে বসে তিনি খুলে ফেলেন সমাজতান্ত্রিকতার মুখোশটিও। পাঞ্জাব ও বাংলার লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ মানুষের জীবনে নেমে আসে দেশভাগের করাল ছায়া। কংগ্রেস ক্রমশ বানিয়া-শ্রেণির প্রতিনিধিত্বে আত্মনিয়োগ করে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী নাথুরাম গডসের আক্রোশে মহাত্মা গান্ধী গুলিবিদ্ধ হন। তথাকথিত স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার যে-বীজ বপন করে দিয়েছিল সুচতুর ইংরেজ, মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভা, নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সেই বীজে জলসিঞ্চন করে। সেই বীজ থেকে উপ্ত হয় গাছ, গাছ বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ মহীরূহ হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে দেয় দেশের নানা প্রান্তে। শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়ে বাবরি মসজিদ, গুজরাতে রচিত হয় মৃত্যু-উপত্যকা।

মধ্যযুগের সাহিত্যে ভেদ-অভেদ

আমরা জানি, দশম শতাব্দীতে, পাল-বংশীয় শাসনকাল থেকেই বাংলাভাষার উদ্ভব। এ-সময়ই পূর্বী মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। আর বাংলাভাষায় প্রথম যে-সাহিত্য-প্রয়াসের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচনায় সমৃদ্ধ দোঁহা *চর্যাচর্যবিনিশ্চিয়*। ১৯১৬ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপালের রাজ-গ্রন্থাগার থেকে পুথিটি আবিষ্কার করে প্রকাশ করেন। সাধারণভাবে ওই সঙ্কলনগ্রন্থটিই প্রথম বাংলাসাহিত্য-প্রয়াস হিসাবে গৃহীত।

ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন-রাজাবা বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করলেও, তাঁরা বাংলাভাষার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁরা উচ্চকোটির সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তথাকথিত শূদ্রশ্রেণিকে শাস্ত্রপাঠ বা শ্রবণের অধিকার দেননি তাঁরা। সেন-আমলে স্বভাবতই বাংলায় কোনও সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন-রাজারা ঘৃণার চোখে দেখতেন। বাংলায় পুরাণ বা শাস্ত্রগ্রন্থ অনূদিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে বলে মনে করতেন তাঁরা।

সেন-রাজাদের পরবর্তী সময়ে, মধ্যযুগে, যে-সব তুর্কি, আরবি, ইরানি, আফগানি, হাবশি বা উত্তর ভারতের সুলতান, সুবেদার, নবাবরা বাংলায় এসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু বাংলাভাষার প্রতি সে-রকম বিদ্বেষ বা নিস্পৃহতা দেখাননি। কেননা, তাঁরা বুঝেছিলেন, সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেই তাঁদের এ-দেশে শাসনকার্য চালাতে হবে। সে-ক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে তাঁরা নিজেদের স্বার্থেই গুরুত্ব দিলেও, তাতে আখেরে লাভ হয়েছে বাংলা সাহিত্যেরই। রমেশচন্দ্র মজুমদার সে-সময়ের বিবরণ লিখেছেন :

> *মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন, হিন্দুরাজন্য তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সম্রাটগণের দৃষ্টান্ত পল্লীর জমিদারগণ পর্যন্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বাঙালাভাষা এইভাবে হিন্দুরাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অনন্যগতি হইয়া ইহার পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন।*
>
> —*বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)*

প্রকৃতপক্ষে, মধ্যযুগের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সে-সময় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদচর্চা যে-ভাবে শুরু হয়েছিল এবং বিস্তারলাভ করেছিল, তাতে তাঁদের মানসিক প্রসারতা বেশ বোঝা যায়। সুলতান রুকনুদ্দিন বরকা শাহ ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্দের বঙ্গানুবাদ *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*-এর জন্য মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দেন। চট্টগ্রামের লস্কর পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারতের অংশবিশেষ (আদি পর্ব থেকে স্ত্রী-পর্ব) অনুবাদ করিয়েছিলেন। পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করান। রামায়ণের সার্থকতম অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা গৌড়েশ্বর হোসেন শাহর সমাদর পেয়েছিলেন। যশোরাজ খাঁ, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিল্লাই প্রমুখ কবিরা হোসেন শাহর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন নিজেদের কাব্যে।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য মুসলমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও আমরা লক্ষ করি, বাঙালি জনসংখ্যার অর্ধেক মুসলমান-ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ বাঙালি-হিন্দুর রচনা পাঠ বা শ্রবণে আগ্রহী হলেও, প্রাথমিক অবস্থায় কোনও মুসলমান-কবি বাংলায় কাব্য-রচনায় আকৃষ্ট হননি। তাঁরা বাংলাকে 'হিন্দুর ভাষা' ভেবে, সেই ভাষা থেকে দূরে থাকারই চেষ্টা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট দ্বিধা ছিল।

যেমন, শাহ মুহম্মদ সগীব (১৩৮৯-১৪১০) লেখেন :

নানা কাব্য-কথা-রসে মজে নরগণ
যাব সেই শ্রদ্ধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দূষিত সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
গুনিয়া দেখিলুঁ আম্মি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাবায় কিছু হএ কথা সাচা।

হাজি মহম্মদ (ষোড়শ শতক) লেখেন :

যে-কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে
ফবমান না মানিলে আজাব আখেবে।
হিন্দুযানী লেখা তাবে না পারি লিখিতে
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে।

আবদুল নবি (১৬৮৪) লেখেন :

মুসলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই।
বচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিল হৃদয়।

রাজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিম (সতেরো শতক) লেখেন :

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নবগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদ যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেবগণ।
যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাবা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়

নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায়।
মাতা-পিতামহক্রমে বঙ্গেতে বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

—মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, আহমদ শরীফ

আমরা লক্ষ করেছি, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাঙালি-মুসলমান-কবিরা যে-ভাবে বাংলাভাষায় সাহিত্য-রচনার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন, সপ্তদশ শতকে পৌঁছে সেই দ্বন্দ্ব অনেকটাই অবসিত হল। বাংলাভাষা যদিও তখনও তাঁদের কাছে 'হিন্দুর অক্ষর', তবু তাঁরা 'বঙ্গবাণী' অবলম্বন করতে সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন। ভাষা ও ধর্মের এই দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও মধ্যযুগে সগির, মোজাম্মিল, সা বিরিদ খাঁ, দৌলত উজির, সৈয়দ সুলতান, হাজি মহম্মদ, মুতালিব, আবদুল হাকিম, মহম্মদ খাঁ, সৈয়দ মর্তুজা প্রমুখ কবিদের উল্লেখ সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বহু মুসলমান-কবি বৈষ্ণব-পদও লিখেছিলেন।

তবে বিশেষভাবে যে-দুজন মুসলমান-কবির কথা সাহিত্যের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাঁরা হলেন দৌলত কাজি এবং সৈয়দ আলাওল। মধ্যযুগের মুসলমান-কবিদের কাব্যগুলি সাধারণভাবে স্বীয় সমাজেই প্রচলিত ছিল। কেননা, তাঁদের রচিত কাব্যগুলির অধিকাংশই ইসলামের মাহাত্ম্য-বিষয়ক। অবশ্য, মহম্মদ খান নামে এক কবি *সত্যকলিবিবাদসংবাদ* নামে একটি 'রূপকধর্মী হিন্দুধরনের' কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু দৌলত কাজি এবং সৈয়দ আলাওল যে-দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন, সেগুলি হয়ে উঠেছিল যুগপৎ মানবিক ও সর্বজনীন। মুসলমান-পাঠক-সমাজের সীমায়িত গণ্ডি পেরিয়ে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত বাঙালি-কবি।

দৌলত কাজির *লোরচন্দ্রাণী* বা *সতীময়না* রোমান্টিক আখ্যানকাব্য হিসাবে সাধারণ পাঠক-সমাজের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ কবেছিল। দৌলত কাজি আরাকানের রাজা থিরি-থু-ধম্মার (শ্রীসুধর্মা) পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। আরাকানের সমর-সচিব আশরফ খানের প্রেরণায় তিনি ১৬২১ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রচলিত হিন্দি কাব্য অবলম্বনে *লোরচন্দ্রানী* বা *সতীময়না* রচনা করেন। তাঁর কাব্যেই এই তথ্য রয়েছে। কিন্তু, কাব্যটি তিনি শেষ করতে পারেননি। তার আগেই তিনি মারা যান। পরে সৈয়দ আলাওল ওই কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

মুসলমান হয়েও দৌলত কাজি যে একটি হিন্দু আখ্যান-অবলম্বনে কাব্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তার প্রেক্ষিতে শাসকশ্রেণির বাহ্যিক প্রভাব থাকলেও, কবি নিজেও যে বিষয়টির মাহাত্ম্যে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা তাঁর রচনার গভীরতায়ই প্রমাণিত। আসলে, কাব্য-কবিতা সমস্ত সঙ্কীর্ণ ধর্ম-ভেদের পাশে এক বৃহত্তর ও গভীরতর মানবধর্মের কথা বলে। কবি সততই নিজের যাবতীয় ঐহিক সীমাকে অতিক্রম করে যেতে চান। এই কবিরাও তার ব্যতিক্রম নন।

সতী ময়নার কাহিনি সে-সময় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে খুবই জনপ্রিয় ছিল। মিয়াসাধন নামে এক হিন্দিভাষী কবি গ্রাম্য হিন্দিতে সতী ময়নার কাহিনি লিখেছিলেন। সেই কাব্যের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করতে চেয়েছিলেন আশরফ খান ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা। তাঁদের অনুরোধে দৌলত কাজি পয়ার-ত্রিপদীতে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। লোর-ময়না-চন্দ্রাণীর প্রেম-উপাখ্যান রচনায় দৌলত কাজি ও সৈয়দ আলাওল মানবিক রসের সন্ধান দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য যেখানে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনায়ই সীমায়িত ছিল, সেখানে এই কাব্যই প্রথম বাস্তব পৃথিবীর মানব-মানবীর প্রেম-বিরহকে অবলম্বন করে। সবচেয়ে বড় কথা, এই কাব্যেই প্রথম হিন্দু-মুসলমানের তথাকথিত বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হয়। সাধারণ মানুষের প্রেম-প্রীতি-বিরহ যে সম্প্রদায়-বিশেষে আলাদা নয়, তা মধ্যযুগীয় এক অল্পশিক্ষিত কবি আমাদের প্রথম বুঝিয়েছিলেন। যদিও, গড্ডালিকাপ্রবাহে-ভাসমান হিন্দু-কবিরা এই কাব্যটির দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়েছিলেন, এমন নয়। কেননা, তাঁরা তখনও দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনেই স্ফূর্ত ছিলেন।

সৈয়দ আলাউলের চেয়েও সপ্তদশ শতাব্দীতে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন দৌলত কাজি। তিনি নানা ইসলামি কাহিনি ও ধর্মতত্ত্ব বাংলায় অনুবাদ করে মুসলমান-সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। যদিও, মৌলিক কাব্য না-হলেও *পদ্মাবতী* কাব্যটির জন্যই তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে সবিশেষ-স্মরণীয়। প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি মুহম্মদ জায়সি-র *পদুমাবৎ* অবলম্বনে রচিত *পদ্মাবতী* হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পাঠকের কাছেই গৃহীত হয়েছিল। চিতোর-রাজ রত্নসেন, পদ্মাবতী ও দিল্লির পাঠান-সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির কাহিনি এই কাব্যের উপজীব্য। রত্নসেনের রানি পদ্মাবতীর রূপের খ্যাতি শুনে সুলতান চিতোর আক্রমণ করলে রত্নসেন যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে রানি প্রাণবিসর্জনই শ্রেয় মনে করেন। এই কাহিনিতে ইতিহাসের চেয়ে রোমান্সই বেশি। ফলে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে এই কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মুসলমান-কবি আলাওল মুসলমান সুলতানের রূপোল্লাস এবং হিংস্রতা-বর্ণনায় একটুও কুণ্ঠিত হননি। মধ্যযুগের ধর্মশাসিত সমাজ ও সাহিত্যে এই ঘটনা যথেষ্ট বিস্ময়াবহ। সে-যুগে কোনও হিন্দু-কবি এ-রকম কবিকৃতি স্থাপন করতে পারেননি। আলাওলই এ-ক্ষেত্রে অসম্প্রদায়িক সাহিত্যের পুরোধা পুরুষ, এ-কথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়।

আলাওলের প্রদর্শিত এই পথে পরবর্তিকালে অনেক মুসলমান-কবিই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মধ্যযুগের বহু মুসলমান-কবি বৈষ্ণব ও সুফি ভাবধারায় প্রাণিত হয়ে অসংখ্য পদ রচনা করেছিলেন। আকবর, লাল মামুদ, সৈয়দ মুর্তজা, নসির মামুদ, আলিরাজা, চম্পাগাজি, মুহম্মদ কাসিম, কমর আলি, ওয়াহব এবং সর্বোপরি, লালন শাহ ফকিরের নাম এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একেশ্বরবাদী মুসলমান যেখানে অন্য ধর্মের সত্যাসত্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ও বিশ্বাসী

নয়, সেখানে হিন্দুধর্মের একটি শাখামত ও ভাবধারায় এইসব কবিরা কীভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা ভাবলে অবাক লাগে। কিন্তু, ঘটনা এই যে, মধ্যযুগে এমন-কয়েকজন কবির কথা ইতিহাস আমাদের জানায়, যাঁরা স্বীয় ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে ভাবনাচিন্তায় অনেক দূর এগিয়ে ছিলেন। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় তাঁরা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে মিশেছিল সুফি ও বাউল-ভাবের গভীরতা। মুসলমান-কবিরা যে-ভাবে লায়লা-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা, শিরি-ফারহাদ ইত্যাদি মর্ত-প্রেমিক-প্রেমিকার আখ্যানে সুফি-সাধনার জীবাত্মা-পরমাত্মার তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন; তেমনই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আধারেও পেয়েছিলেন অনুরূপ তত্ত্বটি। ফলে, বাহ্যিক ধর্মে ওইসব কবিরা মুসলমান হয়েও, রাধাকৃষ্ণের আখ্যানকে গ্রহণ করেছিলেন গভীর প্রেমধর্ম-অনুপ্রেরণায়। তাছাড়া, সাধারণভাবে, কবিরা কবিধর্ম-তথা-মানবধর্মের দ্বারাই প্রণোদিত হন, বাহ্যিক ধর্ম তাঁদের একটা থাকে বটে, কিন্তু তা তাঁদের অন্তর-ধর্মকে সঙ্কুচিত করতে পারে না—এই সত্যও পুনঃপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন তাঁরা।

অবশ্য, মধ্যযুগের মুসলমান-কবিদের এই অন্যধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টির একটি ভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাহিত্য-ঐতিহাসিক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন :

> *বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ থেকেই প্রায় অধিকাংশ মুসলমান উদ্ভূত হয়েছিলেন—ধর্মান্তরীকরণের প্রভাবে বা চাপে বা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য ধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁদের মজ্জাগত হিন্দুসংস্কার সহজে দূর হয়নি। সুতরাং রাধা-কৃষ্ণঘটিত ব্যাপারের প্রতি তাঁদের প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। বিশেষত ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যপ্রভাবিত রাগানুগা বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্লাবনে 'নদে শান্তিপুর' তো ভেসে গিয়েইছিল, এমন কি বাংলার চতুঃসীমা ও প্রান্তীয় অঞ্চলেও এই সর্বগ্রাসী আবেগধর্মের প্রবল স্রোতোধারা প্রবেশ করেছিল। কোন কোন মুসলমান কবি, যাঁদের মন পূর্ব থেকে ভক্তিরাগে (সুফীমতের প্রভাবে) আর্দ্র হয়েছিল, এবং যাঁদের মনের অন্তরালে তাঁদের অজ্ঞাতসারেই হিন্দুর ধর্মসংস্কারের ছিটেফোঁটা লুকিয়ে ছিল, তাঁরাও সেই প্লাবনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ সূফীধর্মের প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণ ব্যাপারকে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক বলে পদ লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের অনেক পদে চৈতন্যদেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।*
>
> *—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*

আমরা তৎকালীন কয়েকজন মুসলমান-পদকর্তার কয়েকটি পদ প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করে বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি।

আকবর লিখেছেন :

জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচে আপন রসে ভোরা ॥

লালন ফকির লিখেছেন :

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা ॥

লাল মাহমুদ লিখেছেন :

সোনার মানুষ পদে এল রে।
ভক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে ॥

সৈয়দ মর্তুজা লিখেছেন :

সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে।
জীবন মরণ ভরি ॥

বাসন উদাস লিখেছেন :

হিন্দুরা বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা।
রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লামুন্সিতে দেয় বাধা।

মুসলমান-পদকর্তাদের এহেন সমর্পণাত্মক পদগুলি বৈষ্ণব পদকর্তাদের থেকে কোনও অংশেই আলাদা নয়। এঁরা রাধা-কৃষ্ণের রূপকে সুফি-মতের আরাধনা করেছেন এইসব পদে। একটি বিষয় এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এইসব কবিদের কেউই কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান-ধর্ম ছেড়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেননি। বস্তুত, এইসব উদারমনা কবির দল তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক ধর্মমত নিয়ে একেবারেই ভাবিত ছিলেন না। সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনার চেয়ে এইসব কবিরা ছিলেন অনেক এগিয়ে। ফলে, তাঁরা সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে নিজেদের এক উন্নততর দর্শনের অনুগামী করতে পেরেছিলেন। সুফি-ধর্মমতে ভক্ত নিজেকে প্রেমিক এবং ভগবানকে প্রেমিকা বলে ভাবেন। প্রেমিক যেমন তার প্রেমিকাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়, তার বিরহে ভোগে—তেমনই সুফি-সাধকরা ভগবানকে পাওয়ার জন্য কাতর হয়ে আরাধনা করেন। সুফি-মতবাদী কবিরা সঙ্গত কারণেই রাধাকে প্রণয়িনী বলে গ্রহণ করেছেন—এই প্রণয় ঐশ্বরিক প্রণয়—ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রণয়।

সপ্তদশ শতকে এই ধারার কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ মর্তুজা, নাসির মামুদ ও আলি রাজা। দৌলত কাজি এবং সৈয়দ আলাওল হিন্দু-আখ্যান লিখেছিলেন, সেই দুটি আখ্যানে বিচ্ছিন্নভাবে রাধাকৃষ্ণের অনুষঙ্গ থাকলেও, সেগুলিকে পরিপূর্ণ বৈষ্ণবকাব্য বলা

যায় না। কিন্তু আলোচ্য তিন কবিকে বৈষ্ণবকবি বলেই চিহ্নিত করেছেন সাহিত্য-বিশেষজ্ঞরা। বিচ্ছিন্নভাবে যে-একশোজন মুসলমান-বৈষ্ণব-পদকর্তার পদ পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে এই তিনজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মর্তুজার ভণিতায আঠাশটি পদ পাওয়া গিয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে মর্তুজার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পডেছিল মুর্শিদাবাদের হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের মধ্যে। ধর্মমতে তিনি সম্ভবত বাউল-ফকির ছিলেন। মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দুতন্ত্র ও বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলেও আবেকজন মুর্তজার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য অনেকে মনে করেন, মুর্তজার জনপ্রিয়তার জন্যই বিভিন্ন অঞ্চলে মতুর্জার ভণিতায় অন্য কবিরাও পদ লিখেছিলেন। অবশ্য, এ-ব্যাপারে সুনিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

মতুর্জার পদে আমরা যেন চণ্ডীদাসেরই প্রতিধ্বনি শুনি :

শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি।
যখন দেখিয়ে এ চাঁদ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি॥

রাধার এ-বকম ব্যাকুল আত্মকথন-বর্ণনায় কবির শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কয়েকটি বৈষ্ণব-পদসঙ্কলনে নসির মামুদের কিছু পদ সঙ্কলিত হয়েছে। এই কবি সম্পর্কে অবশ্য খুব-বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বী এক কবি যে-ভাবে কৃষ্ণেব গোষ্ঠলীলার ছবি এঁকেছেন, তাতে তাঁকে বলরাম দাসের দোসর বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। একটি পদে কবি লিখেছেন :

আগম-নিগম বেদ সার,
লীলায় করত গোঠ বিহার,
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানবি॥

আলিরাজা চট্টগ্রামের কবি। তিনি আঠারো শতকে বর্তমান ছিলেন। তিনি মূলত দরবেশ-পন্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি হিন্দুধর্মের অন্তর্গত তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই আলিরাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি *জ্ঞানসাগর*, *সিরাজকুলুপ*, *ধ্যানমালা*, *যোগকালান্দর*, *ষটচক্রভেদ* নামে পাঁচটি গ্রন্থের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান-ধর্মের একটি দার্শনিক যুগলবন্দি-বচনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ইসলামি সুফি-সাধনা এবং হিন্দুধর্মের যোগতন্ত্রের একধরনের সম্মিলন ঘটাবার প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে সাহিত্য-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

কিন্তু আলিরাজার জনপ্রিয়তা এইসব তত্ত্বমূলক গ্রন্থের জন্য নয়। তিনি বৈষ্ণব-পদ লিখেই সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে আলি রাজার মতো একজন অসাম্প্রদায়িক, উদারমনস্ক অধ্যাত্ম কবির গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা বলার অপেক্ষা থাকে না। হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই আলি রাজার মতো অধ্যাত্মবাদী কবি খুবই বিরল। আলি রাজা একটি পদে লেখেন :

এক কায়া এক ছায়া নাহিক দোসর।
এক তন এক মন আছে একেশ্বর ॥
ত্রিজগৎ এক কায়া এক করতার।
এক প্রভু সেবে জপে সব জীবধর ॥

আলি রাজা হিন্দুধর্মের যোগদর্শন এবং মুসলমান-ধর্মের সুফি-দর্শনের মিশ্রণে এমন-সব পদ লিখেছিলেন, যার সামাজিক মূল্য ও কাব্যমূল্য অপরিসীম।

অন্যদিকে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, মানাভিমান, স্বকীয়া-পবকীয়া ইত্যাদি বৈষ্ণব পদাবলির কেন্দ্রীয় ভাবনায় আশ্রিত আলি রাজাব বিভিন্ন পদে যে-স্বকীয়তা প্রকাশ পেযেছে, তা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল হয়ে রযেছে। যেমন ·

প্রেমানন্দ সিংহাসন প্রেমরস বৃন্দাবন
প্রেমানন্দ অমৃতলহর।
প্রেমানন্দ তরুমূল প্রেমানন্দ ফলমূল
প্রেমানন্দ রস মধুকর ॥

পরকীয়া ভাবনার প্রকাশ :

স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস।
পবকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস ॥

প্রেমানুবাগের বর্ণনায় :

বনমালী, কি হেতু বাধারে ভাব ভিন,
তোমার প্রেমের ঘায় দগধে জীবন যায়
নিত্য রাধা মদন অধীন ॥

রাধার আক্ষেপোক্তি :

কি খেনে আসিলাম ঘাটে।
নন্দের নন্দন ভুবন মোহন
দেখিয়া মবম ফাটে ॥

এই তিনজন মুসলমান-পদকার ছাড়া চম্পাগাজি, মুহম্মদ কাসিম, কমর আলি, ওয়াহব, আলি মিঞা প্রমুখ কবিরাও রাধাকৃষ্ণলীলার অসংখ্য উৎকৃষ্ট পদ বচনা করেছিলেন।

আলি মিঞা লিখেছেন :

গাছের উপরে লতার বসতি
লতার উপরে ফুল।
ফুলের উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
কানু-এ মজাই জাতিকুল ॥

ওয়াহব লিখেছেন :

রাত্রি পোহাইয়া যায় কোকিল পঞ্চমে গায়
নিদ্রাতে পাইয়াছ বড় সুখ
অভাগিনী বলিয়া রে নিশি গোঞাইলুম
উঠে তবে দেখি চান্দমুখ ॥
আমার মাথাটি খাও উঠ এবে ঘরে যাও
কাকুতি করিয়া বোলি তোরে।
রাত্রি প্রত্যুষ হৈলে লোকে দেখিবে তোরে
কলঙ্কিনী করিবে আমারে ॥

এইসব পদ বৈষ্ণব পদাবলির সামগ্রিকতার সঙ্গে গভীরভাবে বিজড়িত। আলাদাভাবে এগুলি উদ্ধৃত না-হলে এইসব পদ যে পদাবলির কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিন্দুমাত্র আলাদা, তা বোঝাব কোনও উপায় নেই। ভণিতা ছাড়া এগুলিকে মুসলমান-কবিদের পদ হিসাবে শনাক্ত কবাও বেশ দুরূহ। কেননা, তাঁবা বৈষ্ণব-পদকর্তাদের মূল স্রোতের সঙ্গেই মিশে গিয়েছিলেন।

মুসলমান-পদকর্তাদেব এই অবদানকে হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু, তাতেও তাঁদের মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। বস্তুত, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এইসব কবিরা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থেকে গিয়েছেন।

অবশ্য, এ-ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে যে, মুসলমান-কবিরা হিন্দু-ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যে-ভাবে পদ-রচনা করেছিলেন, হিন্দু-কবিদের মধ্যে কেউ তেমন করেছিলেন কি না। এখানে এ-কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, হিন্দু-সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈভবে মুসলমান-লেখকরা যে-ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, হিন্দু-কবিদের তেমন হওয়াব কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু, এ-ক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব লালন ফকির ছিলেন হিন্দুর সন্তান। ঘটনাচক্রে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন।

বাউল-ফকিরের মিলনগান

বাংলা সাহিত্যে লালন ফকির একটি অবিসম্বাদিত চরিত্র। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তাঁর রচনাকে স্থাপন করেছিলেন তিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। মূলত তাঁর জন্যই লালনের গান বাংলার লোকায়ত প্রেক্ষিতের সীমা ছেড়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৬ সালের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণে লালনের কথা উল্লেখ করেন :

আমি এইরূপ একজন ধর্মপ্রচারকের বিষয় কিছু জানি—তাঁহার নাম লালন শাহ ফকির। লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—এরূপ শোনা যায় যে তাহার বাপ-মা তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে তাহার বসন্ত রোগ হওয়াতে তাহাকে রাস্তায় ফেলিযা চলিয়া যান। সেই সময় একজন মুসলমান ফকির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত হন। এই লালন ফকিরেব মতে মুসলমান হিন্দু জৈন মতসকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিস তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে।

লালন নিজেও তাঁর গানে বলেছেন :

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে।

অনুমান করা হয়, ১৭৭৪ সালে বাংলাদেশে লালনের জন্ম এক হিন্দু-কায়স্থ-পরিবারে। কথিত আছে, বিবাহের পব তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে হঠাৎই পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গীবা তাঁকে পথেই ফেলে রেখে উধাও হয়। সে-সময এক মুসলমান-দম্পতি তাঁকে আশ্রয় দেন, বাঁচিয়ে তোলেন। পবে সুস্থ হয়ে দেশে ফিবলে, মুসলমান-সংস্পর্শের দায়ে তাঁকে হিন্দু-সমাজে পতিত হতে হয়। নিজ-সমাজেব দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি ফকিরি ধর্ম গ্রহণ করে কুষ্টিয়া জেলার সেঁউড়িয়া গ্রামে আখড়া বানিয়ে বাউল ও ফকিরি সাধনভজনে নিয়োজিত হন। তিনি মুসলমান মোমিন-সম্প্রদায়ের এক কন্যাকে বিয়ে করেন। বহু মোমিন-সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করলেও লালন মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কেননা, কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা না-থাকাই স্বাভাবিক। বাউল-সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ শক্তিনাথ ঝা লিখেছেন :

লালনের প্রায় দশহাজার শিষ্য ছিল। শাস্ত্রবিরোধী অসাম্প্রদায়িক এত বড় সংগঠন তখন বঙ্গে ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজ বা জাতীয় কংগ্রেসেরও সংগঠন এত বড ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশনেরও নয়। সুতরাং নানা কারণে এবং নিজের উজ্জ্বল ভূমিকা

ও প্রতিভা দ্বারাই লালন সমকালে গুরুত্ব পেয়েছিলেন। কেবলমাত্র মহাকবির স্বীকৃতিতেই নয় তাঁর প্রতিষ্ঠা।

—ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প।

লালন ফকিরের দুশো বছর আগে চৈতন্যদেব যে-প্রেমধর্মের কথা প্রচার করেছিলেন, দুশো বছর পর লালনও সেই জাতপাতহীন প্রেমধর্মের কথাই প্রচার করেছেন তাঁর গানে। বাংলার লোকায়ত ধর্ম-সম্প্রদায় বাউল ও ফকিররা নানা দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটিয়েও আজীবন এই মানবধর্মেরই জয়গান করেছেন—লালন শাহ্ ফকির যার পুরোধা। আসলে, লালন এমন-এক ধর্ম-নিরপেক্ষ লোকায়ত ধর্মের সন্ধান দিয়েছিলেন, যাতে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদাযের সাধাবণ মানুষই আগ্রহ বোধ করেছিল। তাছাড়া, লালনের সরল জীবন, মুসলিম-কন্যাকে বিবাহ, তাঁর প্রতি গোঁড়া হিন্দুদের নিগ্রহী আচরণ, সর্বোপরি তাঁর অনির্বচনীয মানবপ্রেমের গানে আকৃষ্ট হয়েছিল দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ। লালন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষকে চারদিক দিয়ে অন্ধত্বেব বন্ধনে বেঁধে ফেলে। মানুষের মুক্ত আত্মা তাতে স্ফূর্তি হাবিয়ে ফেলে। ফলে লালন নির্ভর করেছিলেন জাতপাতহীন বাউল ও ফকিরি ধর্মে। সে-জন্যই তাঁব গানে যেমন হিন্দু-ঘেঁষা অনুষঙ্গ, শব্দ ও ভাব রয়েছে, তেমনই রয়েছে প্রচুর সুফি শব্দ ও ভাবনার নিদর্শন। তিনি যেমন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ভাবরসে-সিক্ত বাধাকৃষ্ণলীলার কথা লিখেছেন, তেমনই সুফি-ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর গানে। বৈষ্ণব-ভাবে তিনি যেমন লিখেছেন :

ও গৌরেব প্রেম রাখিতে সামান্য কি পারবি তোরা।
কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হতে হবে জ্যান্ত মরা।

তেমনই সুফি সাধনার কথা বলেছেন একই আবেগে :

নবীর সঙ্গে জগৎ পয়দা হয়।
সেই যে আবার কি হল তার কে করে নির্ণয়।

আবার বাউল-সাধনার আভাসও রয়েছে তাঁর গানে :

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
(ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে ॥
কত ধনীর ভরা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড় তুফানে।
ভবে রসিক যারা পার হয় তারাই নদীর ধরা চিনে ॥

বস্তুত, বাংলার সমাজ ও শিল্প-সাহিত্যে বাউল-সম্প্রদাযের একটি বিশেষ অবদান রয়েছে। সমাজে এরা প্রান্তিক অধিবাসী হলেও, মূলস্রোত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হলেও, বিভিন্ন সময় হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মৌলবাদী শক্তি বাউল-সম্প্রদায়কে (বা ফকিরদেরও) তাদের তথাকথিত অনাচারী ব্যভিচারী মত ও আচরণের জন্য, নানাভাবে নিগ্রহ করলেও, এই বাউলরা বাংলার সনাতনী সম্প্রীতির সঙ্গে খুবই ওতপ্রোত, সাযুজ্যপূর্ণভাবে জড়িত। বাউল-গান বিষয়ে সাধারণ মানুষের আবেগ-মিশ্রিত আকর্ষণ,

আর গবেষকদের বাউল-সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে সবিশেষ আগ্রহের বিস্তৃতি বাউল-সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রেক্ষিতটিকে অনেক ক্ষেত্রেই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন করে রাখে।

বিশিষ্ট গবেষক মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন :

> *বাঙ্গালাদেশে বাউল-মত প্রকাশ পাইবার প্রাচীনতম কাল কিছুতেই খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। কেননা মাধবেন্দ্র পুরীর কথা ছাড়িয়া দিয়া, ঈশ্বরপুরী (১৫০১ খ্রীঃ জীবিত) চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৫৩ খ্রীঃ), অদ্বৈতচার্য্য (১৪৩৪-১৫৫০ খ্রীঃ) প্রভৃতি প্রাচীনতম বাউল বা বাউল গুরু বলিয়া যাঁহারই নাম করা হউক না কেন, তাঁহারই জীবনকাল ষোড়শ শতাব্দীকে ডিঙ্গাইয়া যায় না। সুতরাং আমরা এরূপ নিশ্চিতভাবেই স্থির করিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই বাঙ্গালাদেশে বাউল-মত উদ্ভূত হয়। এই মতের পক্ষে আর একটি বড় প্রমাণ এই, বাঙ্গালাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ উদ্ভবের পূর্বে, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সাঁই, ন্যাড়া, ফকীর ও জিকির প্রভৃতি কোন মতবাদই দেখা দেয় নাই। বঙ্গে ইসলাম প্রবেশের পর এবং এদেশের প্রতি কেন্দ্রস্থলে সূফীদের আস্তানা স্থাপিত হইবার পর, বাঙ্গালাদেশে সাধারণভাবে সূফীদের মধ্যসূত্রতায় প্রাপ্ত যে ঐস্লামিক পারিপার্শ্বিকতার (Atmosphere) সৃষ্টি হইল, তাহারই প্রভাবে এদেশে ভাব-জাগরণ দেখা দিল ;—ইহার প্রথম ফল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতবাদ। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঐস্লামিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকিয়া বৈষ্ণব ও সূফী-প্রভাবে নিরক্ষর শ্রেণীর ভিতর যে মর্ম্মমুখী চিন্তা বিকশিত হইয়া উঠে, তাহাই হইল—"বাউল মত"।*

এই মত তৈরি হয়েছে সুফি, বৌদ্ধ-সহজিয়া আর বৈষ্ণবীয় ধর্মভাবনার সংমিশ্রণে। এই তিনটি মতই সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মধারার শাখা হয়েও, মূলধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুসলিম, বৌদ্ধ বা হিন্দু-মতের গোঁড়ামি এই তিন মতের কোথাও নেই। স্বভাবতই তিন-ধর্মমতের-সংমিশ্রণে-সৃষ্ট বাউল-ভাবধারার মধ্যেও রয়েছে অনাবিল মুক্তমনের প্রকাশ —কোনও ধর্মীয় অনুশাসনের বন্ধন নেই এখানে। বাউল এক মুক্ত আকাশের, অসীম প্রান্তরের দ্যোতক। আর বাউলের গানে ছড়িয়ে আছে বাউল-সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব, প্রেম-মিলনের অনির্বচনীয় সুধা।

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সংস্কৃত 'ব্যাকুল' বা 'বাতুল' শব্দটিই 'বাউল' শব্দের উৎস। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে 'ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা ও বাহ্যিক ব্যাপারে উদাসীন' মানুষকেই 'বাউল' বলা হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে সেই অর্থেই 'বাউল' বলেছেন। অন্যদিকে আরবি 'আউল' বা হিন্দি 'বাউর' শব্দটি 'বাউল' শব্দটির উৎস হতে পারে—সে-ক্ষেত্রেও উৎস-শব্দটির অর্থ 'বায়ুরোগগ্রস্ত'। পরবর্তিকালে 'বাউল' সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্যে শব্দটি এক বিশেষ শাখা-ধর্ম-সম্প্রদায়ের দ্যোতক হিসাবেই চিহ্নিত হয়।

'বাউল' সম্প্রদায়ের উদ্ভব, আমরা আগেই বলেছি, অন্তত ষোড়শ শতকে। যে-কোনও শব্দগত উৎস থেকেই শব্দটির উৎপত্তি হোক, আজ থেকে চারশো বছরেরও আগে একদল ঈশ্বরপ্রেমিক, জীবনপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা. জাতপাত-চিহ্নহীন প্রান্তিক মানুষ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নিজেদের 'বাউল' নামে পরিচিতি দিয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে 'বাউল' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যে :

মুকুল (তো) মাথার চুল　　　নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।

আবার *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে লেখা হয়েছে :

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল,
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল,
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

অন্যদিকে, ড. এস এম লুৎফর রহমান 'বাউল' শব্দের উৎস সন্ধানে আরও পিছিয়ে গিয়েছেন। প্রাচীন অবহট্ট রচনায় ও চর্যাপদে ব্যবহৃত 'বাজিল', 'বাজুল', 'বাজির', 'বাজ্জিল' ইত্যাদি শব্দগুলিকে 'বাউল' শব্দের পূর্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অবহট্ট বা প্রাচীন বাংলায় শব্দটির যে-অর্থই থাক, মধ্যযুগে 'বাউল' শব্দটি 'উন্মাদ' বা 'দিব্যোন্মাদ' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। পরে তা একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদাযেরই দ্যোতক হয়ে ওঠে।

বস্তুত, 'বাউল' শব্দটি বাউল-সম্প্রদায়েব বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কেননা, এঁদের আচার-আচরণ, জীবনযাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা। বাস্তব পৃথিবীর তুলনায় ভাবের জগতেই এঁদের সমধিক স্ফূর্তি। প্রচলিত ধর্মাচরণে এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণই অনাগ্রহী। কোনওরকম পৌত্তলিকতা, পূজা-পার্বণ, রোজা-নামাজ বা মন্দির-মসজিদে এঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এঁদের কামনা-বাসনা, ভোগ-তৃপ্তির প্রকৃতিও যেন সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা। বাউল-সম্প্রদায় দেহের আধারেই ঈশ্বরকে খোঁজে। কিন্তু প্রচলিত বিবাহ বা সন্তানলাভে তাদের কোনও অভিলাষ নেই। বাউলের নিজস্ব নারী থাকে বটে, কিন্তু সঙ্গিনী-পরিবর্তনেও তাদের বিন্দুমাত্র বাধা নেই। বাউলের সাধনার আধার নারী। 'কামহীন প্রেমে' বাউল তার সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। বস্তুত, বাউল তার সঙ্গিনীকে রাধারানি মনে করে। বিজাতীয় যৌনক্রিয়াব মাধ্যমে বাউল পৌঁছতে চায় তার আরাধ্য 'মনের মানুষ'-এর কাছে।

বাউলরা চৈতন্যদেবকে তাঁদের আদি গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সাধারণভাবে বাউলরা বৈষ্ণব-ধর্মমতের একটি শাখা হলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাদের মৌলিক ব্যবধান রয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করে পূজার্চনা করে, কিন্তু বাউলের 'অধরা মনের মানুষ' থাকে শরীরের আধারে, পবিত্র প্রেমে—মন্দিরে-

মসজিদে নয়। 'জড় দেহের মধ্যে কিভাবে চিদানন্দময় আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় বাউলগণ তাহারই সন্ধান করেন'—লিখেছেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রকৃতপক্ষে, শরীরী কামকে অশরীরী প্রেমে রূপান্তরিত করাই বাউল-সাধনার গূঢ় কথা। বাউলের কাছে, তত্ত্বগতভাবে, নারী নিছক কাম-পরিতৃপ্তির আধার নয়। সে বাউলের কাছে 'প্রকৃতি', 'রাধারানি', 'রসময়ী', 'প্রেমময়ী'। বাউল আত্মভোলা। পরিপার্শের সঙ্গে তার যোগাযোগ, পারস্পরিক আদান-প্রদান নেই বললেই চলে। বহু বাউল-গানে এই আত্মভাবের কথা রয়েছে। বাউলের ধর্ম গুরুমুখী। এঁদের কোনও মন্ত্র-তন্ত্র বা শাস্ত্র-পুথি নেই। গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় পাওয়া গান আর রীতি-কৃত্যের মাধ্যমেই সাধনা চলে বাউলের।

বাউলের দেহ-সাধনার গুহ্য তত্ত্বের বিবরণ দিয়েছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :

> *বাউলদের এক প্রকার বিচিত্র ধরনের দেহ-দর্শন আছে। নারী-দেহকেই তাঁহারা মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করেন [পাঞ্জ শাহ কর্তৃক 'মেয়ে'র গৌরব ঘোষণাত্মক পদ বা 'মেয়ে ভজতে পারলে, পারে যাওয়া যায়'—প্রভৃতি পদ দ্রষ্টব্য]। তাঁহাদের দেহতত্ত্বের মতে, স্ত্রীধর্মের তিনটি দিনে নারীদেহে 'সহজ মানুষ', 'মনের মানুষ' বা 'অধরচাঁদে'র আবির্ভাব হয়। চতুর্থ দিনেই মনের মানুষ পলাইয়া যায়। সাধক নারীদেহ অবলম্বন করিয়া তিনদিন ধরিয়া 'ত্রিবেণী ধারায় বসিয়া মনের মানুষরূপী মৎস্য শিকার' করিবেন। সহজ অর্থে, স্ত্রীধর্মের বিশেষ দিনে স্ত্রী-পুরুষে বিশেষ দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সঙ্গত হইলে বাউল সাধনার সিদ্ধি নিকটতর হইবে।*
>
> — *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড)*

বাউল-বিশেষজ্ঞ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> *....এই তিনদিনেই বাউলের সাধনার প্রশস্ত সময়। ইহাই 'মানুষ' ধরার সময়। এই তিনদিনের শেষে পূর্ণভাবে সহজ মানুষের আবির্ভাব হয়। ইহা সাধকের অনুভূতি-সাপেক্ষ। এই সহজ মানুষের স্বরূপের অনুভূতি শৃঙ্গারে অচঞ্চল বীজোদ্ভূত আনন্দানুভূতি। এই আনন্দানুভূতিকে যোগক্রিয়ার দ্বারা ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী করিয়া দ্বিদলপদ্ম পর্যন্ত উঠাইলে অটলবীজরূপী ঈশ্বররূপের সঙ্গে শৃঙ্গার লীলাময় সহজ মানুষ রূপের মিলনে নিরন্তর অপরিসীম শৃঙ্গারানন্দের অনুভূতি জাগে। মূলত পরমতত্ত্বের স্বরূপই এই প্রকৃতিপুরুষের মিথুনঘটিত মহোল্লাসময় অবস্থা। এই অবস্থা লাভই বাউল সাধনার চরম লক্ষ্য। ইহাই তাহার আত্মোপলব্ধি—সহজ অবস্থা লাভ।*
>
> —*বাংলার বাউল ও বাউলগান*

অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাউল-সাধনায় নারীর ভূমিকা অবিসম্বাদিত। বাউল গান গায়, 'সাধন করো রে মন / ধরে মেয়ের চরণ'। বাউলের মনের মানুষ খোঁজার আধার ও মাধ্যম মহিলা-বাউল—যাঁরা আসলে 'বাউলের চরণদাসী'।

বাউলবিদ লীনা চাকী লিখেছেন :

স্থূল প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ—সাধনার এই চার স্তরে বাউলের আনাগোনা। গুরুর কাছে শিক্ষা শুরু হয় স্থূল স্তর থেকে। গুরু সে সময় মৌখিক কিছু উপদেশ দেয়। প্রবর্তস্তরে গুরু শেখায় শ্বাসের কাজ, দমের কাজ, নানা আসন, জপ জিকির।...দেহ হল ব্রহ্মাণ্ড। সেই ব্রহ্মাণ্ডের নানা স্থানে ভ্রমণ করতে হবে। দেহের মধ্যেই আছেন পরমেশ্বর। তাকে পেতে গেলে নানা প্রক্রিয়া আছে, তাকে জানায় গুরু।...

সাধক স্তরে প্রয়োজন নারীর। সে সময়ই খোঁজ পড়ে নায়িকার।

সাধনার কারণে বাউলকে যা কিছু শিখতে হয় তার কিছুই প্রায় শিখতে হয় না মহিলাটিকে। তার স্থূল, প্রবর্ত স্তরই নেই। সাধক স্তরে বাউল উঠলে তাকে আনা হয় সাধনার পাত্র হিসেবে।...মহিলাটিকে শেখানো হয় কিভাবে বাউলের নিম্নগতি রোধ করবে সে, কিভাবে দেহমিলনে সাহায্য করবে।

—বাউলের চরণদাসী

বাউলের সাধনার বৃত্তান্তটি এখনও অনেকাংশে রহস্যাবৃত। দেহ-সাধনার স্থূলতা অনেকক্ষেত্রেই ব্যভিচারের নামান্তর হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাউল-সাধনার রহস্যকে বিশেষ গুরুত্ব না-দিয়ে গ্রহণ করেছেন কেবল বাউলের গান। তিনি লিখেছেন :

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু সাধকের বেশ-ধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত : তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুড়ঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই-সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে, আশ্রয় করে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

—শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষা

বাউল-সাধনতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ না-থাকলেও বাউল-গান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা সুবিদিত। তিনি অনেক বাউল-গান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রহে ছিল লালন ফকিরের দুটি গানের খাতা। সেগুলি এখনও বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় রয়েছে। বাউল-গান সম্পর্কে তাঁর অনুরাগের কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই :

... আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে আমি যখন ছিলাম, বাউল-দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল-সুরের মিলন ঘটেছে। এর

থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।

—বাউল গান, সংগীত।

বাউল তাঁর সাধনার গভীর তত্ত্বকেই গানে প্রকাশ করেছেন। চর্যাপদের মতো বাউল-গানেরও দুটি অর্থ রয়েছে—সাধারণ অর্থ ও নিহিত অর্থ। বাউলের গানই তাঁর মন্ত্র। গানের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় তাদের সাধনতত্ত্ব দর্শন ও সাধ্যবৈশিষ্ট্য। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

বাউলগান যেমন একদিকে শিল্পরসের বিচারে বিচিত্র গীতিরসসিক্ত ও প্রতীকধর্মী বলিয়া উচ্চ প্রশংসা দাবি করিতে পারে, তেমনি ইহার পশ্চাদপটে একপ্রকার বিশেষ ধরনের আচার-আচরণমূলক কৃত্য ও সাধনা আছে এবং সেই সাধনার মূলতত্ত্ব যোগতান্ত্রিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)

ধর্ম, সাধনা, তত্ত্ব, কাব্য ছাড়া বাউল-গানের যে-ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, তা আসলে এই গানের অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন, অন্যদিকে সুফি-ভাবনার ঔদার্য—দুইয়ের সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে বাউল-গান। আমরা জানি, মধ্যযুগের ওই দুটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই নিগৃহীত মানুষ। বহু মুসলমান-বাউলও বাউল-গান লিখেছেন। তাঁদের রচনায় হিন্দু ও মুসলমান-ধর্মের একটি সমন্বয়ের চেষ্টা আমরা লক্ষ করেছি। উদার মানবিকতাই বাউল-সাধনার মূল প্রতিপাদ্য। সাম্য ও প্রেমের গান গেয়েছেন বাউল। সেই বিচারে বাংলার এই তথাকথিত অশিক্ষিত, অমার্জিত, ব্রাত্য বাউলরা পৃথিবীর সর্বোত্তম দার্শনিকদের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকারী।

আহম্মদ শরিফ লিখেছেন :

বাউল সম্প্রদায়ে জাতি বা শ্রেণী বৈষম্য নেই। হিন্দু-মুসলিম ভেদ নেই। হিন্দু গুরুর মুসলিম শিষ্য, মুসলিম গুরুর হিন্দু সাকরেদ গ্রহণে কোন দ্বিধা বা বাধা নেই।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

বাউল সম্প্রদায়ে জাতিপাঁতির ভেদ না থাকিলেও সহজিয়াপন্থী হিন্দু বাউল এবং সুফীপন্থী মুসলমান ফকির বাউল [আউলিয়া] এইরূপ দুটি সাধনপ্রণালী লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য অধিকাংশ স্থানে হিন্দু বাউল ও মুসলমান বাউলের সম্প্রদায়গত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই ; হিন্দু বাউলও সূফী সাধনার শব্দাদি ব্যবহার করেন, মুসলমান ফকির বাউলও হিন্দুর যোগতন্ত্রঘটিত শরীরতত্ত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দুর পারিভাষিক শব্দ যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন।

—প্রাগুক্ত

রবীন্দ্রনাথও বাউল-গানের এই অসাম্প্রদায়িক দিকটিতে আলো ফেলেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

...অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ভারতবর্ষীয় চিত্তের যে-একটি বড় আন্দোলন জেগেছিল সেটি মুসলমান অভ্যাগতের আঘাতে। অস্ত্র হাতে বিদেশী এলো, তাদের সঙ্গে দেশের লোকের মেলা হল কঠিন। প্রথম অসামঞ্জস্যটা বৈষয়িক অর্থাৎ বিষয়ের অধিকার নিয়ে, স্বদেশের সম্পদের ভোগ নিয়ে। বিদেশী রাজা হলেই এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মুসলমান শাসনে সেই বিরুদ্ধতার তীব্রতা ক্রমশই কমে আসছিল কেননা তারা এই দেশকেই আপন দেশ করে নিয়েছিল, সুতরাং দেশকে ভোগ করবার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্য-প্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমস্যা যতই কঠিন ততই পরমাশ্চর্য তাদের প্রকাশ। বিধাতা এমনি করেই দুরূহ পরীক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠত্বকে উদঘাটিত করে আনেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবেই সেই শ্রেষ্ঠের দেখা পেয়েছি, আশা করি আজও তার অবসান হয়নি। যে-সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেইসব চিত্তে সেই ধর্মসঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানস-তীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেইসব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়। তা অন্তহীনকালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীব, দাদূ, রবিদাস, নানক প্রভৃতির চরিত্রে এইসব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতম গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, — এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে, অথচ কেউ কাউকে আঘাত কবেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউলগানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

—বাউল-গান, সংগীত

বাউল-সম্প্রদায়ের পাশাপাশি আমরা অনুরূপ একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের কথা জানি,

যাঁদের ফকির-সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করা হয়। 'ফকির' শব্দটি আরবি শব্দভাণ্ডার থেকে গৃহীত। 'ফকির' শব্দটির অর্থ হল ভিক্ষুক বা দরিদ্র—যাঁরা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণ করে পরিতৃপ্ত—তাঁদেরই 'ফকির' বলা হয়। সাধারণভাবে মুসলমান-বাউলদেরই ফকির বলা হলেও, এঁদের দলে যে হিন্দুরা একেবারেই নেই, তা নয়। অক্ষয়কুমার দত্ত *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* নামে গ্রন্থে ফকিরদের সম্পর্কে লিখেছেন :

> *কিছুদিন হইল গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ফকির নামে একটি উপাসক সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু-মোসলমান উভয় জাতীয় লোকই আছে। অধিকাংশই মোসলমান, হিন্দুর ভাগ অতি অল্প। হিন্দু ফকিরের সকলেই গৃহী ; মুসলমানদিগের মধ্যে উদাসীনের অংশ অতি অল্প।...ইহারা পীর পয়গম্বর কিছু মানে না।*

বাউল ও ফকির-সম্প্রদায়ের মধ্যে আপাতভাবে কিছু বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে। বাউল সাধারণভাবে গেরুয়া আলখাল্লা পরে, আর ফকিরের পরনে থাকে কালো আলখাল্লা। অন্যদিকে, বাউল কণ্ঠে তুলসির মালা পরে, ফকিরের গলায় থাকে রঙিন পুঁতির মালা। গেরুয়া আর কালো—দুটি রং যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় রং। বাহ্যত এই তফাত থাকলেও, দুই সম্প্রদায়ই তাদের নিজ-ধর্মের মূলস্রোত থেকে স্বেচ্ছা-বিচ্ছিন্ন। কেউই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে না। বাউলের মতো ফকিরও মনের-মানুষ-সন্ধানী গান রচনা করে, কণ্ঠে তুলে নেয়। দুই দলই মরমিয়া সাধক। সাধারণভাবে মুসলমান-বাউলদের নামের আগে 'ফকির' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, ফকির লালন শাহ্, ফকির পাঞ্জু শাহ্, ফকির আকবর শাহ্, ফকির মহম্মদ বিশ্বাস, ফকির মিএগজান। কিন্তু সাধারণভাবে 'ফকির' এবং 'বাউল' প্রায়-সমার্থক।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> *সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়ারা সমাজে প্রাধান্য অর্জন করলে এঁরা বাউল সম্প্রদায়কে তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত করেন, এঁদের কেউ কেউ বাউল নামেই পরিচিত ছিলেন। মনে হয় বাউলসম্প্রদায় এঁদের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে, এদের মধ্যে থেকেই উত্থিত হয়। অবশ্য যে সমস্ত মুসলমান সুফীসাধক ও ফকিরগণ ইসলামের বাঁধাবাঁধি নিয়ম না মানার জন্য মুসলমানসমাজে 'বে-শরা পন্থী' বলে কিছু নিন্দিত হয়েছিলেন, তাঁরাও বাউলদলে যোগ দিয়েছিলেন। বাউলসম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নেই বলে ইসলাম-ধর্মাবলম্বীরা সহজেই এই মত গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য বাউলসম্প্রদায়ের কেউ কেউ সুফীসাধনার ইসলামী শব্দ বাউলগান ও সাধনায় ব্যবহার করে থাকেন।...*
>
> *বাউলরা শুধু গানের জন্য গান বাঁধেননি, তাঁদের গান সাধনারই ইঙ্গিত বহন করে, তা সাধনারই অঙ্গীভূত। তাঁরা মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 'অধরচাঁদ', 'মনের মানুষ' আছেন। তাঁকে আবিষ্কার এবং ভূতদেহে তাঁকে উপলব্ধি*

করতে পারলে সাধকের মোক্ষ-নির্বাণ-মুক্তি—'আলেখ নূরের' (পরম জ্যোতি) আসঙ্গ লাভ হয়। তখন তাদের পার্থিব সত্তা (সূফী মতে 'ফানা') ধ্বংস হয়ে গিয়ে সাধক ঈশ্বর-সাযুজ্য (সূফী মতে 'বাকা') লাভ করেন। অর্থাৎ সীমাবদ্ধ জড়সত্তাকে বিনাস করে দেহে ও মনে মুমুক্ষু হয়ে ওঠা বাউলসাধনার মূল কথা। তাঁরা 'মনের মানুষে'র সন্ধান করেন, সুতরাং পূজার্চনা, রোজানামাজ, মন্দির-মসজিদ, কাশী-কাবা সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন—এমনকি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে স্বাভাবিক ধর্মীয় ভেদ আছে, তাঁরা তাও মানেন না। হিন্দু বাউল স্বচ্ছন্দে সূফী সাধনার পরিভাষা ব্যবহার করেন, সূফী বাউলও নির্দ্বিধায় যোগতন্ত্রের শব্দানুশীলন করেন। রাধাকৃষ্ণের রূপক ব্যবহার করে বলে ওঠেন :

ওগো রাইসাগরে নামল শ্যাম রায়।
তোরা ধর গো হরি ভেসে যায়॥

কোন বাউল মন্দির-মসজিদকে তুচ্ছ করে বলেছেন :

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে।
তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
রুইখা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।

তাই তাঁরা আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ('মন রে, আত্মকথা না জানিলে সাধন হবে না')। তাঁরা নির্জনে বসে শুধু মনের মানুষকেই সন্ধান করেন :

আছে হেথায় মনের মানুষ মনে সেকি জপে মালা
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চ স্বরে কোন পাগ্‌লা॥

এই সমস্ত গান থেকে দেখা যাচ্ছে, বাউলগণ তাঁদের মর্ত্যসত্তার মধ্যেই 'সাঁই' অর্থাৎ স্বামী বা ভগবানকে উপলব্ধি করতে চান।

—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

বাউল-সংস্কৃতির পুরোধা পুরুষ, সম্প্রীতির উপাসক লালন শাহ ফকিরকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বিদ্বৎ-সমাজের কাছে পরিচিত করান। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় লালনের গানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ বঙ্গাব্দের *প্রবাসী* পত্রিকার আশ্বিন থেকে মাঘ সংখ্যায় *হারামণি* বিভাগে লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করে বাংলার সুধিসমাজে লালনকে পরিচিত করান। লালন দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। লালনের সেঁউড়িয়ার আখড়া রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের কখনও সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না, সে-বিষয়ে পণ্ডিতরা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি।

লালন ফকিরের ভাবধারা যতই সহজ-সরল, গভীর-নির্জন হোক, লালনের জীবন ও জীবনচর্যা নিয়ে পণ্ডিতরা নানা বিবাদ ঘনিয়ে তুলেছেন। লালন-চর্চার সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা তাঁকে ক্রমশই আরও রহস্যাবৃত করে তুলেছে। লালনের গান, তাঁর দর্শন, তাঁর সাধনার

কথা ছাপিয়ে অনেক সময়ই বড় হয়ে উঠেছে তাঁর জাতি ও ধর্মসত্তার প্রশ্নটি। লালন নিজে যতই লিখুন :

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন ভাবে—জাতির কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।

তবু, লালন-সমকালীন সমাজের মতো আধুনিককালের পণ্ডিত-সমাজও লালনের জাতিসত্তার পরিচয় খুঁজতেই ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। সরলাদেবী চৌধুরানী, সতীশচন্দ্র দাস, করুণাময় গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীর মোশারফ হোসেন, জলধর সেন প্রমুখ লেখকরা যা কখনও করেননি—দীর্ঘকাল পরে, ছয়ের দশক থেকে, পূর্ব-পাকিস্তানে লালনকে সুপরিকল্পিতভাবে 'মুসলমান' প্রতিপন্ন করার একটি কৌশলী প্রয়াস শুরু হয়। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি গবেষক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন :

...কিন্তু এরপরেই হঠাৎ চিত্র বদলে যায়। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের প্রস্তাবে ১৯৬৩ সালে গড়ে ওঠে পাকিস্তান সরকারের অর্থানুকূল্যে লালন শাহের সুদৃশ্য সৌধ ও মাজার, সৃষ্টি হয় 'লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র'। তৎকালীন গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এম. এ. হাইয়ের নকশা অনুসারে সুরম্য ও বিশাল যে-সমাধিসৌধ গড়ে ওঠে তার আদর্শ ছিল দিল্লীর মুসলিম সাধক হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মকবরা। একেই কি বলা যাবে লালন ফকির প্রসঙ্গটির প্রথম ইসলামীকরণ?

—ব্রাত্য লোকায়ত লালন

লোকসংস্কৃতির গভীর-নির্জন পথের পথিক সুধীর চক্রবর্তী প্রসঙ্গত এ এইচ এম ইমামউদ্দীনের লেখা *বাউল মতবাদ ও ইসলাম* (১৯৬৯) বই থেকে উদ্ধৃত করেছেন :

কতিপয় লালনভক্ত সুধী ব্যক্তির চেষ্টায় বিলুপ্তপ্রায় লালন শাহের আখড়া নবজীবন লাভ করিল, গড়িয়া উঠিল লালনস্মৃতি সৌধ। আখরা পরিণত হইল মাজার শরীফে এবং লালন সাহেব উন্নীত হইলেন মহাসুফীসাধক পদে।

—প্রাগুক্ত

লালন ফকিরকে পূর্ব-পাকিস্তানের গবেষকরা মুসলমান-জাতক বলে প্রতিপন্ন করার জন্য ঘোরতর সচেষ্ট হন এ-সময় থেকে। সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন :

...১৯২৭ সালের 'হিতকারী'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে লালন ফকিরের যে-জীবনী এবং তাঁর হিন্দু-উৎসের কথা সবাই জানতেন সে সম্পর্কে সংশয় সন্দেহ ঘনাতে শুরু হয়েছে পঞ্চাশের দশকে। ১৩৩৫ সালে বসন্তকুমার পাল লালন ফকিরের বিস্তৃত পরিচিতি লেখেন 'প্রবাসী' পত্রে। পরে পূর্ণাঙ্গ বই 'মহাত্মা লালন ফকির' লেখেন ১৩৬২ সালে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মতিলাল দাস প্রমুখ অগ্রণী লালন-গবেষকরা সকলেই সেই জীবনবিবরণ জানতেন এবং মানতেন যে লালন ভাঁড়ারা গ্রামের অর্থাৎ কুষ্টিয়ার মানুষ, জন্মত

হিন্দু কিন্তু নানা ঘটনা পরম্পরায় তিনি হয়ে যান জাতিহীন বাউল বা ফকির। কিন্তু একদল নতুন গবেষক বলতে চাইলেন লালন জন্মসূত্রেই মুসলমান।

—প্রাগুক্ত

লালন ফকির মারা যান ১৮৯০ সালে। কিন্তু তার পরে দীর্ঘকালীন লালন-গবেষণায় কখনও যা উদঘাটিত হয়নি, তা হল ১৯৫৩ সালে। মুহম্মদ আবু তালিব নামে এক পূর্ব পাকিস্তানি গবেষক *মাহে নাও* পত্রিকায় লালনকে জন্মগতভাবে মুসলমান বলে দাবি করেন। কিন্তু, *হিতকারী* পত্রিকায় লালনের প্রয়াণ-সংবাদ লেখা হয়েছিল এইভাবে :

> *ইহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না ; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই। ধর্ম্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না ; অথচ সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার থাকায অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণবধর্ম্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুবা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত।*

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩০২ সালে *ভারতী* পত্রিকায তাঁর লালন-অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন :

> *লালনের ধর্মমত অতি সরল ও উদার ছিল। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন ও শিষ্যদিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকল জাতিকেই গ্রহণ করিতেন। লালন হিন্দু নাম, সা উপাধি মুসলমান জাতীয়—সুতরাং অনেকেই তাঁহাকে জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিত। তিনি কোন উত্তর না দিয়া স্বপ্রণীত নিম্নলিখিত গানটি শুনাইতেন—*
>
> *সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে*
> *লালন ভাবে জাতির কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।*
>
> *লালন ফকিরের সকল কথা ভাল করিয়া জানি না, যাহা জানি তাহাও কিম্বদন্তীমূলক। লালন নিজে অতি অল্প লোককেই আত্মকাহিনী বলিতেন, তাঁহার শিষ্যরাও বেশী কিছু সন্ধান বলিতে পারেন না। লালন জাতিতে কায়স্থ, কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী চাপরা গ্রামের ভৌমিকেরা তাঁহার স্বজাতীয়।*
>
> *১০/১২ বৎসর বয়সে বারুণী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ যান, তথায় উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু দশায় পিতামাতা কর্তৃক গঙ্গাতীরে পরিত্যক্ত হন।...*

শ্মশানযাত্রী লালনকে একজন মুসলমান ফকীর সেবা-শুশ্রূষায় আরোগ্য করিয়া লালনপালন করেন ও ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন। এই ফকিরের নাম সিরাজ সা, জাতিতে মুসলমান। লালনের প্রণীত অনেক গানে এই সিরাজ সা দীক্ষাগুরুর উল্লেখ আছে।

সুধীর চক্রবর্তী এই বিবরণকে *হিতকারী*-র বিবরণের *ভাষান্তর* বলেছেন। লালনের মৃত্যু-সংবাদ *হিতকারী*-তে প্রকাশের পাঁচ বছর পরে অক্ষয়কুমারের বিবরণ প্রকাশিত হয়। সুধীর চক্রবর্তী *হিতকারী*-র বিবরণের সঙ্গে অক্ষয়কুমার-বর্ণিত লালনের পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনার তফাত খুঁজে পেয়েছেন। *হিতকারী*-র বিবরণে বলা হয়েছিল লালন অসুস্থ অবস্থায় *সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন*—অক্ষয়কুমার পিতা-মাতার পরিত্যাগের কথা বলেছেন।

পণ্ডিতদের এইসব বিবাদ-বিসম্বাদ লালনের পরিচয় আরও রহস্যাবৃত করে তুলেছে। লালনের গানও একইরকম প্রক্ষিপ্ত। লালন নিজে লেখাপড়া জানতেন না বলে তাঁর গানগুলির প্রামাণ্যতা সম্পর্কেও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

এইসব বাদ-বিবাদ পাশে সরিয়ে রেখে আমরা উৎকণ হতে পারি লালন শাহ ফকিরের সেইসব জাতপাতহীন নির্জন-এককের কয়েকটি গানে। আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের ধর্মপ্রচারের উগ্রতার বিরুদ্ধে লালন গেয়েছেন :

ব্রহ্মজ্ঞানী আর খৃষ্টানেরা
নামব্রহ্মসার বলেন তারা
দরবেশে কয় বস্তু কোথায়
দেখনারে ॥

কিংবা :

নয়নে রূপ না দেখতে পায়
নাম-মন্ত্র জপিলে কি হয়?
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়
রূপের তুল্য রূপ আছে কার?

খাঁচাবন্দি অচিন পাখির রূপারোপ ঘটেছে লালনের নানা গানে। অচিন পাখির রূপক হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক :

হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি—
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায় ঐ খেদে ঝোরে আঁখি,
পাখি বুলি বলে শুনতে পাই
রূপ কেমন দেখি না ভাই
এ তো বিষম ঘোর দেখি ॥

কিংবা :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়
ধরতে পেলে মনোবেড়ি
দিতাম তাহার পায়।

লালন যে শরিয়ত মানেননি, তা জানান এইভাবে :

এমন দিন কি হবে রে আর
খোদা সেই করে গেল
রসুলরূপে অবতার।

অথবা :

আদমেতে পয়দা করে
খোদ ছুরাতে (আকৃতি) পরওয়ার।
দুরাতে বিনে পয়দা কি সে হইল
সে কি হঠাৎ কার?

হিন্দুব পৌত্তলিকতাও লালনের কাছে নিরর্থক ·

মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে?
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী
ভোলে না সে এ সব রূপী
ও যে মানুষ রতন চেনে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের 'পরকাল' বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন লালন :

ম'লে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হবে কেন বলে?
ম'লে হয় ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেন এত জপতপ এত করে জলেস্থলে?

শরিয়ত প্রথাকে খারিজ করে দিয়েছেন লালন অনায়াসে :

শরিয়তের বুনিয়াদে পাবে না তা কোনমতে
জানা যাবে মারফতে যদি মনের বিকার যায়।

লালন গাইছেন :

যে হি মুরশিদ সে কি খোদা।
আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি।

কোরান বিষয়ে মুসলমানের বিশ্বাসের মূলে আঘাত করেন লালন :

কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়
এক এক দেশে এক এক বাণী কোন খোদা পাঠায়?
যদি একই খোদার হয় বর্ণনা
তাতে তো ভিন্ন থাকে না
মানুষের সকল রচনা তাই তো ভিন্ন হয়।

ধর্ম ও জাতপাতহীন এক অভিন্ন মানব-সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন লালন :

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে—
যেদিন হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান
জাতিগোত্র নাহি রবে ॥
শোনায়ে লোভের বুলি
দূরে ঠেলে না দেবে।
আমি ফকির হয়ে একঠাই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেউ নাহি পাবে ॥
ধর্মকূল গোত্র জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে মোরে দেখায়ে দেবে ॥

লালন ফকিরের শিষ্য দুদ্দু শাহ্-ও লালনের মতো জাতপাতহীন মানব-সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন :

মলি কেন দরগাতলায়
হত্যে দিয়ে মন—
সকল দরগার গোড়া
চিনলি সে সেই মানুষ রতন।

তিনি লিখেছেন :

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো তাই,
বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই।
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব
পঞ্চতন্ত্রে করে জপতপ
তুলসী-মালা-অনুষ্ঠান সদাই।
বাউল মানুষ ভজে

যেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুর অমৃতে
নারী সঙ্গী তাই।

কিংবা :

না মেনে ব্রহ্মের করণ
নোড়াপূজার করে প্রচলন
না জেনে পুরুষ প্রকৃতি
শিবলিঙ্গে পূজে হয় সতী।

অথবা :

মানুষ রেখে পূজে মলি খড়ের বান্দা।
শিব কালী কৃষ্ণ নারায়ণ
মানুষ সবাই হলে নিরাপণ [নিরূপণ]
তবে কেন জ্যান্ত ত্যেজে মরা ভজে মরিস দাদা।

লালন ফকিরের যোগ্য উত্তরসুরি দুদ্দু শাহ ফকিরের জন্ম এক সম্পন্ন কৃষক পরিবারে ১২০৩ সালে। লালনের কাছে দীক্ষা নিলেও ইসলামধর্মের সারতত্ত্বও অধীত ছিলেন তিনি। কিন্তু, তাঁর বিন্দুমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। মুসলমান-সমাজের অন্ধকারের কথা তিনি অনায়াসে লিখেছেন। ইসলাম-ভিত্তিক সুফিধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ভাবনাকে মিলিয়েছিলেন তিনি। সর্বোপরি, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন মানবতাকে। দীর্ঘায়ত জীবনে (মৃত্যু : ১৩১৪) সেই মানবতারই জয়গান গেয়েছিলেন দুদ্দু শাহ।

এস এম লুৎফর রহমান লিখেছেন :

এই উজ্জ্বল মানবপ্রীতি ও অসাম্প্রদায়িকতা লালনীয় ঐতিহ্যেই পেয়েছেন দুদ্দু শাহ। এ ঐতিহ্য অবশ্য এ দেশের জনসমাজের অন্তর্নিহিত সত্তারই সঙ্গে যুক্ত। কাজেই বাংলাদেশী জনসমাজের যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সুদীর্ঘকাল নীচুতলার মানুষের মধ্যে দিয়ে পুরুষপরম্পরায় বয়ে আসছিল তাকেই মহত্ত্ব দিয়েছেন লালন-দুদ্দু। ...গুরু শিষ্য উভয়েই ছিলেন শ্রেণী সচেতন। তাদের সাম্প্রদায়িকতা শ্রেণী সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেই তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। — *দুদ্দু শাহ*

দুদ্দু গান বেঁধেছিলেন :

অতীতকালে যারা জাতি সৃষ্টি করেছে,
জানতো না তারা এ জগতে কোন দেশে কোন জাতি আছে॥

কিংবা :

এক স্কুলে একজনা গুরু

হিন্দু, খৃষ্ট, মুসলমানের পড়া হয় শুরু
এক গুরুতে ধর্ম শিক্ষা
কতোভাবে বল শেষে ॥

জাতাজাতির সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে দিলে।
যতসব কায়েত বামন অবশেষে এই বুঝিলে ॥
শূদ্র, বৌদ্ধ, ইতর, মুসলমান
সবি তো এক মায়ের সন্তান
ভারতের মাটিতে সবারই প্রাণ
কেউ না দেখিলে ॥

যে ঈশ্বর দেয় জাতির ফরমান
সে ঈশ্বর তাই খান্নান শয়তান
দীন দুদ্দু রচিয়া যায় গান,
এ পাপ দূর হবে কখন ॥

লালনের ধারায়, তাঁর মৃত্যুর পরে, পাঞ্জু শাহ্ নামে এক মুসলমান-বাউলও খুব খ্যাতি পেয়েছিলেন। তিনিও লালনের মতো কোনও ধর্মচিহ্ন, সাম্প্রদায়িক পরিচয় মেনে চলেননি। কিন্তু, তিনি ইসলামি ধর্মশাস্ত্র ও হিন্দু-যোগতন্ত্রে অধীত ছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা গ্রামে এক মুসলমান-পরিবারে ১২৫৮ সালের ২৮ শ্রাবণ জন্ম হয় পাঞ্জু শাহ্‌র। ১৮৯০ সালে পাঞ্জু একটি মুসলমানি 'কিতাব' রচনা করেন। *ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর* নামে ওই গ্রন্থে সুফিতত্ত্বের নানা বিবরণ রয়েছে। পাঞ্জুর সবিশেষ বিশেষত্ব কিন্তু তাঁর রচিত গানে। ৪৫-বছর বয়সে তিনি 'ফকিরি' গ্রহণ করেন। এবং তারপর থেকে অসংখ্য গান রচনা করেছেন পাঞ্জু। তাঁর সেইসব মরমীয়া গানে চৈতন্য-তত্ত্বের প্রভাব ছিল। বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, অধ্যাত্মবাদের কথা রয়েছে তাঁর গানে। কিন্তু, সব ছাপিয়ে, তাঁর গানে ফুটে উঠেছে জাতপাতহীন এক মরমী বাণী।

পাঞ্জু-বিশেষজ্ঞ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ : জীবন ও কাব্য* গ্রন্থে লিখেছেন :

> *পাঞ্জু সাহিত্যে বিভিন্ন জাতি এবং সমকালীন সমাজের ধর্মীয় ঐক্য-অনৈক্য সংক্রান্ত কিছু খণ্ডচিত্র বিবৃত হয়েছে। এদেশে প্রধানত দুটি ধর্মাবলম্বী বাস করেও সময়ে বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়েছে। হিন্দুরা মুসলমানগণকে যবন এবং মুসলমানেরা হিন্দুদের বে-দ্বীন বলে উপহাস করেছে। কবির ভাষায় :*
>
> *হিন্দুরা যবন দেখে ঘৃণা করিল।*
> *মুসলমান হিন্দুকে বে-দ্বীন কহিল ॥*

পাঞ্জু শাহ গান বেঁধেছিলেন :

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন-পাগলা।
যে ভাবে আল্লাতালা বিষম লীলা ত্রিজগতে করছে খেলা ॥
কত জনে জপে-মালা তুলসীতলা,
হাতে ঝোলে জপের ঝোলা,
আর কতজন হরি বলে মারে তালি, নেচে গায় হয় মাতেলা ॥
কতজন হয় উদাসী তীর্থবাসী মক্কাতে দিয়াছে মেলা।
কেউ বা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে সদায় করে আল্লা আল্লা।
স্বরূপে মানুষ মিশে স্বরূপদেশে বোবায় কালায় নিত্যলীলা
স্বরূপের ভাবনা জেনে চামর কিনে হচ্ছে কত গাজীর চেলা ॥

ধর্মের অপ্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করেছেন তিনি এইভাবে :

লোকে পেটের জ্বালায় দেশান্তরী হয়,
হিন্দু-মুসলমানের বোঝা মাথায় করে বয়,
কার বা জাতি কেবা দেখে ঘরে এলে চিহ্ন কি ॥
জেতে অন্ন নাহি দিবে রোগে না ছাড়িবে,
পাপ করিলে কোম্পানী জাত ধরে নিয়ে যাবে,
মৃত্যু হলে যাব চলে জেতের উপায় হবে কি ॥

অন্যত্র :

কেউ বলে নীরদ আহ্লাদিনী,
কেউ বলে নবী আল্লা-গান,
কেউ সুন্নতে ছাপ করে তনু, কেউ ফোঁড়ে দুই কান ॥
এ সকল বিধির কাহিনী
দরগা দুর্গা চূড়ামান,
পাঞ্জু করে ঠেলাঠেলি হইল না জ্ঞান ॥

বস্তুত, এইসব তথাকথিত অশিক্ষিত, বিচ্ছিন্ন, একক মানুষরা যে-ভাবে দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে মিলনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা এই আধুনিক যুগেও যথেষ্ট দুর্লভ। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের একেবারে বিপ্রতীপে বাউল-সম্প্রদায়ের এই সম্প্রীতির গান পরবর্তিকালের সাহিত্যে প্রবাহিত হয়েছে ফল্গুধারার মতো। কিন্তু, রক্তচক্ষু ধর্ম ও রাজনীতি তাতে ভ্রূক্ষেপ করেনি কখনও, বারবারই পরুষ হাতে ভেঙে দিয়েছে প্রেমের একতারা, ঝলসে উঠেছে তরবারি।

লোকায়ত সম্প্রীতি ও বৈদগ্ধ্যের বিভ্রম

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির নানা সংমিশ্রণ আমরা লক্ষ করেছি লোকায়ত জীবনে। সত্যপীরের পুজো এই মিলিত সংস্কৃতির এক অমূল্য অভিজ্ঞান। *সত্যপীরের পাঁচালি* রচিত হয়েছে এ-সময়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এ-জাতীয় পাঁচালি ও ব্রতকথা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ-সময় লিখিত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ভণিতায় সত্যপীরের পাঁচালির পুথি পাওয়া গিয়েছে। রামেশ্বর প্রকৃতপক্ষে *শিবায়ন* কাব্যশাখার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। গবেষকরা মনে করেন, মেদিনীপুর জেলার বরদা পরগনার অন্তর্ভুক্ত যদুপুর গ্রামে ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে রামেশ্বরের জন্ম হয়। রামেশ্বরের ভণিতায় চারটি পুথি পাওয়া গিয়েছে—*শিবসঙ্কীর্তন* বা *শিবায়ণ*, *শীতলামঙ্গল* বা *মগপূজা পালা*, *সত্যনারায়ণের ব্রতকথা* এবং *সত্যপীরের ব্রতকথা*।

সত্যপীর মধ্যযুগীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সমন্বয়ী দেবতা। 'সত্যপীর' পরবর্তিকালে 'সত্যনারায়ণ' নামে কেবল হিন্দুর আরাধ্যও হয়েছেন। সে-সময় বিবদমান হিন্দু-মুসলমানকে নিরস্ত করার জন্য এবং মুসলমান শাসনকর্তাকে প্রীত করার জন্য এই সত্যপীরের উদ্ভাবনা হয়ে থাকবে। লোকায়ত জীবনে সত্যপীরের কাহিনী যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, তা বোঝা যায়। আসলে, অধিকাংশ মুসলমানই এ-সময় হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে হিন্দু-সংস্কার থেকেই গিয়েছিল। সে-কারণেও পীরপূজা প্রচলিত হয়েছিল। হিন্দু থাকাকালীন তাঁরা যেমন কোনও হিন্দু-দেব-দেবীকে পুজো করতেন, মুসলমান হয়ে পিরের দরগায় যাতায়াত শুরু করলেন।

ড. নজরুল ইসলাম লিখেছেন :

> *সমন্বয়বাদীরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের সৃষ্টি করল। হিন্দুরা তাকে সত্যনারায়ণ হিসেবে পুজো করল। মুসলমানরা তাকে সত্যপীর বলে শ্রদ্ধা করে সিন্নি চড়াল।*
>
> —*বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*

এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অবশ্যই কৃত্রিমতায় আক্রান্ত। সাধারণ স্তরে এর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় না। দুই সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ধর্ম-স্বাতন্ত্র্য নিয়েই পাশাপাশি বসবাস করেছে। যদিও তাতে প্রচেষ্টাটি গুরুত্বহীন হয়ে যায় না। অষ্টাদশ শতকের কবি রামেশ্বর সেই সমন্বয়-সংশয়ের কথা লিখেছেন তাঁর পাঁচালিতে :

> *নারায়ণ নামে সিন্নি না হয় সম্ভব।*
> *পীর হলে প্রাণ গেলেও না পুজে হিন্দর ॥*

যদিও নারায়ণের নামে সিন্নি যে অসম্ভব, তা নয়। বাস্তবে আমরা এখনও তেমন

উদাহরণ লক্ষ করি। সাহিত্যে সম্প্রদায়ের মিলনের কথা বারবার বলা হয়েছে। সত্যপীরের পাঁচালি রচনা কবেছেন দুই সম্প্রদায়েরই কবিরা। শেখ ফয়জুল্লা তাঁর পাঁচালিতে লিখেছেন :

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ
শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন।

মঙ্গলকাব্যের কবিরাও পীর-বন্দনা করেছেন। বিজয় গুপ্তর *পদ্মপুরাণ* ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *ক্ষমানন্দ*-তে লক্ষীন্দরের বাসরে *কোরাণ* রেখেছেন কবিরা। কেতকাদাস, রূপরাম, মানিকরাম, সীতারাম দাস প্রমুখ মঙ্গলকাব্যের কবিরা পির-ফকিরদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছেন। সীতারাম দাস লিখেছেন :

বন্দ্যো পীর ইসমাল গড় মান্দারনে
দরবেশ ফকির বন্দিব নিগাএগ
জোড় হাতে বন্দিব পাড়ুয়ার সুফী খাএগ।

কৃষ্ণরাম দাস সপ্তদশ শতকে তাঁর *রায়মঙ্গল* কাব্যে এক প্রতীকী দেবতার দুই হাতে অর্পণ করেছিলেন কোরান ও পুরাণ। সপ্তদশ শতকের কবি সৈয়দ মুহম্মদ আকবর ধর্ম-সমন্বয়ের কথা লিখেছিলেন :

বিনয় করিয়া বন্দি ফিরিস্তার পদ।
ছুন্নি কুলে ফিরিস্তির সে হিন্দুর নারদ ॥
তক্ত সিংহাসনে বন্দি আল্লাহর দরবারে।
হিন্দুকুলে ঈশ্বর যে জগতে প্রচারে ॥
পয়গম্বর সকল বন্দি করিয়া ভক্তি।
হিন্দু কুলে দেবতা যেন হৈল প্রকৃতি ॥
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ।
হিন্দু কুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপে ॥
মা হওয়া বন্দম জগত জননী।
হিন্দু কুলে অবতার চৈতন্য রূপে দেখা ॥
খোয়াজ খিজির বন্দম জলেতে বসতি।
হিন্দুকুলে বসুদেব শূন্য যে প্রকৃতি ॥
আর সকল বন্দি নবীর সভায়।
হিন্দু কুলে দোয়াদেশী গোপাল ধেয়ায় ॥
আওলিয়া আম্বিয়া বন্দি বারবানি কোরাণ।
হিন্দু কুলে মুনিভাব আছয়ে পুরাণ ॥
পীর মুর্শিদ বন্দম আর ওস্তাদ পুরাণ।
হিন্দু কুলে গুরু যেন করয়ে পূজন ॥

মলুয়া পালার গীতিকার লিখেছেন :

হেঁদু আর মোছলমান একই পিণ্ডির দড়ি।
কেহ আল্লা বলে আর কেহ বলে হরি॥
বিসমিল্লা আর ছিরিবিষ্টু একই গেয়ান।
দোফাক করি দিয়ে পরভু রাম রহিমান॥

লোকায়ত জীবন ও লোকায়ত সাহিত্যে এ-ভাবে যতই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র আঁকা হোক, পরবর্তী সময়ে, উনিশ শতকের শুরুতে, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীরা জনজীবনে একধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদের ঢেউ তুললেন। সমকালীন রাজনীতির প্রভাব তাঁরা এড়াতে পারেননি। পক্ষান্তরে, সেই উগ্র রাজনীতির শিকড়েই জল-সিঞ্চন করেছেন তাঁরা। এই জাতীয়তাবাদ সাধারণভাবে ইংরেজ-বিরোধী হলেও, তার ভিতরে প্রকট হয়েছিল তীব্র মুসলমান-বিরোধিতা। পরাধীনতা ঘোচাতে এইসব হিন্দু-বুদ্ধিজীবীরা যতখানি-না ইংরেজ-বিরোধী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ওই তথাকথিত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মুসলমান-জনগোষ্ঠীকে জড়াবার কোনও তাগিদ বোধ করেননি। এঁদের সর্বাগ্রে ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন :

সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান-খ্রীস্টান প্রভৃতির এ-দেশের উপর দাবী আছে—ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। এই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন...আর সেই স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই নবগোপাল 'হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠা করেন।

এই তথাকথিত স্বাদেশিকতার প্রেরণায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের রচনায় এই সঙ্কীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথা উচ্চকণ্ঠে বলেন।

উল্লিখিত লেখকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই (১৮২১-৫৯) ছিলেন এই রক্ষণশীল লেখকদের নেতৃস্থানীয়। *সংবাদ প্রভাকর* (১৮৩১) পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, কোনও প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনে তাঁর ন্যূনতম সমর্থন ছিল না। বিশেষত, মুসলমান-জনগোষ্ঠী বিষয়ে তাঁর বীতরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি মুসলমানদের নির্বিচারে 'যবন' ও 'নেড়ে' বলে অবিহিত করেছেন। ১৮৫৭ সালের ২৯ জুন তিনি *সংবাদ প্রভাকর*-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছিলেন :

অবোধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহের সময়ে গবর্ণমেন্টের সাহায্যার্থে কোনপ্রকার সদনুষ্ঠান না করাতে তাহারদিগের রাজভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ প্রচার

হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহারদিগকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন....।

মুসলমানদের সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর উক্তি :

মর্জি তেড়া কাজে ভেড়া
নেড়া মাথা যত ॥
নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মত ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর চেয়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) নানা কাব্যকাহিনিতে মুসলমান-বিদ্বেষ আরও তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষত, তাঁর স্বাধীনতা-উদ্দীপক কাব্যগ্রন্থ *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮)-এর মধ্যে এই বিদ্বেষ খুবই প্রকট। মহম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন :

রঙ্গলালের উদ্দেশ্যে ছিল ইংরেজী শিক্ষিত নব্য হিন্দু যুবকদের হিন্দু-ঐতিহ্যে সচেতন করে তোলা। এই প্রয়োজনে তিনি হিন্দু-বীরের মাহাত্ম্য কীর্তন গেয়ে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক মুসলমান চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত করেন। তাঁর কাব্যে 'স্বাধীনতাহীনতার' গ্লানির কথা আছে, তা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই, তবে কোন কোন সমালোচক যে এ-কথা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপনের আহ্বান বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তা সম্ভবত কষ্টকল্পনা। কেননা রঙ্গলালের যবননিধনের গান বিশুদ্ধ মুসলিম-বিদ্বেষে পূর্ণ। কাব্যের মাধ্যমে ইংরেজের বিরুদ্ধতা করার কোন সচেতন অথবা অচেতন প্রয়াস রঙ্গলালের ছিল—এরকম প্রমাণ মেলে না। পরন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের শেষে তিনি ইংরেজের কৃপা ভিখারী।

বস্তুত, রঙ্গলালের *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮) কাব্যে সুবিখ্যাত স্বাধীনতাহীনতার গ্লানি মোটেই তাঁর ইংরেজ-বিরোধিতার পরিচায়ক নয়, বরং তা তাঁর মুসলমান-বিদ্বেষকেই প্রকট করে তোলে। কেননা, এ-ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, রঙ্গলাল এখানে আবেগ-নির্ভরভাবে রাজপুতের স্বাধীনচেতা প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্থাপন করেছেন তথাকথিত নারীলোলুপ আক্রমণকারী আলাউদ্দিন খিলজিকে। সেই আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযোদ্ধা রানা ভীমসিংহর উদ্দীপক উচ্চারণে ফুটে উঠেছে রঙ্গলালের সুতীব্র মুসলমান-বিদ্বেষ :

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।

দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়।
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে
ক্ষত্রিয় তনয়।
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয়ে হে
হৃদয় নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে
বিলম্ব কি সয়।

... ...

যদিও যবন মারি চিতোর না পাই হে
চিতোর না পাই
স্বর্গ সুখে সুখী হব এসো সব ভাই হে
এসো সব ভাই।

এক্ষেত্রে আমরা যদি-বা রঙ্গলালের বিদ্বেষকে মুসলমান-শাসকের প্রতি বিদ্বেষ বলে ভাবার চেষ্টাও করি, অন্যত্র তিনি কিন্তু আলাউদ্দিনের প্রতি বিদ্বেষকে করে তুলেছেন সমগ্র মুসলমান-জাতির প্রতি তাঁর নির্বিশেষ বিদ্বেষ :

দারুণ দুর্নীতি দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ!
অধার্মিক বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।
সকল জাতের প্রতি ঘোর অহঙ্কার।
কপট লম্পট শঠ পাতক পুলক।
ন্যায়ান্যায় বোধহীন বিষম বঞ্চক।

শূর সুন্দরী (১৮৬৮) কাব্যে রঙ্গলালের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিশ্লেষণ :

তৈল যথা তোয় সহ সংমিলিত নহে।
হরি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে ॥
ভুজঙ্গের প্রতি যথা বিরাগী নকুল
হিন্দু-মুসলমানেতে হেন ভাব প্রতিকূল।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮৩৮-১৯০৩) তাঁর মুসলমান-বিদ্বেষের প্রবণতা প্রকট করেছেন *কবিতাবলী* (১৮৭০-৮০) কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায়। যেমন :

বিংশতি কোটি মানবের বাস

এ ভারতভূমি যবনের দাস।
রয়েছে পরিয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

কাল্পনিক ঐতিহাসিক কাব্য *বীরবাহু* (১৮৬৪) একইভাবে কবির মুসলমান-বিদ্বেষ প্রকট করে :

মা গো ও মা জন্মভূমি
আরো কতকাল তুমি
এ বয়সে পরাধীন হয়ে কাল যপিবে।
পাষাণ যবন দল বল আর কতকাল।
নির্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে॥

নবীনচন্দ্র সেনও (১৮৪৭-১৯০৯) পূর্বজ কবিদের মতো মুসলমান-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারেননি :

নিরাশ্রয় অনাথিনী, যবনের করে
সহি কত শত বর্ষ অশেষ যন্ত্রণা
অবশেষে তোমাদের ডাকি সমাদরে
লইনু আশ্রয় যেন অনাথা ললনা।
সে অবধি রহিয়াছে অধিনীর মত
এইরূপে শতবর্ষ হইয়াছে গত।

অবশ্য, লক্ষণীয়, পরবর্তিকালে *পলাশীর যুদ্ধ* (১৮৭৫) কাব্যে কবির ভাবনা অনেক পাল্টে গিয়েছিল। সেখানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের গভীরতা অনুধাবন করেছেন নবীনচন্দ্র :

জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন, ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসূত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্মের কারণে।

অন্যদিকে, বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের এই দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্ব সম্পর্কের চিত্র প্রকট হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫), মনোমোহন গোস্বামী বা গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১৯) নাটকে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন আমরা দেখেছি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের *সরোজিনী* (১৮৭৫), মনোমোহনের *রোশনারা* (১৯০১) এবং গিরিশচন্দ্রের *সৎনাম* বা *বৈষ্ণবী* (১৯০১) এবং *ছত্রপতি শিবাজী* (১৯০৭) নাটকে হিন্দু-

জাতীয়তাবাদের কথা খুবই তীব্রভাবে বলা হয়েছে। আসলে, এইসব নাটকে প্রচ্ছন্ন রয়েছে নাট্যকারদের প্রবল মুসলমান-বিদ্বেষ। সাধারণভাবে এইসব কবি ও নাট্যকাররা বিদেশি মুসলমান-শাসনের বিরুদ্ধে সরব হতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে স্বাদেশিকতার স্ফুরণ ঘটাতে। কিন্তু রাজশক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা প্রায়শই তাঁদের মুসলমান-বিরোধিতাকে সাম্প্রদায়িক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া, জাতীয়তাবাদ বলতে তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের মর্ম বুঝতে সক্ষম হননি। দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস যে-ভাবে জাতীয়তাবাদের বাইরেই রেখেছিল মুসলমান-সম্প্রদায়কে, মুসলিম লিগ বা হিন্দু মহাসভা যেমন পৃথক জাতিসত্তার জিগির তুলেছিল, তেমনই তৎকালীন কবি-লেখকরাও জাতীয়তাবাদের স্বরূপ আবিষ্কারে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। যেন, জাতি বলতে তাঁরা 'নেশন' না-বুঝে 'কাস্ট' বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> *প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতবাসীদিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কিনা? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দু জাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুগণের যেরূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া মনে হয়?*
>
> *—ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, প্রবন্ধ মঞ্জরি*

বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের এ-রকম বিভ্রান্তিই মনে হয় দুই সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক সম্পর্ককে ক্রমশ অস্বাভাবিক করে তুলেছে। এমনকী, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত এই প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। ফলে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও এঁদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। সৈয়দ নওসার আলি চৌধুরী, সৈয়দ এমদাদ আলি, ওসমান আলি প্রমুখ মুসলমান-লেখকরা সঙ্গত কারণেই হিন্দু-লেখকদের বিদ্বেষের সমালোচনা করেছেন। ইংরেজের বিভেদ নীতি, কংগ্রেসের একপেশে জাতীয়তাবাদ জিন্নাহ ও শ্যামাপ্রসাদের ভ্রান্ত রাজনীতি আর হিন্দু-বুদ্ধিজীবীদের বিদ্বেষী রচনা উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন করে ফাটল ধরাল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্বাভাবিকতায়।

উপন্যাসের সূচনা : বঙ্কিমচন্দ্র ও সাম্প্রদায়িকতা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজ-জীবনে যে-বিস্তৃত পরিবর্তনের ঢেউ ওঠে, তারই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য প্রতিফলন দেখা যায় বাংলা গদ্যসাহিত্যে। শতকের প্রথমার্ধে যে-প্রস্তুতিপর্ব আমরা লক্ষ করেছিলাম, সূচনার যে-বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখেছিলাম, শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা পল্লবিত, বিকশিত হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীশ্রেণি এই সময়ের সীমায় নিজেদের নতুনভাবে গড়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের প্রভাবের সঙ্গে মিশেছিল নানা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বও। এই সবকিছু মিলেই বাঙালি-সমাজ ও সংস্কৃতিতে নবজাগরণের ঊর্মিল প্রবাহ দেখা যায়। বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে এ-সময় যে-সার্বিক গতিশীলতা দেখা গিয়েছিল, তা পরবর্তিকালকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। তৎকালীন সাহিত্যে, বিশেষত গদ্যসাহিত্যে, এই পরিবর্তনচিহ্নগুলি খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই সময় গোটা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ বাংলায় এসেও পৌঁছেছিল। জাতীয়-জীবনে-সৃষ্ট ইংরেজ-বিরোধী উদ্দীপনায় আন্দোলিত হয়েছিলেন বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। এ-সময় থেকেই তাঁরা ইংরেজ-শাসনের প্রতি আস্থা হারাতে থাকেন। নীলকরদের অত্যাচার চব্বিশ-পরগনা-যশোহর-নদিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে প্রভাব ফেলল কলকাতার বুদ্ধিজীবীমহলেও। বুদ্ধিজীবীরা একযোগে প্রতিবাদে সরব হলেন। তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হল। যাঁরা এতদিন ভেবেছিলেন সদাশয় ইংরেজ পরহিতৈষণার জন্যই ভারতে এসে রাজত্ব স্থাপন করেছেন, তাঁরা এক কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিবাদী আগুনের ফুলকি ছিটকে উঠতে লাগল। এমনকী, যে-সব বুদ্ধিজীবী বিশুদ্ধ চৈতন্যচেতনায় ভাবিত ছিলেন, তাঁরাও এ-বার বিষয়টির রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করলেন। আমরা দেখলাম, কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারতসংস্কারসভা' (১৮৭০) গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলল, নবগোপাল মিত্রর 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), মনোমোহন বসুর দেশাত্মবোধক সংগীত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা (১৮৭২), আধুনিক প্রজন্মের 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভা' (১৮৭৬) ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালির রাষ্ট্রচেতনার এক উৎসমুখ উন্মোচিত হল।

রাজনৈতিক জাগরণের সমান্তরাল প্রবাহে লগ্ন হল সামাজিক উপলব্ধির প্রবাহও। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ চিন্তাবিদরা বাংলার সামাজিক চিন্তনে আলোড়ন তৈরি করলেন। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্র-তথা-বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর হিন্দুধর্মের নবজাগরণ-প্রয়াস, কেশবচন্দ্রের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন, বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসা এবং শিবনাথ শাস্ত্রী কিংবা সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাদেশিক রাজনৈতিকতা বাংলার সামাজিক জীবনে প্রবল অভিঘাত তৈরি করেছিল।

এইসব কর্মধারার পাশাপাশি, উনিশ শতকের একেবারে শেষাংশে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সমন্বয়ী দর্শনও বাংলার জাতীয় জীবনে সবিশেষ প্রভাব-বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক বিতর্ক ও নেতৃত্বের অধিকার-সংক্রান্ত বিরোধের ফলে ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় সুবিস্তৃত হতে পারেনি। তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় যুক্তিবাদ অনেক বেশি প্রাধান্য পায়। ব্রাহ্মদের খর্ব করার ব্যাপারে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মরা বহুদেববাদ-আশ্রয়ী পৌরাণিক সাহিত্যকে একেবারেই গুরুত্ব দেননি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে পৌরাণিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটালেন। পৌরাণিক প্রণোদনায় বাঙালিকে আকৃষ্ট করলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র খুবই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তিবাদের আলোকে পৌরাণিক আদর্শ ও ঐতিহ্যের বিচার করলেন। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রসংহিতা ও ভারতীয় পুরাণের প্রাসঙ্গিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পাশাপাশি, শতকের শেষাংশে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে বাঙালি জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগের এক সমন্বয়ী সাধনার মুখোমুখি হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রর পূর্বসুরি ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) কেবল যে যুক্তিবাদী প্রবন্ধ-রচনায় বাঙালি পাঠককে প্রভাবিত করেছিলেন, তা-ই নয়, সৃজন-সাহিত্যেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। হিন্দু কলেজে ডিরোজিও-র কৃতী ছাত্র ভূদেব ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তর সতীর্থ। বালক-বয়সে সংস্কৃত কলেজের পাঠ নেওয়ার পর তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ফলে প্রাচীন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে নবোদ্ভিন্ন ইউরোপীয় সভ্যতার পরস্পর-বিরোধিতার মধ্যে তিনি একধরনের সমন্বয়ের সন্ধানী হয়েছিলেন। একদিকে সনাতনী আধ্যাত্মিকতা, লোকহিত জ্ঞান, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শের পাশাপাশি পশ্চিমী জ্ঞানবাদ, বিজ্ঞানচর্চা, সংস্কারহীনতাকে তিনি মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে। ভূদেবের এই সমন্বয়ী সাধনার প্রকাশ আমরা দেখেছি তাঁর ভিন্নমুখী প্রবন্ধগ্রন্থে। অনেক স্কুলপাঠ্য বইও লিখেছিলেন তিনি। দুই খণ্ডে বিস্তৃত *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৯৫ এবং ১৯০৫) বাঙালি পাঠকের কাছে নানা দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছিল। সাহিত্য-আলোচনা এবং সামাজিক নিবন্ধে ভূদেব যুগপৎ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে রক্ষণশীল বলে মনে করলেও, তা যে সঠিক বিচার নয়, তা আমরা এখন অনুভব করি।

ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসুরি। অবশ্য, সঠিক অর্থে তিনি উপন্যাস লিখে উঠতে পারেননি। উপন্যাসের সামান্য বীজ বপন করেছিলেন। কন্টারের লেখা *রোমান্স অফ হিস্ট্রি—ইন্ডিয়া* গ্রন্থের কাহিনি-অবলম্বনে তাঁর *ঐতিহাসিক উপন্যাস* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অন্তর্গত কাহিনিদুটি হল *সফল স্বপ্ন* ও *অঙ্গুরীয়*

বিনিময়। *অঙ্গুরীয় বিনিময়*-এর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসের সামান্য সাদৃশ্য রয়েছে। ভূদেব *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৮৭৫) গ্রন্থে কল্পনার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। এই রোমান্স-ধর্মী আখ্যানে কিংবা *পুষ্পাঞ্জলি* (১৮৬৩) গল্প-সংকলনে হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। ভূদেবের এই উদ্দেশ্যপ্রবণতার কারণে এইসব রচনা বিশেষ সাহিত্য-গুণান্বিত হতে পারেনি।

সনাতনপন্থী ভূদেব তাঁর কাহিনির প্রেক্ষিত হিসাবে শিখ, রাজপুত ও মরাঠা জাতির শৌর্য ও উত্থানকেই অবলম্বন করেছিলেন। এর বিপরীতে তিনি স্থাপন করেছিলেন মুসলমান-শাসকগোষ্ঠীকে। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ককে তিনি দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির টানাপোড়েন হিসাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের, সংঘাত বা মিলনের দ্বন্দ্বকে তিনি আশ্রয় করেননি। মুসলমান-শাসকগোষ্ঠী এবং প্রতিরোধী হিন্দু-শক্তিকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। এবং, সে-ক্ষেত্রে, তাঁর প্রতিবাদ, স্বভাবতই, শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই পুঞ্জীভূত হয়েছিল। এই মানসিকতাকে আমরা স্বাজাত্যবোধ হিসাবেই দেখি, এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার তেমন সম্পর্ক নেই। আসলে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সূচনালগ্নে ভূদেব এই আখ্যানগুলি লিখেছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয়নি।

ভূদেবের পরে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩) বা কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোম প্যাঁচার (১৮৪০-১৮৭০) রচনায় কাহিনির বীজ অঙ্কুরিত হলেও তাঁরা সাধারণ নকশা-জাতীয় রচনার বাইরে বড়-কিছু লিখতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন মহাভারত-অনুবাদে যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রথম যথার্থ বাংলা উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসশিল্প, অন্যান্য নানা বিষয়ের মতো, পাশ্চাত্য-প্রভাবিত। অবশ্য, কাহিনির আকর্ষণ মানুষ সম্ভবত আদিযুগ থেকেই বোধ করেছে। প্রাচীন গুহাশিল্পে আমরা কাহিনির ছায়া লক্ষ করেছি। মানুষ যেন সে-সময় থেকেই নিজের কীর্তি, জীবনযাপন লিখে রাখতে চেয়েছে। হয়তো, সেই বীজ থেকেই আজকের উপন্যাস ক্রমে-ক্রমে মহীরুহ হয়ে উঠেছে।

বস্তুত, উপন্যাসের বিকাশ ঘটেছে গত দুশো-আড়াইশো বছর ধরে। উপন্যাসের প্রকৃত বীজ নিহিত রয়েছে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষে। পূর্ববর্তী রোমান্সের অনৈসর্গিক, অলীক, অতিকথন ও অবাস্তবতার চিহ্নগুলি মুছে ফেলে উপন্যাস ব্যক্তি ও সমাজের এক অমোঘ অভিজ্ঞান-রূপে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হল।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে উপন্যাসের ধারাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বোঝা যাচ্ছিল, বাস্তব মানুষের কাহিনি, চরিত্র ও চরিত্রগত দ্বিধাদ্বন্দ্বই উপন্যাসের সহজাত লক্ষণ। তবে আধুনিক উপন্যাসের অনেক আগে মধ্যযুগীয় রেনেসাঁ-সময়ে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যে বোকাচিও-র লেখা সুবৃহৎ রচনা *ডেকামেরন* (১৩৪৮-১৩৫৩) নামে

বাস্তবধর্মী আখ্যান পেয়েছি। প্রাচীনতম গ্রিক ও লাতিন-ভাষায় তারও আগে রচিত হয়েছিল *দি অ্যাস, স্যাটিরিকন, মেটামরফস* ইত্যাদি গদ্যকাহিনি। কিন্তু, ইতালীয় লেখক বোকাচিও-র *ডেকামেরন* থেকেই প্রকৃত অর্থে বাস্তবতা-সমৃদ্ধ গদ্যকাহিনির সূত্রপাত হল। বোকাচিও নিজে এই গ্রন্থের গল্পগুলিকে *নভেলা স্টোরি* (নতুন গল্প) বলে অভিহিত করেছিলেন। এই 'নভেলা' শব্দটিই পরে 'নভেল' (উপন্যাস) শব্দে, অর্থে আভাসিত হয়েছে। অবশ্য, জার্মান-ভাষায় সাধারণভাবে সমস্ত উপন্যাসকেই 'রোমান্স' বলা হয়। পুরনো বৈশিষ্ট্যের চিহ্নটি ওই শব্দের স্মৃতিতে রেখে দিতে চেয়েছেন জার্মান-লেখকরা।

সপ্তদশ শতকে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার কথাসাহিত্যের প্রসার ত্বরান্বিত করে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে সারা ইউরোপেই নানা ভাষায় গদ্যকাহিনি রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত উপন্যাসের জন্য আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়েছে। সমাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে উপন্যাসশিল্পের প্রত্যক্ষে যোগ ছিলই। মানুষও ক্রমশ গল্প পড়তে আগ্রহী হয়ে উঠছিল। *রবিনসন ক্রুশো, ডন কুইকসো, গালিভার'স ট্রাভেল, ক্যানডিড* ইত্যাদি আখ্যান মানুষকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। এইসব অতিরঞ্জিত কাহিনির প্রভাব ছাড়িয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য ক্রমশই বাস্তবমুখী হচ্ছিল। ইংরেজি সাহিত্যে রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ ; জার্মানির উইলেন্ড, গ্যেটে ; ফ্রান্সের মাদাম ফেয়েত্তে, মারিভোস, প্রেভোস প্রমুখ লেখকরা উপন্যাসের সূচনাটি পরিস্ফুট করেন। এ-সময় থেকে উপন্যাসে সমাজ, পরিবার, ব্যক্তির প্রতিফলন ঘটেছে। কালের গতিতে, সমাজ ও ব্যক্তির নানা বিস্ফারের সঙ্গে উপন্যাসেও ঘটেছে তার প্রতিফলন। মানুষের, সম্পর্কের জটিলতা ও দ্বন্দ্ব যত তীব্র হয়েছে, উপন্যাসও তেমনই তীব্রতর হয়েছে।

বাংলা উপন্যাস ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাবেই রচিত হয়েছিল। যদিও, আমরা জানি, প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে গদ্য-রোমান্স লেখার প্রচলনের কথা। *কথাসরিৎসাগর, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি* ইত্যাদি রচনায় কাহিনি-আস্বাদ কম নয়। এমনকী, পালি-ভাষায় রচিত জাতক-কাহিনিগুলিও যথেষ্ট বাস্তবতা-আশ্রয়ী। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বাস্তবতার স্ফুরণ আমরা কম দেখিনি। কিন্তু, প্রাচীন বা মধ্যযুগের উল্লিখিত ধারাটিকে আমরা সঠিক অর্থে 'উপন্যাস' বলে চিহ্নিত করতে পারি না। পারার কথাও নয়। কেননা, উপন্যাসের ধারণাটিই গড়ে উঠেছে অনেক পরে। এমনকী, আমরা আগেই বলেছি, প্যারীচাঁদ মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহ-ও যা লিখেছেন, তা-ও উপন্যাস নয়। কেবল কাহিনি বা চরিত্রগত ধারাবাহিকতাই উপন্যাস নয়। উপন্যাস একটি সুবিস্তৃত জীবনবোধের প্রকাশ—চরিত্র ও আখ্যানের সুশৃঙ্খলিত বিকাশ ও বিন্যাসই উপন্যাস। বাংলাভাষায় প্রথম সে-কাজটি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ সালে, মাত্রই ২৪ বৎসর বয়সে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটি লেখা শুরু করেন।

পরের বছরে রচনা শেষ হলেও তিনি সহজাত দ্বিধার কারণে কয়েক বছর তা ছাপতে দেননি। ইতিমধ্যে দুই সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র-সহ কয়েকজন বিদগ্ধজনকে তিনি নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে উপন্যাসটি পড়ে শোনান। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যর মতো পণ্ডিত ও সাহিত্য-সমালোচকরা। তাঁরা সকলেই দু-দিন ব্যাপী সেই পাঠ-শ্রবণে অতিশয় মুগ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন তিনি বাংলাভাষায় একটি অভূতপূর্ব রচনা প্রণয়ন করেছেন। এর আগে তিনি আর-কখনও নিজের অমুদ্রিত রচনা অন্যকে পড়ে শোনানোর তাগিদ বোধ করেননি। দুর্গেশনন্দিনী, যেহেতু, কেবল নিজের সাহিত্য-ধারায়ই নয়, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নতুন-মাত্রিক রচনা, সেহেতু তিনি যেন কিছুটা আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করেছিলেন। কিন্তু বিদগ্ধ শ্রোতাদের প্রশংসা তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল।

উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পরে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

১৮৬৫ সালে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় দুর্গেশনন্দিনী-র এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয। সমালোচক লেখেন :

> *বাঙ্গালা ভাষায় নূতন উপাখ্যান এ পর্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই, দুর্গেশনন্দিনী-গ্রন্থকার বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদিও স্বপ্রণিত পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে ইংরাজীভাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তথাপি যখন ইহা অনুবাদিত পুস্তক নহে, তখন ইহা অবশ্যই নূতন।*
>
> *পাঠকগণ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমরা ইংরাজী উপাখ্যান সমুদয়ের সহিত দুর্গেশনন্দিনীর উৎকর্ষের তুলনা করিতেছি। ইংরাজীতে যেরূপ উত্তম উত্তম উপাখ্যান আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ নাই, এই নিমিত্ত আমরা এই উৎকৃষ্ট ও প্রথম বাঙ্গালা উপাখ্যানকে গৌরবস্থানীয় করিলাম। বাস্তবিক বঙ্কিমবাবু এই পুস্তকে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালার প্রথম উপাখ্যানাকার (First Novelist) উপাধির অধিকারী হইয়াছেন।*

অন্যদিকে, রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থে দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাদোষ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। তিনি বঙ্কিমের ব্যাকরণহীন সন্ধি-সমাসযুক্ত পদ, বাক্যের অন্বয়হীনতা ও গুরু-চণ্ডাল ত্রুটির কথা তুলেছিলেন। এবং তাঁর সেই সমালোচনা ছিল যথেষ্টই যুক্তিযুক্ত। ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা পাণ্ডুলিপি পাঠ করে আগেই কেন এইসব ভুল-নির্দেশ করেননি, তা ভাবলে অবাকই লাগে। এ-ছাড়া, তাঁর বিরুদ্ধে স্কটের *আইভানহো* উপন্যাস অনুকরণ করার যথাবিহিত অভিযোগও উঠেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে মুসলমান-বুদ্ধিজীবীমহলে নানা টানাপোড়েন দেখা গিয়েছে।

অনেকেই মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে মুসলমান-বিদ্বেষকে তীব্রতর করে তুলেছিলেন। অবশ্য, এ-ক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি সামান্য সূত্র আমাদের মনে রাখা দরকার, বঙ্কিমচন্দ্র যদি মানসিক বা বুদ্ধিগতভাবে মুসলমান-বিদ্বেষী হতেন, তাহলে তাঁর সেই বিদ্বেষের কথা প্রকাশিত হওয়ার আদর্শ মাধ্যম হত তাঁর প্রবন্ধাবলি। কিন্তু নানা প্রবন্ধে তিনি 'জাতি' বলতে কেবল হিন্দুশ্রেণিকে বোঝেননি, তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সত্তাকেই 'জাতি' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। যদিও তিনি তাঁর সৃষ্ট মুসলমান-চরিত্রগুলিকে তাঁর পূর্ববর্তী ভাবনার সাযুজ্যে সে-ভাবে কোনও মহত্তর উত্তরণে পৌঁছে দিতে পারেননি, এ-তথ্যও আমাদের মনে রাখতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :

> *বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমন গর্ব্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দু-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।*
>
> —*বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮০*

প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী লেখার পর বঙ্কিমচন্দ্রকে কেউ মুসলমান-বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করেননি। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যে-ভাবে বিমলা-ওসমান-জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষার কাহিনি বর্ণনা করেছেন, তাতে বিদ্বেষের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। বরং বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্রটির মাধ্যমে তিনি যে-ভাবে হিন্দুধর্মের ভণ্ডামি বর্ণনা করেছেন, তাতে তাঁর মানসিক প্রসারতাই লক্ষ কবা যায়। বিপরীতে আয়েষা চরিত্রটিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে-অপার সৌন্দর্য ও মহিমা আবোপ করেছেন, তাতে তাঁর মুসলমান-বিদ্বেষ মোটেই প্রকটিত হয় না। তাঁকে জগৎসিংহের প্রণয়াভিলাষী রূপে চিত্রিত করে তিনি দুই সম্প্রদায়ের নৈকট্য-সম্ভাবনার আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন। রাজপুত- মোগলের ঐতিহাসিক রণ-রক্তের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দুই-ধর্মী নারী-পুরুষ আয়েষা ও জগৎসিংহের মধ্যে যে-প্রেমধর্মের, হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ দেখিয়েছিলেন, আয়েষাকে যে-ভাবে মহিমান্বিত করেছিলেন, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের মানবিক ধর্মের গভীরতা সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

আমরা আয়েষা চরিত্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাতের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ধৃত করতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দি জগৎসিংহ-সকাশে আয়েষার উপস্থিতি ও সেখানে ওসমানের আকস্মিক আবির্ভাব-অংশটি লিখেছেন এ-ভাবে :

> *ওসমান পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে কহিলেন, "নিশীথে একাকিনী বন্দীসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে অনিয়ম কারাগারে প্রবেশও উত্তম।*

আয়েষার পবিত্র চিত্তে এ তিরস্কার সহনাতীত হইল। ওসমানের মুখপানে চাহিয়া উত্তর করিলেন। সেরূপ গর্ব্বিত স্বর ওসমান কখন আয়েষার কণ্ঠে শুনেন নাই।

আয়েষা কহিলেন, "এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা, আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"

ওসমান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন ; কহিলেন, "প্রযোজন আছে কি না, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।"

আয়েষা পূর্ব্ববৎ কহিলেন, "যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।"

ওসমানও পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "আর যদি আমি জিজ্ঞাসা করি?"

আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন ; তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বর্দ্ধিতায়ন হইল। মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ একদিকে হেলিল ; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবাল-জালবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল ; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন, "ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"

পরে আয়েষা চিঠিতে লিখেছে জগৎসিংহকে :

আর একবার মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব মানস আছে। যদি তুমি এ প্রদেশে বিবাহ কর, তবে আমায় সংবাদ দিও ; আমি তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া তোমার বিবাহ দিব। যিনি তোমার মহীষী হইবেন, তাঁহার জন্য কিছু সামান্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম, যদি সময় পাই, স্বহস্তে পরাইয়া দিব।

আয়েষা চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে আদ্যোপান্ত যে-মহিমা আরোপ করেছেন, সেখানে তার বিশেষ ধর্মচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সে হয়ে উঠেছে চিরকালের নারী, প্রণয়িনী।

কোনও-কোনও সমালোচক অবশ্য এই উপন্যাসের মুসলমান-চরিত্র কতলু খাঁ বা ওসমানকে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট বিরূপতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন। বিরুদ্ধ-চরিত্র হিসাবে এরা কখনওই লেখকের সমবেদনা পায়নি। জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার প্রণয় ওসমান একেবারেই সমর্থন করেনি। না-করারই কথা। একে রাজনৈতিক শত্রু, তায় বিধর্মী জগৎসিংহকে আয়েষার প্রণয়াস্পদ-রূপে গ্রহণ করা তার পক্ষে যুক্তিযুক্তভাবেই অসম্ভব। বিশেষত, সে নিজেই যখন আয়েষার প্রণয়াভিলাষী। অন্যদিকে, কতলু খাঁ চরিত্রটিকে বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভাবে নারীলোলুপ করে এঁকেছেন এবং যে-ভাবে তাকে বিমলার ছুরিকাঘাতে নিহত হতে হয়েছে, তা ইতিহাস-সমর্থিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন সমালোচক সারোয়ার জাহান (*বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র*)।

কিন্তু, এ-ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান-নারী আয়েষাকে মহিমান্বিত করার ক্ষেত্রে যদি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-বোধে আক্রান্ত না-হন, তাহলে ওসমান বা কতলু খাঁ-র ক্ষেত্রেই বা তেমন মানসিকতা-প্রভাবিত হবেন কেন? মানব-চরিত্রের জট-জটিলতা, সাদা-কালোর স্তরভেদ দেখানোই ঔপন্যাসিকের একমাত্র অভীষ্ট। সে-ক্ষেত্রে, এ-রূপ সমালোচনাই একদেশদর্শিতার সমার্থক বলে বিবেচিত হয়। বিশেষত, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসেই যেখানে দিগ্‌গজ নামে হিন্দু-চরিত্রটির মধ্যেও নারী-লোলুপতা আরোপ করেছেন, সেখানে এই অভিযোগ একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-আধিপত্যের পুনর্জাগরণ ঘটাবার অভিপ্রায়ে হিন্দু-মুসলমান রাজশক্তির দ্বন্দ্বের বিষয়টি বারবার উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে মানবিক বিকাশের নানা বর্ণচ্ছটা দেখালেও, তাঁর মূল লক্ষ্য হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত-তথা-হিন্দুর শৌর্য-বর্ণনা। এ-ক্ষেত্রে তিনি প্রায়শই সংযম হারিয়েছেন বলে বহু মুসলমান বুদ্ধিজীবী অভিযোগ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে হিন্দু-বুদ্ধিজীবীরা সততই বঙ্কিমচন্দ্রকে সমর্থন করেছেন। মনে হয়, সমালোচকরাও এড়াতে পারেননি ভাব ও ভাবনার সাম্প্রদায়িকতা।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি অভিযোগ প্রায়শই ওঠে যে, তিনি এতটাই মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন যে কেবল হিন্দু-মুসলমান রাজশক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর মুসলমান-বিদ্বেষ এতটাই তীব্র ছিল যে মুসলমান-সমার্থক শব্দ-ব্যবহারেরও সেই উগ্রতা ছড়িয়ে দিয়েছেন যথেচ্ছভাবে। স্থানে-অস্থানে তিনি মুসলমান-বিরোধী কটূক্তি করতে 'যবন', 'নেড়ে', 'ম্লেচ্ছ', 'হিন্দুবিদ্বেষী' ইত্যাদি নানা অশালীন বিশেষণ ব্যবহার করেছেন।

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের *নবম পরিচ্ছেদ : দিগ্‌গজ সংবাদ* অংশ থেকে আমরা প্রসঙ্গত নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করতে পারি :

> *জগৎ সিংহ দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যেরূপ ভীত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ উঁহার নিকট কোন কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। অতএব বিষয়ান্তরে কথা কহিবার জন্য কহিলেন, "আপনার হাতে ও কি পুতি!"*
>
> *"আজ্ঞা, এ মাণিকপীরের পুতি!"*
>
> *"ব্রাহ্মণের হাতে মাণিকপীরের পুতি!"*
>
> *"আজ্ঞা, — আজ্ঞা, আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, এখন ত আর ব্রাহ্মণ নই।"*
>
> *রাজকুমার বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বিরক্তও হইলেন। কহিলেন, "সে কি? আপনি গড় মান্দারণে থাকিতেন না?"*
>
> *দিগ্‌গজ ভাবিলেন, "এই সর্ব্বনাশ করিল! আমি বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে থাকিতাম, টের পেয়েছে! বীরেন্দ্রসিংহের যে দশা করিয়াছে, আমারও তা করিবে।" ব্রাহ্মণ ত্রাসে কাঁদিয়া ফেলিল। রাজকুমার কহিলেন, "ও কি ও!"*
>
> *দিগ্‌গজ হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলেন, "দোহাই খাঁ বাবা! আমায় মের*

না বাবা! আমি তোমার গোলাম বাবা! তোমার গোলাম বাবা!"

"তুমি কি বাতুল হইয়াছ?"

"না বাবা। আমি তোমারই দাস বাবা! আমি তোমারই বাবা!"

জগৎসিংহ অগত্যা ব্রাহ্মণকে সুস্থির করিবার জন্য কহিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি একটু মাণিকপীরের পুতি পড়, আমি শুনি।"

ব্রাহ্মণ মাণিকপীরের পুতি লইয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিল। যেরূপ যাত্রার বালক অধিকারের কানমলা খাইয়া গীত গায়, দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সেই দশা হইল।

ক্ষণেক পরে রাজকুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া মাণিকপীরের পুতি পড়িতেছিলেন কেন?"

ব্রাহ্মণ সুর থামাইয়া কহিল, "আমি মোছলমান হইয়াছি।" রাজপুত্র কহিলেন, "সে কি?" গজপতি কহিলেন, "যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমাকে কহিলেন যে, আয় বামন্ তোর জাতি মারি ' এই বলিয়া তাঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া মুরগির পালো রাঁধিয়া খাওয়াইলেন।"

"পালো কি?"

"দিগ্‌গজ কহিলেন, "আতপ চাউল ঘৃতের পাক।"

রাজপুত্র বুঝিলেন পদার্থটা কি। কহিলেন, "বলিয়া যাও!"

"তারপর আমাকে বলিলেন, "তুই মোছলমান হইয়াছিস ;" সেই অবধি আমি মোছলমান।"

রাজপুত্র এই অবসরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সকলের কি হইয়াছে?"

"আর আর ব্রাহ্মণে অনেকেই ঐরূপ মোছলমান হইয়াছে।"

রাজপুত্র ওসমানের মুখপানে দৃষ্টি করিলেন। ওসমান রাজপুত্রকৃত নির্ব্বাক তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, ইহাতে দোষ কি? মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম ; বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম্মপ্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে।"

এখানে আমাদের লক্ষ করা দরকার, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে একইসঙ্গে ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করছেন। *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসে সমালোচকরা ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। ঠিকই, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে ইতিহাসের চেয়ে রোমান্সকেই বেশি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু, আমাদের বোধহয় যুগপৎ এই ঐতিহাসিক তথ্যও মনে রাখা দরকার যে, মুসলমান-শাসনকালে ধর্মান্তরকরণ ছিল খুবই প্রচলিত ঘটনা। ফলে, অন্তত এই ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সমাজবাস্তবতা বিকৃত করেছেন, এমন বলা যায় না।

অন্যদিকে, লেখক যে এই অংশে বিদ্যাদিগ্‌গজের মুখে বিদ্রূপাত্মক 'মোছলমান' শব্দটি বসিয়েছেন, তাতে লেখকের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বিদ্রূপ-অবহেলা চিহ্নিত হয় না। কেননা,

শব্দটি, অন্য অনেক ক্ষেত্রেও যেমন, বিশেষ একটি চরিত্রের মুখ-নিঃসৃত। ব্রাহ্মণ দিগ্‌গজ যেখানে ধর্মান্তরকরণের কথা বলছে, সেখানে তাঁর মুখে অনুরূপ ঘৃণা-সূচক শব্দ ব্যবহার মোটেই অস্বাভাবিক নয়। চরিত্রের বাস্তবতা পরিস্ফুট করার জন্য লেখককে চরিত্রানুগ সংলাপ যেমন ব্যবহার করতে হয়, তেমনই সংলাপে ব্যবহার করতে হয় চরিত্রের মানসিকতা-পরিচায়ক শব্দ। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কেবল তা-ই করেছেন। ফলে, এ-জাতীয় শব্দগুলিকে লেখকের নিজস্ব মানসিকতার পরিচায়ক বলে ভাবায় সঠিক সাহিত্য-বিচার হয় না। অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখে এ-ধরনের অসংস্কৃত শব্দ-ব্যবহার মোটেই স্বাভাবিক নয়। আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। কেননা, চরিত্রটিকে বঙ্কিম যে-ভাবে বিকশিত করেছেন, তাতে তার মধ্যে তথাকথিত বিদ্যার উপাদান থাকলেও, তাকে যথার্থ প্রাজ্ঞ ও রুচিবান বলা যায় না। নারীসঙ্গলাভের জন্য তাকে আমরা অধর্মের আচরণ করতে দেখেছি। সর্বোপরি, এ-জাতীয় তথাকথিত ধার্মিকরাই যে অন্যধর্মের প্রতি, অন্যধর্মী মানুষের প্রতি বীতরাগ পোষণ করে, তা আমাদের অজানা নয়। বরং, এ-ক্ষেত্রে সবিশেষ লক্ষ করার যে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বাস্তবতা ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতি এতটাই দায়বদ্ধ ছিলেন যে, এই চরিত্রটির প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র ধর্মীয় পক্ষপাত দেখাননি। বলা যায়, এই চরিত্রটি বঙ্কিমের অ-সাম্প্রদায়িকতার একটি মহৎ প্রমাণ। অন্যদিকে, রাজকুমারের মানিকপিরের পুথি শোনার আগ্রহে দুই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

যদিও, বঙ্কিমচন্দ্র 'যবন' ইত্যাদি শব্দগুলি এত-বেশি ব্যবহার করেছেন যে তা কখনও অসতর্কতায় উপন্যাসের বর্ণনা-অংশেও ব্যবহৃত হয়েছে। আয়েষার প্রণয়াভিলাষী ওসমান যখন আয়েষার স্বপ্নের পুরুষ জগৎসিংহকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করলেন, তখন ওসমানের উদ্দেশে বঙ্কিমচন্দ্র 'যবন' শব্দটি বর্ণনা-অংশে ব্যবহার করে, তাঁর পক্ষপাত প্রকট করে দিয়েছেন। যেমন .

> *রাজপুত্র কহিলেন, "আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।"*
>
> *ওসমান অসি ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, আয়েষা তোমার অভিলাষী। যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই।"*
>
> *. রাজপুত্র অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না। তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছ ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"*
>
> *ওসমান সক্রোধে রাজপুত্রকে পদাঘাত করিলেন, কহিলেন, "যে সিপাহি যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহাকে এইরূপে যুদ্ধ করাই।"*
>
> *রাজকুমারের আর ধৈর্য্য রহিল না। শীঘ্রহস্তে ত্যক্ত প্রহরণ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগালদংশিত সিংহবৎ প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র যবনকে আক্রমণ করিলেন। সে দুর্দ্দম প্রহার যবন সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুত্রের বিশাল শরীরাঘাতে ওসমান ভূমিশায়ী হইলেন।*

...তখন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে নির্বিঘ্নে গৃহে যাও, তুমি যবন হইয়া রাজপুত্রের শরীরে পদাঘাত করিয়াছিলে, এই জন্য তোমার এ দশা করিলাম, নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নহে যে, উপকারীর অঙ্গ স্পর্শ করে।"

এ-কথা ঠিকই যে, এক রমণীকে কেন্দ্র করে দুই বীরপুরুষের যুদ্ধের সময় বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা জগৎসিংহের সমর্থক হয়ে পড়েছিলেন। ফলে, তিনি অসতর্কতায় 'যবন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু, এ-ও লক্ষণীয় যে, তিনি ওসমানের সর্বনাম হিসাবে সততই সম্মানার্থক 'তাঁহার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে জগৎসিংহের মুখে যখন 'যবন' শব্দটি বসিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তখন চরিত্রটির ঘৃণা, ক্ষোভ, রাগ ব্যক্ত করেছেন ওই একটি শব্দেরই আধারে। এ-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী হয়েছেন বলে আমাদের মনে হয় না। বিশেষত, আমাদের মনে রাখতে হবে, আজ থেকে ১৩৯-বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসটি প্রণয়ন করেছিলেন। তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গিকে এ-কালের বিচার-ব্যবস্থায় সোপর্দ করা সঠিক হবে না। সে-সময় সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রও সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'যবন' ইত্যাকার শব্দগুলিতে এতখানি প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া আমাদের কাছে যথেষ্টই বাড়াবাড়ি মনে হয়। শব্দগুলি তৎকালীন সমাজে নিছক লব্‌জ হিসাবেই প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয়। সর্বোপরি, এক-আধটি বিদ্রূপাত্মক শব্দ প্রয়োগ করলেই ইসলামের অবমাননা হয়, ইসলাম অত ভঙ্গুর নয়। আরও বলার যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কোথাও ইসলামের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য দৃষ্ট হয়নি। তিনি মুসলমান-আধিপত্যকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিরোধিতা করেছেন, এ-কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ঠিক বলেন না। ভুলই বলেন। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশি মুসলমান-শাসকদের দেখেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে। তিনি তো ঘোষিতভাবেই আদর্শবাদী সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সে-ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কখনও হয়তো তীব্র হতে পারে, আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁকে হয়তো 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে আত্মতৃপ্তি পেতে পারেন তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষরা। কিন্তু, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্রংলিহ প্রতিভার বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসটিকে যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা বলে চিহ্নিত করেন, তাঁরা যে সাহিত্য-বিচারের তুলনায় নিছক বিতর্ক-অভিপ্রায়ী, তা বোঝা যায় উপন্যাসটির নিবিষ্ট ও সংবেদী পাঠ নিলে। সেই পাঠ আমাদের বোঝায়, রণ-রক্তের মাঝে, দুই তথাকথিত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের মাঝে উপন্যাসটি আসলে এক গভীরতর প্রেমোপাখ্যান। মুসলমান-যুবতী আয়েষা যে-ভাবে রাজপুতবীর জগৎসিংহকে ভালবেসেছে, কোনও প্রতিদান পাবে না জেনেও, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের গভীরতা টের পাওয়া যায়। আর 'মুসলমান-বিদ্বেষী' বঙ্কিম উপন্যাসের পরিণতিতে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহ-বাসরে আয়েষাকে যে-ভাবে চিত্রিত করেছেন, যে-ট্রাজিক মহিমা

আরোপ করেছেন তাঁর মধ্যে, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আর যা-ই বলা যাক, সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> *অলঙ্কারসন্নিবেশ সমাধা হইলে, আয়েষা তিলোত্তমার দুইটি হস্ত ধরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয়, প্রাণেশ্বর কখন মনঃপীড়া পাইবেন না। যদি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা না হইল, তবে তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা যে, যেন ইহার দ্বারা তাঁহার চিরসুখ সম্পাদন করেন।"*
>
> *তিলোত্তমাকে কহিলেন, "তিলোত্তমা! আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কালহরণ করিব না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ুঃ করিবেন। আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সার রত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।"*
>
> *"তোমার সার রত্ন" বলিতে আয়েষার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিলোত্তমা দেখিলেন, আয়েষার নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে।*

বাংলাভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাসটি এইভাবেই সমস্ত সংকীর্ণ সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের উর্ধ্বে হয়ে ওঠে দুই ভিন্নধর্মী মানব-মানবীর এক চিরকালীন হৃদয়বৃত্তির উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস *মৃণালিনী* প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। বাংলায় মুসলমান অভিযানের পটভূমিকায় এই প্রেমোপাখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্র যে অনেকাংশেই কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা কেবল সমকালীন সমালোচকরাই নন, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও স্বীকার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমাবধিই একটি পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক উপন্যাস-রচনা করেছেন। *মৃণালিনী* রচনার সময়ও তিনি অনুরূপ আদর্শে চালিত হয়েছেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম রচনাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। *মৃণালিনী* উপন্যাসটি পূর্ববর্তী *দুর্গেশনন্দিনী* বা *কপালকুণ্ডলার* (১৮৬৬) তুলনায় যথেষ্টই ন্যূনমানের। এই উপন্যাসের কাহিনি-নির্মাণ, বা চরিত্র-বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বকৃতির তুলনায় যথেষ্টই ব্যর্থ। পূর্ব-নির্দিষ্ট ভাব ও ভাবনায় চালিত হয়ে উপন্যাসের মতো গতিশীল শিল্পমাধ্যমের চর্চায় তিনি এই উপন্যাসকে যে স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন, তা আমাদের পাঠক-হিসাবে পীড়িত করে।

উপন্যাসটি শুরুই হয় এক অতিরঞ্জিত ঘটনা-বর্ণনায়। এই উপন্যাসও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতা-বোধের এক সুতীব্র অভিজ্ঞান। তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ এই উপন্যাসেরও অব্যর্থ অভীষ্ট। মুসলমান-শাসককুলের বিরুদ্ধে দেশীয় হিন্দু-বীরদের সংগ্রামের কথা এখানেও বিবৃত করেছেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও প্রেম-সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়েছেন। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রেমের কাহিনি এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলেও মনোরমা-পশুপতির আখ্যান এই উপন্যাসে তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল।

মৃণালিনী উপন্যাসের শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের সম্ভাব্য সুরটি বেঁধে দেন। *প্রথম পরিচ্ছেদ : আচার্য* অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

> *কুটীরমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন ; ব্রাহ্মণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ ; শরীর শুষ্ক ; আয়ত মুখমণ্ডলে শ্বেতশ্মশ্রু বিরাজিত ; ললাট ও বিরলকেশ তালুদেশে অল্পমাত্র বিভূতিশোভা। ব্রাহ্মণের কান্তি গম্ভীর এবং কটাক্ষ কঠিন ; দেখিলে তাঁহাকে নির্দ্দয় ও অভক্তিভাজন বলিয়া বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শঙ্কা হইত। আগন্তুককে দেখিবামাত্র তাঁহার সে পরুষভাব যেন দূর হইল, মুখের গাম্ভীর্য্য মধ্যে প্রসাদের সঞ্চার হইল। আগন্তুক, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিযা কহিলেন, "বৎস, হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"*
>
> *হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্যসিদ্ধি হয় নাই। পরন্তু যবন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছিল ; এই জন্য কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তদ্ধেতু বিলম্ব হইয়াছে।"*
>
> *ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দিল্লীর সংবাদ আমি সকল শুনিয়াছি। বখ্‌তিযার খিলজিকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবতার শত্রু পশু-হস্তে নিপাত হইত। তুমি কেন তার প্রাণ বাঁচাইতে গেলে!"*
>
> *হেমচন্দ্র। তাহাকে স্বহস্তে যুদ্ধে মারিব বলিয়া। সে আমার পিতৃশত্রু, আমাব পিতার রাজাচোর। আমারই সে বধ্য।*

এহেন সূচনায় আমরা খুব অনায়াসে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঈপ্সিত পরিকল্পনাটি বুঝে নিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও ঘৃণাবাচক 'যবন' শব্দটি প্রযোগ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বখ্‌তিয়ার খিলজির মতো দোর্দণ্ড শাসককে নিধনের জন্য লেখক এখানে তাঁর সেই পূর্ব-নির্দিষ্ট আদর্শায়িত কল্পনার সুতো ছেড়েছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র বখ্‌তিযার খিলজির বিপরীতে তিনি স্থাপন করেছেন হেমচন্দ্র নামে এক অনামী অনৈতিহাসিক চরিত্রকে। সর্বোপরি, তার পরাক্রম এবং আত্মবিশ্বাস বোঝাতে তাকে দিয়ে হস্তি-হত্যার অবিশ্বাস্য কাহিনি বুনেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এর ফলে তাঁর আদর্শরক্ষা যা-ই হোক, সাহিত্যরক্ষা যে হয়নি, তা বলার।

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ এবং হিন্দু-জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দুর বাহুবলই ছিল তাঁর অন্যতম প্রতিপাদ্য। বারবার তিনি সেই চেষ্টা করেছেন। উপরোক্ত কাহিনি-বয়নও সেই উদ্দেশ্যেই। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই পরে, ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে উপন্যাস থেকে বিষয়টি পরিহার করেছিলেন।

১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুমেলার প্রবর্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও এ-সময় থেকে স্বাদেশিক ভাবনায় ভাবিত হতে থাকেন। *মৃণালিনী* উপন্যাসেই তাঁর স্বদেশ-ভাবনা সবিশেষ রূপ-পরিগ্রহ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনওই, আরও অনেকের মতো, ষোড়শ মুসলমান-অশ্বারোহী-সহ বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের কাহিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। কেননা, তিনি বাঙালির শক্তিমত্তায় আস্থাশীল ছিলেন। এবং যুগপৎ সেই অবিশ্বাস ও বিশ্বাসের কেন্দ্র থেকেই তিনি *মৃণালিনী* লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্টুয়ার্টের *দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল* গ্রন্থ থেকে মিনহাজউদ্দিনের লেখা *তাবকৎ-ই-নাসিরি* পারসিক গ্রন্থের মাধ্যমে তুর্কি-বিজয়ের বৃত্তান্তটি জানতে পারেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র *মৃণালিনী* লেখার আগে সরাসরি মিনহাজউদ্দিনের বইটি পড়েননি। কেননা, সে-বইটি ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৮৮১ সালে।

মৃণালিনী-র চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> *ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।*
>
> *ষষ্ঠী বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক!*

আধুনিক ঐতিহাসিকরা সকলেই মিনহাজের বঙ্গবিজয়ের কাহিনির সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সে-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। এমনকী, ওই কিংবদন্তি তাঁর কাছে এতটাই বিদ্বেষপরায়ণ মনে হয়েছিল যে তিনি নিজের বিদ্বেষ গোপন না-রেখে 'মর্কটাকার', 'শত্রুহস্তে' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি *বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধে তাঁর এই সংশয় সুতীব্রভাবেই পরিস্ফুট :

> *বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী (?) লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা দক্ষিণবাঙ্গালা কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।*

মৃণালিনী উপন্যাস-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ইতিহাস-ভাবনার দ্বারা চালিত

হয়েছিলেন। নবনারীর জীবনের গভীরতর প্রসঙ্গ উপন্যাসে বিধৃত হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে মুখ্যত বাঙালির স্বাদেশিকতা, বিদেশি শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াইকেই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু করেছেন।

আর, সে-ক্ষেত্রে, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে পারেননি, তা স্বীকার করেও পাল্টা প্রশ্ন তোলা যায় যে, মিনহাজউদ্দিন নামে এক উগ্র সাম্প্রদায়িক ইতিহাসকারের রচনাকে পরবর্তী কোনও মুসলমান বুদ্ধিজীবী, দীর্ঘ সময়সীমায় কেন সংশয়ী দৃষ্টিতে দেখলেন না, প্রশ্ন তুললেন না ঘুণাক্ষরে? বখ্‌তিয়ার খিলজিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'মর্কটাকার' বলায় আধুনিককালের গবেষক ড. নজরুল ইসলাম তাঁর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু, তিনিও যে এখানে (*বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*) 'মুসলমান' হিসাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। তিনি বিজিত বাঙালির প্রতিনিধি হিসাবে বখ্‌তিয়ার খিলজির মতো এক পররাজ্যলোলুপ শাসককে বিচার করেননি, বোঝা যায়। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র বখ্‌তিয়ারকে বিদেশি, সাম্রাজ্যবাদী হিসাবেই দেখেছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি মুসলমান। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মানসিকতাটি অধিকাংশ বাঙালি-মুসলমান-বুদ্ধিজীবী বুঝতে সক্ষম হননি। *মৃণালিনী* উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মুখে যবন শব্দটি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। যেমন, মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে বলেছে :

> *"..তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবননিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন? একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ ; যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে মগধজয় কেন হইবে? আবার কি সেই মৃণালিনী-পাশে বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে?"*

বঙ্কিমচন্দ্র 'যবন' শব্দটি তাঁর নানা উপন্যাসে এত ব্যবহার করেছেন যে বোঝা যায় তিনি শব্দটির একটি নিজস্ব অর্থ করে নিয়েছিলেন। 'যবন' শব্দটির মাধ্যমে তিনি যে নিছক সাধারণভাবেই মুসলমান-সম্প্রদায়কে বুঝেছিলেন, তা নয়। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশি, পররাজ্যকাতর মুসলমান-শাসককেই শব্দটির মাধ্যমে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির চারিত্র্য বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলি যে সুপ্রযুক্ত হয়েছে, তা যে-কোনও সচেতন পাঠকই বুঝতে পারবেন। যাঁরা তা বোঝেন না, আসলে বুঝতে চান না, তাঁরা আর-যা-ই-হোন, সহৃদয় সাহিত্য-পাঠক নন। তাঁদের আলোচনা সম্প্রদায়গত বিভেদ শক্তি দ্বারাই চালিত হয়, এ-কথা স্পষ্ট করে বলার সময় হয়েছে।

তাছাড়া, আমাদের বোধহয় এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, একজন সাহিত্যিক, গভীরতর অর্থে, ঐতিহাসিকেরও দায় পালন করেন। ঐতিহাসিক যেখানে লিপিবদ্ধ করেন রাজন্যবর্গেরই রণ-রক্তের ইতিহাস, সাহিত্যিক সেখানে লিখে রাখেন সমকালীন জীবন,

সমাজ, মানুষ, ভাষা ও রীতি-নীতির ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে, সমাজ-ব্যবস্থার নানা ভেদাভেদের কারণে (যার উৎস ও পরিণতি আমরা আগেই আলোচনা করেছি।) যে-জাতীয় শব্দ-ব্যবহারের চল ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তা-ই ব্যবহার করেছেন। তিনি যদি শব্দগুলিকে গঙ্গাজলে ধুয়ে সুসংস্কৃত করতেন, তাতে সাহিত্যের বিশেষ উপকার হত বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য প্রথম-দুটি সংস্করণের 'যবন' ও 'বঙ্গ' শব্দদুটি পাল্টে প্রায় সবক্ষেত্রে যথাক্রমে 'তুরক' ও 'গৌড়' লিখেছেন।

তবে ভাববাদী বঙ্কিমচন্দ্র যে এত করেও অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পেরেছেন, তা নয়। তাঁর নায়ক হেমচন্দ্র উপন্যাসের অন্তিমে 'নূতন রাজ্য' স্থাপন করলেও সম্পূর্ণ হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। বখ্‌তিয়ার খিলজিকে নিজ-হাতে হত্যা করতেও সক্ষম হয়নি হেমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> *হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য্য কামরূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীভূত হইলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।*

কিন্তু, এ-ক্ষেত্রে এ-কথাও বলা প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন মিনহাজউদ্দিনের অপ্রামাণ্য ইতিহাসের সমালোচনায় *মৃণালিনী* উপন্যাস লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই তিনিও ইতিহাসের প্রতি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা পালন করতেও পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, মুসলমান-ঐতিহাসিকরা সুলতানের বদান্যতা পাওয়ার আশায় তাঁদের মহিমাকে বাস্তবের চেয়ে অনেক বড় করে দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার বিরুদ্ধে মত-প্রতিপাদনের জন্য উপন্যাসের মাধ্যমে হিন্দু-বাঙালির গরিমাকেও একইভাবে বাস্তবতারহিত অসামান্যতায় উত্তীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। দুই পক্ষের কাজটি যে একই হচ্ছে, তা ভেবে দেখেননি তিনি। এ-কথা ঠিক যে, বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষরিক ইতিহাস লেখেননি, উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু যুগপৎ এ-কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, তিনি ঘোষণা-সাপেক্ষেই বাঙালির গৌরব-ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন উপন্যাসের আধারে। কিন্তু, তাঁর সেই প্রয়াস একেবারেই সফল হয়নি। ইতিহাসের তুলনায় তাঁর ইচ্ছাপূরক কল্পনাবিলাস এতটাই তীব্র হয়েছিল যে তাঁর উপন্যাসের কাঙ্ক্ষিত অভিঘাতটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৫ সালে *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। এখানে তিনি কিছুটা ঐতিহাসিক সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। পটভূমি-রচনার ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করলেও, ইতিহাসকে একেবারে বর্জন করেননি। মিরকাশিম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বন্দ্বদীর্ণ পটভূমিতে একটি ত্রিকোণ সম্পর্কের টানাপোড়েনই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। প্রতাপ-শৈবলিনীর পারস্পরিক আকর্ষণ এবং শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের আদর্শবাদিতার আধারে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস লিখলেও,

এখানেও তাঁর পূর্ববর্তী হিন্দুত্ববাদী ভাবনার স্ফুরণ আমরা লক্ষ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচকরা সঙ্গত কারণেই এই উপন্যাসেও তাঁর উগ্র মুসলমান-বিদ্বেষ আবিষ্কার করেছেন। এই উপন্যাসে মিরকাশিম, দৌলতউন্নেসা, গুরগণ খাঁ, কুলসম, পীরবক্স, মহম্মদ তকির ইত্যাদি প্রধান-অপ্রধান নানা মুসলমান-চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন বঙ্কিম। লক্ষ করলে দেখা যাবে, তিনি তাঁদের প্রতি সতত খুব সুবিচার করেননি।

যদিও, ১২৪০ সালের কার্তিক মাসে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত *সাধারণী* সাপ্তাহিক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র *জাতিবৈর* শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেখেন :

> *মনুষ্যের স্বভাবই এমন নহে যে, বিজিত হইয়া জেতার* (জয়ীর?) *প্রতি ভক্তিমান হয় অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী, নিস্পৃহ মনে করে ; এবং জেতাও কখন বলপ্রকাশে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেন না আমরা প্রাচীন জাতি ; অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, তত দিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতিবৈর, আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল—যত দিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্বগৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতিবৈরের সমতার সম্ভাবনা নাই।*
>
> *আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যত দিন জাতিবৈর আছে, তত দিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর ভাবের কারণেই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি।...উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। জাতিবৈর স্পৃহণীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহণীয় নহে। দ্বেষ, মনের অতি কুৎসিত অবস্থা ; যাহার মনে স্থান পায়, তাহার চরিত্র কলুষিত করে। বাঙ্গালী ইংরেজের প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ঠ কামনা না করেন।*

বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'সুচিন্তিত' উক্তি আমাদের যার-পর-নেই বিভ্রান্ত করে। তিনি 'বৈরিতা' এবং 'দ্বেষ' শব্দদুটির মধ্যে দার্শনিক পার্থক্য-নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু, সাধারণ মানুষের পক্ষে এহেন মনকে-চোখ-ঠারা সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুধাবন করা এবং তা অধিগত করা যথেষ্ট দুরূহ। বস্তুতপক্ষে, শব্দদুটির নিকটবর্তিতাও কম নয়। বৈরিতা কখনও দ্বেষহীন হয় না। শত্রুর প্রতি আমরা দ্বেষ পোষণ না-করে পারি না। বৈরিতাকে কখনওই নিছক আদর্শগতভাবে রক্ষা করা যায় না। শত্রুর বিনাশ চাওয়াই মানুষের-ধর্ম। আসলে, সামন্তচিন্তায়-সমৃদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেণিগত ভাবনার উপর আদর্শবাদিতার একটি মোহন প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হিন্দু-বাঙালির

বাহুবল প্রতিষ্ঠা। জাতীয়তাবাদের আদর্শেই চালিত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। উনিশ শতকের হিন্দু-বাঙালির জাতীয়তাবাদী ভাবধারা তাঁর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এই ধারণা পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক ধারণার এক অবিমিশ্র সংমিশ্রণ। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মীয় ভাবাবেগকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন হিন্দু-বুদ্ধিজীবীরা। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ওই বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগণ্য। জাতীয়তাবাদ হিন্দু-মধ্যবিত্তশ্রেণির সুবিধাবাদের সঙ্গে ক্রমশই বিজড়িত হয়ে পড়ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব বিভ্রান্তি থেকে মোটেই বেরিয়ে আসতে পারেননি। ফলে, তিনি তাঁর প্রবন্ধে বা উপন্যাসে যতটা ইংরেজ-বিরোধী, তার চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান-বিরোধী। এ-ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতই শ্রেণিগত সুবিধাবাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। ফলে তিনি সিপাহি বিদ্রোহ বা নীলকর আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। দেশীয় জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তিনি *সাম্য* লিখে সমাজতন্ত্রের চর্চা করলেও পরে হিন্দুশাস্ত্রের চর্চায় অধিক মনোনিবেশ করেন—এমনকী *সাম্য* যথেষ্ট পাঠক-আনুকূল্য পাওয়া সত্ত্বেও পরে তা তিনি আর ছাপাতে চাননি। আমরা লক্ষ করব, অধিকাংশ বাঙালি-মধ্যবিত্ত হিন্দুর মতোই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার অবলম্বন হিসেবে, সমকালীন ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রবণতাগুলি অগ্রাহ্য করে কেবল অতীত গৌরবগাথা আর বীরপূজা রচনা করে গিয়েছেন। সাধারণভাবে তিনি কখনওই সার্বিক ইংরেজ-বিরোধিতায় অংশ নেননি (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায় ছিল তাঁর)। কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রীয় সুবিধাভোগী বাঙালি কখনওই ইংরেজকে 'শত্রু' মনে করতে পারে না। কেননা, ইংরেজের কৃপায়ই মধ্যবিত্ত শিক্ষিতশ্রেণির শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। ইংরেজ ওই শ্রেণির প্রতিযোগী হতে পারে না। কিন্তু, জাতীয়তাবাদ যেহেতু সততই শত্রুসন্ধানী, সেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় মুসলমান-সমাজকেই প্রতিযোগী-তথা-শত্রু হিসাবে গণ্য করেছেন। তা তারা যতই অসম প্রতিদ্বন্দ্বী হোক।

প্রাথমিকভাবে বাঙ্কিমচন্দ্র বিদেশি মুসলমান শাসকদের 'শত্রু' জ্ঞান করে উপন্যাস রচনা করলেও, ক্রমশ তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ক্রীড়নক হিসাবে সামগ্রিক মুসলমান সমাজকেই 'শত্রু' বলে গণ্য করতে থাকেন। মুখে 'বৈরী' ইংরেজের সঙ্গে 'দ্বেষ'-হীন প্রতিযোগিতার কথা বললেও তিনি যেন ক্রমশই মুসলমান-বিদ্বেষী হয়ে পড়েন। আমরা যখন পড়ি তাঁর নিম্নোক্ত *বঙ্গদর্শন*-সম্পাদকীয, তখন লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। বাঙ্কিমচন্দ্র ৭ চৈত্র, ১২৬৫ সালের বঙ্গদর্শনে লেখেন :

> *"....নেড়ে চরিত্র বিচিত্র, ইহারা অদ্য জুতা গড়িতে গড়িতে কল্য 'শাহজাদা' 'পিরজাদা' 'খানজাদা' 'নবাবজাদা' হইয়া উঠে, রাতারাতি আর হইয়া বসে, যাহা হউক বাবাজীদের মুখের মতন (জবাব?) হইয়াছে, জঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া অন্তরঙ্গভাবে গদগদ হইয়াছিলেন, এদিকে জানেন না যে 'বাঙ্গাল বড় হেঁয়াল'।*
>
> —*সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, বিনয় ঘোষ, প্রথমখণ্ড*

এই সম্পাদকীয় লেখার পনেরো বছর পর বঙ্কিমচন্দ্র '*জাতিবৈর*' নামে (প্রাগুক্ত) যে-

প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, সেখানে তিনি তাঁর স্বীয় মানসিকতাকে সামান্য আদর্শায়িত করতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। কেননা, পূর্ববর্তী *দুর্গেশনন্দিনী* বা *মৃণালিনী* উপন্যাসদুটিকে আমরা বিদেশি মুসলমান-শাসকদের প্রতি বিরূপতা বলে মনে করলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রমোত্তরণের ধারায় তাঁর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকেই ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে দেখি।

চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) উপন্যাসে ব্রিটিশ-চরিত্রর পাশে বঙ্কিমচন্দ্র যখন মুসলমান-চরিত্র স্থাপন করেন, তখন তাঁর একদেশদর্শিতা জেগে ওঠে দৃষ্টিকটুভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

> *তখন মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া অ্যামিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ ইংরেজরা ভীত হইল না।*
>
> *স্থির চিত্তে, নৌকামধ্য হইতে দ্রুতাবতরণ প্রবৃত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া অ্যামিয়ট, গলস্টন ও জন্‌সন্‌, স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতিবারে এক এক জনে এক এক জন যবনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।*
>
> *কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবনশ্রেণীর উপর যবনশ্রেণী নামিতে লাগিল। তখন অ্যামিয়ট বলিলেন, "আর আমাদিগের রক্ষার কোন উপায় নাই। আইস আমরা বিধর্ম্মী নিপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি।"*

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনায় 'যবন' ও 'ইংরেজদের' মধ্যে লেখকের তুলনামূলক পক্ষপাত গোপন থাকে না। *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসটিতে বর্ণিত হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে আমাদের *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। মিরকাশিমকে বঙ্কিমচন্দ্র *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে অনেকটাই গভীরতর ট্রাজিক মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন। মিরকাশিম যখন দলনীকে বলেন :

> *"আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্ত আমারই, এই জন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি—আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, "রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর। কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজদৌল্লা নহি বা মীরজাফরও নহি।"*

—তখন বঙ্কিমের ইতিহাস-সচেতনতা এবং মানব-চরিত্রের গভীর মনস্কতা-অনুধাবন আমাদের চোখে না-পড়ে পারে না।

এখানে লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র মিরকাশিমের চরিত্রে যেমন প্রচ্ছন্ন ইংরেজ-বিরোধিতা

এঁকে দিয়েছেন, তেমনই চরিত্রটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন মানবিক গুণ। বঙ্কিম-সমালোচকরা এইসব গভীরতর ইঙ্গিত একেবারেই গণ্য করেন না। বাহ্যিক লক্ষণ দেখে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বভাবতই মুসলমান-বিরোধী বলে চিহ্নিত করে রাখেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাসের সন্তান, তিনি যে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-ব্যক্তিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফসল, তা প্রায়শই বিস্মৃত হয়েছেন সমালোচকরা। সে-জন্য মিরকাশিম চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে-মাহাত্ম্য আরোপ করেছেন, তা চোখে পড়েনি তাঁদের। ইংরেজ-বিরোধী, ইংরেজের কূটকৌশল বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন মিরকাশিম প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভেবে আত্মধ্বংস অনিবার্য জেনেও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেননি।

অবশ্য, এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র নবাব মিরকাশিমকে 'রাজা' বলে চিহ্নিত করলেন কেন? মনে হয়, তিনি এখানে হিন্দু-রাজা ও রাজত্বের ধারণাটিকেই গ্রহণ করেছেন। 'বাজার ধর্ম প্রজাপালন' এই সনাতনী ধারণা তিনি মিরকাশিমে আরোপ করে তাঁকে অন্যতর মহিমায় উন্নীত করেছেন।

প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> *নিজ ধ্বংস জেনেও ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়ানব সঙ্কল্পে মীবকাশিম এক ট্রাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন বঙ্কিমের হাতে। শুধু তাই নয়, "মীরকাশেম হিন্দুদিগেব নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন।" এখানে দুই জনসমাজের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত দিচ্ছেন বঙ্কিম। নিজে যা দেখলেন জ্যোতিষগুণে, তাতে নিশ্চিন্ত না হয়ে মুর্শিদাবাদের এক হিন্দু কর্মচাবীব মাধ্যমে বেদগ্রামের এক হিন্দু বিদ্বান-ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরকে তলব করলেন, এঁর কাছেই তিনি জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলেন। সংযোগ-সম্পর্কটি লক্ষ করার, বিদ্যার আদানপ্রদান দেখার। নবাব ও বিদ্বান ব্রাহ্মণের যোগাযোগ বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কেরই ইতিহাসের অঙ্গ। বঙ্কিম সেটাই দেখাচ্ছেন। লক্ষ্য করার, যুদ্ধের ফল সম্পর্কে তাঁর কোন জিজ্ঞাসা নেই, তাঁর প্রশ্ন যুদ্ধকালে ও পরে দলনী কোথায় থাকবে। কারণ যুদ্ধের ফল তো তিনি জানেনই। এর বিপরীতে অ্যামিয়েটেব উক্তি, "যেদিন একজন ইংবেজ দেশী লোকের ভয়ে পালাইবে, সেইদিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে।" গুরগণ খাঁ ও জগৎশেঠের চক্রান্ততেও বঙ্কিম ইতিহাসের আরেক সংযোগ দেখান।*
>
> *—উপন্যাস রাজনৈতিক*

অবশ্য, পাশাপাশি, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের মাহাত্ম্য-কীর্তনও কম করেননি। বস্তুত, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত হিন্দু-বাঙালি-বুদ্ধিজীবী সে-সময় এ-রকম স্ববিরোধিতায়ই আক্রান্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অজর-অটল রাজনীতিবিদ ছিলেন না। উদ্ভূত সংকটে তিনি যে যথেষ্ট বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, স্থিতি ও গতির মধ্যে সঠিক নির্বাচন ঘটাতে পারেননি, তা তাঁর ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা নয়, সময়েরই সীমায়ন। পার্থপ্রতিম লিখেছেন :

> *বঙ্কিম বাইরের পুনরুত্থানবাদী হিন্দুত্বকে মনে করেছিলেন বাঁচবার উপায়, তিনিও বেন্থাম-মিল-স্পেন্সার পড়া ইংরেজী শিক্ষিত, তবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর অপরিচয় ছিল না। কিন্তু সময়ের দায়, ঔপনিবেশিক বিচ্ছিন্নতার দায় তাঁকে বহন করতে হল। উনিশ শতকের অষ্টাবক্রতায় তিনি বুঝলেন না, তখন হিন্দুত্ব ও হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জনসমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে কত ভ্রান্ত, রাজনীতিতে কত বিপজ্জনক।*
>
> — *প্রাগুক্ত*

আসলে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উচ্চকোটির মানুষদের সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীব তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। ফলে, তাঁরা ঔপনিবেশিক শক্তির বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্পর্কে মোটেই সচেতন হতে পারেননি। রাষ্ট্রবিরোধী কোনও বিরোধকে বিন্দুমাত্র সমর্থন করেননি তাঁরা। এইসব পরোক্ষ সমর্থন যে উপ-মহাদেশে ব্রিটিশ-শক্তির ভিত সুদৃঢ় করেছিল, তা এখন বেশ বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে একদিকে যেমন মিরকাশিমের প্রশংসা করেন, তেমনই তিনি একই লেখনীতে ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পর্কে লেখেন :

> *ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কর্ম্মঠ লোক কর্ত্তব্যানুসারে অনেক সময় পরপীড়ক হইয়া ওঠে। যাঁহার উপর রাজ্যরক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্যরক্ষার্থে পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই একজনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকাব হয়, সেখানে তাঁবা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন হেস্টিংসের ন্যায সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরায়ণতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্যস্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে। ওয়ারেন হেস্টিংস দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন।*

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিপজ্জনক ঔপন্যাসিক উক্তি আসলে শাসিত জাতির সার্বিক মানসিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে 'মহৎ কার্য্য' বলে গণ্য করেছিলেন। আসলে, এ-ভাবনা তাঁর একার নয়, তৎকালীন উচ্চকোটির বাঙালি-বুদ্ধিজীবীর শিকড়হীনতা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের সার্বিক যোগাযোগহীনতার ফলেই এ-রকম প্রতিক্রিয়াশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল। যে-বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদেশের কৃষক, সাম্য* বা *কমলকান্তের দপ্তর*-এর মাধ্যমে ইংরেজ-সভ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তিনিই যে এ-রকম আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন, ভাবলে বিস্ময় জাগে। অথচ, ইংরেজের রাজ্যদখলকে তিনি 'মহৎ কার্য্য' বললেও মুসলমান-অভিযানের বিষয়টিকে অনুরূপ দৃষ্টিতে দেখেননি। ইংরেজের প্রতি তিনি একধরনের আপসধর্মী মনোভাব গ্রহণ করলেও

মুসলমান-শাসকদের প্রতি সমমনোভাব দেখাতে পারেননি। তিনি উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের, এমনকী পাঠান-রাজপুতের সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার ছবি আঁকলেন, মিরকাশিমের ট্র্যাজিডির কথা লিখলেন, পরে নিজেই যেন তা পরিত্যক্ত মনে করলেন। দেশজ হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক মিলনাকাঙ্ক্ষার আকুতি ও আবেগ উপলব্ধি করলেন না তিনি, গ্রহণ করলেন না—পরিবর্তে বিদেশি মুসলমান-শাসকদের সঙ্গত বিরোধিতা যেন সার্বিক মুসলমান-বিবোধিতায় পর্যবসিত হল। তিনি মুসলমান-আক্রমণকে সরাসরি বিদেশি আক্রমণ বলে চিহ্নিত না-করে তাকে সম্প্রদায়গত আগ্রাসন হিসাবে দেখলেন। এবং, তার বিরুদ্ধে, তা প্রতিরোধে হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাব প্রকল্পনাকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে ফেললেন। এই আবেগে ভেসে গেল তাঁর যাবতীয় যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনা, সামাজিক, ঐতিহাসিক বোধ-অনুভব। হিন্দু-মুসলমানেব সংঘাতই তাঁর কাছে প্রধানতম, একমাত্রকৃত্য হযে উঠল। *মৃণালিনী* উপন্যাসে আমরা এই সংঘাতের স্বরূপ দেখেছি। বস্তুত, সেই সূচনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র যবন-জয় এবং হিন্দুবাজ্যের আবেগকে তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে প্রবাহিত কবেছেন।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> *এও ঠিক এই প্রায় সাতশ বছর আগেকার কাহিনীতে বঙ্কিম বাঙ্গালী তথা হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা, শৌর্যবীর্যের কথাই বলতে চেয়েছেন তাঁর সময়কাব অভিজ্ঞান অন্বেষণে। তবে ঐ সময় সদ্য আগত মুসলমান শক্তির সঙ্গে হিন্দুর সংঘাত দেখানোব মধ্যে দুটি অচেনা ও প্রাথমিকভাবে বিরোধী শক্তির চ্যালেঞ্জ-রেসপন্সকে দেখানো যায়। কিন্তু বঙ্কিম ১৮৮০-র পর ঐ ইতিহাসের পর্বান্তরেব কাহিনী বলেন না, হিন্দু-মুসলমানের কয়েক শতাব্দীব্যাপী সম্পর্কের ইতিহাসের পরের ঘটনাকে হিন্দুত্বর চশমায় দেখতে চান। তাঁব এই নতুন পর্যায় আকস্মিক নয়। এব মধ্যে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ইতিহাস নেই, আছে ঐ ১৮৮০-র দশকেব ব্যাপকতর সংকট।*
>
> —*প্রাগুক্ত*

এই সংকটের স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র সম্যক অনুধাবন কবেছিলেন বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে রাজশক্তির দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বই তিনি বারবাব উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। এবং, সে-ক্ষেত্রে, তিনি ক্রমশ লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতা উপেক্ষা কবে হিন্দুশক্তির, হিন্দুধর্মের পক্ষাবলম্বন করেছেন। ইতিহাসকে আশ্রয় করে উপন্যাস-রচনায় ব্রতী হয়েও তিনি অবিরাম ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য থেকে সরে গিয়েছেন। নিজস্ব চরিতার্থতায় পূর্ণ কবেছেন উপন্যাসের বয়ন।

১৮৮২ সালে প্রকাশিত *রাজসিংহ* বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত প্রকাশ হয়ে ওঠে। আমরা জানি, উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরে তিনি উপন্যাসটির আয়তন দীর্ঘতর করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে উপন্যাসটির বর্ধিততর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ পায়। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণে উপন্যাসটির আয়তন প্রায় চাবগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৩, দ্বিতীয় সংস্করণে তা বেড়ে হয় ৯০, চতুর্থ সংস্করণে আয়তন পৌঁছয় ৪০৪-পৃষ্ঠায়। এ থেকে *রাজসিংহ* বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনিবেশ বোঝা যায়। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসটিকেই তাঁর একমাত্র 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে গণ্য করেছেন। হিন্দুর বাহুবল প্রদর্শনের জন্য তিনি এই উপন্যাসটিকে তাঁর অন্যতম আধার করেছিলেন, বেশ বোঝা যায়। *রাজসিংহ*-র পাঠ-গ্রহণের আগে আমরা এই উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত ভূমিকা-অংশটুকুর মাধ্যমে লেখকের অভিপ্রায়টি বুঝে নিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> *রাজসিংহের পূর্ব্ব তিন সংস্করণে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা একটা অতি গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কথা, হিন্দুদিগের সঙ্গে মোগলের বিবাদ। মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা সকলেই জানে। রাজপুতগণেব বীর্য্য অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন সুপরিচিত নহে। তাহা সুপবিচিত করিবার যথার্থ উপায়, ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী, হিন্দুদ্বেষক। হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন। বিশেষতঃ মুসলমানদিগের চির শত্রু রাজপুতদিগের কথা। বাজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায না—স্বজাতিপক্ষপাত নাই, এমন নহে। মনুষী নামে একজন বিনিসীয় চিকিৎসক মোগলদিগের সময়ে ভারতবর্ষে বাস কবিযাছিলেন। তিনিও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন , কত্রু নামা একজন পাদ্রি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন জাতীয় ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহাব কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা, তাহার মীমাংসা দুঃসাধ্য। অন্তত এ কার্য্য বিশেষ পবিশ্রমসাপেক্ষ।*
>
> *ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস-লেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পাবেন। তবে, সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এই নিষেধ বাক্য খাটে না। এক্ষণে বুঝাইতেছি, এই উদ্দেশ্য কি।*
>
> *'ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত*

হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইযাছি। মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলবান ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে রাজকীয় অন্যান্য গুণে তাঁহারা নিকৃষ্ট ছিলেন।

যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। উপন্যাসে সে কথা পাঠকেব হৃদয়ঙ্গম করাইতে গেলে, রাজসিংহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন করা গিয়াছিল, তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয না। রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

স্থূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধেব প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔবঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।

ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কোনটি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আমি সে বিচার বড় করি নাই। দুই একটা উদাহবণ দিলে বুঝা যাইবে। রূপনগরের রাজকন্যা সম্বন্ধে যে স্থূল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা টডের গ্রন্থে আছে, কিন্তু অর্মের গ্রন্থে নাই। আর উদিপুরী সম্বন্ধে যে স্থূল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা অর্মের গ্রন্থে আছে, কিন্তু টডের গ্রন্থে নাই। আমি উভয় ঘটনাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। রন্ধ্র মধ্যে ঔরঙ্গজেব যে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা লিখিয়াছি, অর্ম এরূপ লেখেন। কিন্তু টডের গ্রন্থে শাহজাদা সম্বন্ধে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি এখানে অর্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। এইরূপ অনেক আছে।

কথিত আছে, নৃত্যগীত কেহ না করিতে পারে, এমন আদেশ ঔবঙ্গজেব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অন্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল, এ উপন্যাসে এইরূপ লিখিয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।

ঔরঙ্গজেব নিজে মদ্য পান করিতেন না, কিন্তু ইঁহার পিতা ও পিতামহ, খুল্লতাত এবং সহোদর প্রভৃতি অতিশয় মদ্যপ ছিলেন। তাঁহার পৌরাঙ্গনাগণও যে মদ্যপায়িনী ছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কেহ যদি এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসপ্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

বঙ্কিমচন্দ্র এই ভূমিকাংশে ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবের প্রশ্ন তুললেও, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার সেই বক্তব্যের বিরুদ্ধেই মতপোষণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

আজ এরূপ দুঃখ করিবার কারণ নাই। বঙ্কিমের পর এই অর্দ্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে যে সব ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফলে এই রাজপুত-মুঘল সংঘর্ষের ইতিহাস একমাত্র সমসাময়িক বর্ণনা হইতে যেমন বিস্তৃত ও বিশুদ্ধভাবে রচনা করা যায়, এমন আর কোন যুগের ভারত ইতিহাসে সম্ভব নয়।

রাজসিংহ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসেব লক্ষ্যটি যেন স্থির করে দেন। *চিত্রদর্শন* নামে ওই পরিচ্ছেদে হিন্দু-রাজকুমাবী চঞ্চলকুমারী, রূপনগবেব বাজকন্যাকে দিয়ে তিনি অভীষ্ট-পূরণের সূচনাটি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেব সমস্ত নারী-চবিত্রই যেমন রূপবতী, চঞ্চলকুমাবীও অনুরূপা—'ভুবনমোহিনী' ও 'দেবী-প্রতিমা'। সেই পবমা নারীকে দিযে বঙ্কিমচন্দ্র যে-কাণ্ডটি উপন্যাসেব প্রায়-সূচনাযই ঘটান, তাতে রূপসী নারীর মোহপাশ নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তিনি মুহূর্তে লেখকের উদ্দেশ্যপূবণের পুতুল-মাধ্যম হয়ে ওঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলম্‌গীব বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে বাখিতেছি। সবাই উঁহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উঁহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী! কাক পক্ষীতে শুনিলেও, রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটিতে রাখিলেন, "কে নাতি মারিবি মার্।"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মল নাম্নী একজন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিযা ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।" চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুত-কুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ! কি করিলে!" বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।" তারপর নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্ম্মল! ছেলেদের সাধ মিটে ; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর-সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—"

নির্ম্মল রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন, কথাটা সমাপ্ত হইল না—কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল।

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে রাজকুমারী সখি নির্মলকুমারীকে বলেছে, "*তুই কি মনে করেছিস যে আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?*" অন্যদিকে সখিও বাদশাহকে ছেড়ে কথা বলেনি। সে বাদশাহকে সাফ জানিয়েছে, "*আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধর্ম্মকেই ভয় করি। দিল্লীর বাদশাহ ম্লেচ্ছ আর দিল্লীর বাদশাহ ঐশ্বর্য্যশালী। দিল্লীর বাদশাহের সাধ্য কি যে, আমার কাম্য বস্তু দিতে পারেন, কি লইতে পারেন?*" উত্তবে তিনি বললেন, "*বটে! বটে! ঐ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।*" তখন তিনি একজন তাতারীকে আদেশ করলেন, "*যা বাবর্চ্চি মহল হইতে কিছু গোমাংস আনিয়া, দুই তিন জনে ধরিয়া ইহার মুখে গুঁজিয়া দে।*"

এখানেই শেষ করেননি বঙ্কিম। তারপরে লিখেছেন :

নির্ম্মল তাহাতেও টলিল না। বলিল, "জানি আপনাদিগের সে বিদ্যা আছে। সে বিদ্যার জোরেই এই সোনাব হিন্দুস্থান কাড়িয়া লইয়াছেন। জানি গোরুর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়া মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে—নহিলে বাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কিন্তু আবার একটা কথা আপনাকে মনে কবিয়ে দিতে হইল। শুনেন নাই কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ না লইয়া এক পা চলে না? আমার নিকটে এমন তীব্র বিষ আছে যে, আপনার ভৃত্যগণ গোমাংস লইয়া এ ঘরে পা দেওয়ার পরেও যদি তাহা আমি মুখে দিই, তবে জীবন্ত আর আমার মুখে কেহ গোমাংস দিতে পারিবে না। জাঁহাপনা আপনাব বড় ভাই দারা শোকোকে বধ করিয়া তাহার দুইটি কবিলা কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন—পারিয়াছিলেন কি?—অধম খ্রিষ্টিয়ানীটা আসিয়াছিল জানি, রাজপুতানী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি? আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।

রাজসিংহ-এ বঙ্কিমচন্দ্র উদযপুরের এক হিন্দু-রমণীকে ঔবঙ্গজেবের স্ত্রী-চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। উক্ত উদিপুর্বা নামে চরিত্রটি সম্পূর্ণরূপেই অনৈতিহাসিক। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যপূরণের অভীপ্সায়ই এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। এই উদিপুবী ও জেবউন্নিসাকে বন্দি কবে দিল্লি থেকে উদয়পুবে আনিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেন চঞ্চলকুমারীর

মাধ্যমে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করতে চাইলেন। সেখানে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীকে মানসিক নিগ্রহ করবেন, অপমানে 'দহনাবস্ত' হবে তাঁর, এ যেন বঙ্কিমের গভীরতর অভিপ্রায় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের অষ্টম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে চঞ্চলকুমারী-কর্তৃক উদিপুরীর লাঞ্ছনার যে-বিবরণ দিয়েছেন, তাতে যে কেবল বিজিত শত্রুর সঙ্গে জয়ী রমণীর প্রতিশোধকামী আচরণই ব্যক্ত হয়েছে, তা নয়। সেখানে আমরা ধর্মীয় লাঞ্ছনার বিববণও পেয়ে যাই। শত্রু-রমণীর প্রতি চঞ্চলকুমারীর জিঘাংসা এই পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। অবশ্য, এই জিঘাংসার যৌক্তিকতাও জানিয়েছেন তিনি। সে-ক্ষেত্রে আমরা তাঁর সমর্থনের পাল্লাটি কোনদিকে ঝুঁকে থাকে, তা বেশ টের পাই। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

> *চঞ্চলকুমারী প্রথমে বেগমের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বেগম যদি তাহার উপযোগী ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, তাঁহাকে এ অপমানে পড়িতে হইত না। কিন্তু তিনি পরুষবাক্যে তেজস্বিনী চঞ্চলকুমারীর গর্ব্ব উদ্রিক্ত করিযাছেন—কাজেই এখন ফলভোগ করিতে হইল। তামাকু সাজার কথায়, সেই তামাকু সাজার নিমন্ত্রণপত্রখানা মনে পড়িল। উদিপুবীর সর্ব্বশরীরে স্বেদোদ্‌গম হইতে লাগিল। তথাপি অভ্যস্থ গর্ব্বকে হৃদয়ে পুনঃস্থাপন করিয়া কহিলেন, "বাদশাহের বেগমে তামাকু সাজে না।"*
>
> *চঞ্চলকুমারী। যখন তুমি বাদশাহের বেগম ছিলে তখন তামাকু সাজিতে না। এখন তুমি আমাব বাঁদী। তামাকু সাজিবে। আমার হুকুম। উদিপুরী কাঁদিয়া ফেলিল—দুঃখে নহে ; রাগে। বলিল, "তোমার এত বড় স্পর্ধা যে আলমগীর বাদশাহের বেগমকে তামাকু সাজিতে বল?"*
>
> *চঞ্চল। আমার ভরসা আছে, কাল আলমগীর বাদশাহ স্বয়ং এখানে আসিয়া মহারাণার তামাকু সাজিবেন। তাহার যদি সে বিদ্যা না থাকে, তবে তুমি তাঁহাকে কাল শিখাইয়া দিবে। আজ আপনি শিখিয়া রাখ।*

যদিও, এই সুতীব্র অপমানের পরে চঞ্চলকুমাবী দাসীদের নির্দেশ দিলেন উদিপুরীর যথোচিত বাত্রিকালীন আপ্যায়নের। তখন :

> *নির্ম্মল বলিল, "তাহা সবই হইবে। কিন্তু তাহাতে ইঁহার পরিতৃপ্তি হইবে না।*
>
> *চঞ্চল। কেন, আর কি চাই?*
>
> *নির্ম্মল। তাহা রাজপুরীতে অপ্রাপ্য।*
>
> *চঞ্চল। শরাব? যখন তাহা চাহিবে, তখন একটু গোময় দিও।*

'গোময়' শব্দটি এখানে লক্ষ্যণীয়। চঞ্চলকুমারীর প্রতিশোধস্পৃহার তীব্রতা এখানে সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে জেব-উন্নিসার অপমান-বর্ণনার পর, পঞ্চম পরিচ্ছেদে হৃদয়-জ্বালার তীব্রতর বর্ণনার পব :

> *তখন জেব-উন্নিসা, হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ ভুলিয়া গেল। যেখানে তাহার যাইতে নাই, সেখানে গেল। যে শয্যার উপর চঞ্চলকুমারী বসিয়া, তাহার উপর গিয়া দাঁড়াইল। তারপর ছিন্ন লতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িয়া গিয়া, চঞ্চলকুমারীর পায়ের উপর মুখ রাখিয়া, পদ্মের উপর পদ্মখানি উল্টাইয়া দিয়া, অশ্রুশিশিরে তাহা নিষিক্ত করিল। বলিল, "আমার প্রাণ রক্ষা কর। নহিলে আজ মরিব।"*
>
> *চঞ্চলকুমারী তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন—তিনিও হিন্দু মুসলমান মনে রাখিলেন না।*

এর আগে উদিপুরী-জেব-উন্নিসাব সংলাপে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু 'যবন' শব্দের সমার্থক মুসলমান 'কাফের' শব্দটি ব্যবহার করেন ·

> *এই পর্য্যন্ত বলিয়া উদিপুরী, জেব-উন্নিসার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার অবস্থা এমন কেন? কাল তোমার কি হইয়াছিল? কাফের তোমার উপরও কি অত্যাচার করিয়াছে?"*
>
> *জেব-উন্নিসা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কাফেরের সাধ্য কি? আল্লা করিয়াছেন।"*

'যবন' এবং 'কাফের' শব্দদুটি ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-মুসলমানেব পারস্পরিক ধর্মীয় দ্বন্দ্বের, ঘৃণার স্বরূপটি খুব স্পষ্ট করে দেন। তিনি বোঝাতে চান, ধর্মীয় দ্বেষ কেবল হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও।

পরিচ্ছেদের শেষাংশে উদিপুরী চঞ্চলকুমারীর কথোপকথনে আমরা আবারও লেখকের উগ্র হিন্দুয়ানা প্রত্যক্ষ করি। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

> *সাক্ষাৎ হইলে উদিপুরী চঞ্চলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কত আশরফি পাইলে চঞ্চলকুমারী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন। চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "যদি বাদশাহ ভারতবর্ষের সকল মসজিদ—মায় দিল্লীর জুম্মা মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন, আর ময়ূরতক্ত এখানে বহিয়া দিয়া যাইতে পারেন, আর বৎসব বৎসর আমাদিগকে রাজকর দিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে তোমাদের ছাড়িয়া দিতে পারি।"*

উপন্যাসের শেষ পবিচ্ছেদে, রাজসিংহ ঔবঙ্গজেবকে পরাভূত করার পর, বঙ্কিমচন্দ্র জয়ী হিন্দুর উল্লাস বর্ণনা করেছেন :

> *এ দিকে সুবলদাস, খাঁ রহিলাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূরীকৃত করিলেন। পরাভূত হইয়া খাঁ রহিলাও আজমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগন্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমন কি, মোগল সুবাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন। অনেক স্থান অধিকার করিয়া সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত রাজসিংহের অধিকার স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু*

পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহকে জানাইল। করুণ-হৃদয় রাজসিংহ তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দয়ার অনুরোধে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।

কিন্তু রাজমন্ত্রী দয়াল সাহ সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মালবে মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কুয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।

...

চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পদে পদে মোগলেরা পরাজিত হইল। শেষ ঔরঙ্গজেব সত্য সতাই সন্ধি করিলেন। রাণা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র *রাজসিংহ* উপন্যাসটি এখানে শেষ করাব পর তাঁর মনে কি কোনও সংশয় উপস্থিত হয়েছিল যে, উপন্যাসটি মুসলমান-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ? হয়তো, সে-কারণেই উপন্যাসের শেষে তিনি একটি 'উপসংহার' জুড়ে দিয়েছিলেন এ-ভাবে :

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকাব করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ ; অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যানা গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজনা তিনি ক্ষুদ্ররাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পবাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীর তুলনায় মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। এই জন্য এ সকল কল্পনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপসংহার-অংশটিকে আমাদের আত্মপক্ষ-সমর্থন-সূচক মনে হতে

পারে। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাটি মনে রেখেছিলেন বলেই উপন্যাসের শেষে এই অংশটি সংযোজিত করতে হয়েছে তাঁকে—যা *রাজমোহনস ওয়াইফ* ছাড়া অন্য-কোনও উপন্যাসে করেননি তিনি। 'এ সকল কল্পনা' বলে তিনি উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার যে-ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন, তা-ও আমাদের স্ববিরোধী মনে হয়। কেননা, তিনি যে ইতিহাসের আশ্রয়েই উপন্যাসটি লিখছেন, তেমন ঘোষণা তাঁর ছিলই। ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা এবং গুরুত্বও এই উপন্যাসে কম নয়। অবশ্য, এ-কথাও ঠিক যে, ইতিহাসের শূন্যপৃষ্ঠাগুলি কল্পনা দিয়ে ভরিয়েই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়। আর, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ভুল কিছু করেননি। কথা তা নয়। কথা হল, বঙ্কিমচন্দ্র যে-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, তার দায়ভার তাঁরই। ফলে কল্পনার আতিশয্যে চরিত্র, সংলাপে যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভাব ফুটে ওঠে, তাকে নিছক ভিত্তিহীন বলে মনে করা কষ্টসাধ্য। কেননা, তাঁরই সৃষ্ট চরিত্রগুলি যে-ভাষায় কথা বলেছে, যে-ভাব ব্যক্ত করেছে, তার উৎস তো বঙ্কিমচন্দ্রেরই ভাবনা, তাঁরই লেখনী! ফলে, উপন্যাসের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কৈফিয়তকে খুবই দুর্বল মনে হয় আমাদের। কেননা, উপন্যাসের অন্তর্গত ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনা বাইরের এই জবাবদিহিকে প্রায়-নস্যাৎ করে দেয়। কেননা, উপন্যাসে 'মুসলমান' ঔরঙ্গজেবের যে-দুর্বৃত্ত রূপটি পরিস্ফুট হয়, তা যে বঙ্কিমেরই কল্পনাপ্রসূত, স্বেচ্ছাকৃত—তা বুঝতে পাঠকের ভুল হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র *রাজসিংহ* উপন্যাসে সচেতনভাবেই 'হিন্দুর বাহুবল' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের যে-নিজস্ব গতি ও দ্যুতি রয়েছে, তার প্রবাহে পাঠক প্রভাবিত হন। রবীন্দ্রনাথের মতো পাঠকও *রাজসিংহ* পড়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সচেতন, পূর্ব-নির্ধারিত অভীপ্সার কথা মনে না-রেখেই। মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন .

> *রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না, সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে, এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।*
>
> —*রাজসিংহ : আধুনিক সাহিত্য*

রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে উপন্যাস হিসাবেই পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যমূলকতা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বের বিষয়টিকে তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। এমনকী, উপন্যাসের অনৈতিহাসিকতাকেও তিনি উপন্যাসশিল্পের নিরিখেই বিচার করেছিলেন। উপন্যাসের বিশ্লেষণে তিনি লিখেছেন :

> *রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ ; উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা। রাজসিংহ চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলকুমারী মানিকলাল প্রভৃতি ছোটোবড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-*

ইতিহাসের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে, তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন-ইতিহাসের, তাহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই, অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

—প্রাগুক্ত

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানব-জীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে।...বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

—প্রাগুক্ত

রবীন্দ্রনাথের সময়ে, অন্তত তাঁর পক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্যভাবে দেখার ও দেখানোর যথেষ্ট বাস্তব অসুবিধা ছিল। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের গতিময়তার প্রশংসা করলেও, উপন্যাসটির আয়তন বারবার বাড়ানোর কারণে তা যে কখনও ক্লান্তিকর, অতিশয়োক্ত হয়ে পড়ে, তা আমরা লক্ষ করি। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার ব্যাপ্তি দেওয়ার চেয়ে তাঁব নিজস্ব বক্তব্য ও পরিকল্পনাকে সুবিস্তৃত করার জন্যই সম্ভবত উপন্যাসটির আয়তন বাড়িয়েছিলেন।

তবে, এ-সত্ত্বেও একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে, রাজসিংহের চরিত্রগুলি অনেক সময়ই স্বয়ং লেখকের অভিপ্রায় তছনছ করে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখনই ব্যক্তিব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, আশা-নিরাশার ছবি এঁকেছেন, শাহজাদি, শাহজাদা, বীর বাজপুত বা রাজপুত-রমণীর অন্তস্তল খুলে দেখাচ্ছেন, তখনই অনেকটা গৌণ হযে পড়ে লেখকেব হিন্দু-মুসলমান-বিবাদের তত্ত্বটি। সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঔরংজেব ও নির্মলকুমারীর কথোপকথন অনুসরণ করলে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় :

ঔরঙ্গ। আমাব বিচারে এই হইতেছে যে, তুমি রাজপুতের কন্যা, রাজপুতমহিষীর সখী—তুমি রাজপুতেরই।

নির্ম্মল। জাঁহাপনা! বিচার কি ঠিক হইল? আমি রাজপুতের কন্যা বটে, কিন্তু হজরত যোধপুরীও তাই। আপনার পিতামহী ও প্রপিতামহীও তাই—তাঁহারা মোগল বাদশাহের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না কি?

ঔরঙ্গ। ইহারা মোগল বাদশাহের বেগম, তুমি রাজপুতের স্ত্রী।

নির্ম্মল। (হাসিয়া) আমি শাহান্‌শাহ আলম্‌গীর বাদশাহের ইম্‌লি বেগম।

ঔরঙ্গ। তুমি রূপনগরীর সখী।

নির্ম্মল। যোধপুরীরও তাই।

ঔরঙ্গ। তবে তুমি আমার?

নির্ম্মল। আপনি যেমন বিবেচনা করেন।

ঔরঙ্গজেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দুনিয়ার বাদশাহ হইলেই কেহ সুখী হয় না—কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালবাসিয়াছি—কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তোমায় ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না—ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না। তুমি যাও। আমাকে স্মরণ রাখিও। যদি কখন আমা হইতে তোমার কোন উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।"

...

ঔরঙ্গজেব প্রেমান্ধের মত বিচ্ছেদে শোকে শোকাকুল না হইয়া একটু বিষন্ন হইলেন মাত্র। ঔরঙ্গজেব মার্ক আন্তনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণ হয় না।

এই খণ্ডের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্র যেন নিজের পূর্ব-নির্দিষ্ট সম্প্রদায়গত ভাবনার স্তরগুলি অতিক্রম করে যান মানিকলাল ও মবারকের সম্প্রদাযগত টানাপোড়েন—দুটি চরিত্রের ব্যক্তিগত বিবেচনা, সহানুভূতি আর কৃতজ্ঞতাবোধের আধারে। বঙ্কিমচন্দ্রের তখন যেন আব-কিছুই করাব থাকে না। স্বয়ং দুটি চরিত্রই নির্ধারণ করে নেয় নিজেদের পথ, নিয়তি। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

মবারক মাণিকলালের হাতে জীবন পাইয়া তাহার সঙ্গে উদয়পুরে আসিয়াছিলেন। রাজসিংহ তাহার বীরত্ব অবগত ছিলেন, অতএব তাহাকে নিজ সেনা মধ্যে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাহাতে মবারক কিছু দুঃখিত ছিল। আজ সেই দুঃখে গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিল। সে গুরুতর কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন।

বস্তুত, এইভাবে আমরা লক্ষ করি, ব্যর্থ প্রেমিক মবারক ও মানিকলালের সম্পর্কের দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্ব-বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র যেন নিজেই বিস্মৃত হন তাঁর যাবতীয় নির্ধারিত অভিপ্রায়। আমরা দেখি, একজন রাজপুত একজন মুসলমানকে কবর থেকে তুলে তার প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য যেন লেখকের উদ্দেশ্যপ্রবণতাকেই নিমেষে ধূলিসাৎ করে দেয়। আর, এখানেই সম্প্রদায়বাদী বঙ্কিমচন্দ্র পরাজিত হন ঔপন্যাসিক-তথা-মানবতাবাদী বঙ্কিমচন্দ্রেব কাছে। আমরা দেখি, *রাজসিংহ* উপন্যাসের দুটি পরস্পরবিরোধী স্তর তৈরি হয়ে যায়। বাহ্যিকভাবে যে-উপন্যাসটিকে 'সাম্প্রদায়িক' মনে হয়, সে-উপন্যাসটিরই গভীরতর স্তরে বয়ে যায় মানুষের, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে-নির্বিরোধে, মিলনের গভীরতর আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি। আর সেই স্তরে অপশাসক ঔরংজেবও হয়ে ওঠেন এক রক্তমাংসের মানুষ। এই উপন্যাস শেষপর্যন্ত আমাদের এই ভাবনায় নিশ্চিত করে যে, তত্ত্বের চেয়ে শিল্প

সবসময় বড়, শিল্পের চেয়ে জীবন সততই অনেক বেশি মহৎ। আর, বঙ্কিমচন্দ্র শেষপর্যন্ত সব বাহ্যিক দায় অতিক্রম করে সেই মহান জীবনের জয়গান গেয়েছেন বলে আমরা আশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ হই তাঁর প্রতি।

১৮৮২ সালের শেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বিতর্কিত, বিপজ্জনক, জনপ্রিয় এবং অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস *আনন্দমঠ*। এর আগে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল ওই বছরের মে মাস পর্যন্ত। স্বল্পায়তন উপন্যাসটি বই হয়ে বের হতে এতটা সময় লেগেছিল লেখকের ব্যক্তিগত দ্বিধাগ্রস্ততায়। তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, *বঙ্গদর্শন*-এ *আনন্দমঠ*-এর প্রকাশে ইংরেজরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। ফলে, এই মধ্যবর্তী সময়টায় তিনি *আনন্দমঠ* নিয়ে নানা ভাবনাচিন্তা করেছেন, পাঠ-পরিবর্তন করেছেন। তারপরে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা উপন্যাসটিতে নিহিত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে উপন্যাসটির গ্রন্থাকারে প্রকাশ-পূর্ব প্রেক্ষিত তথা ইংরেজ-বিরোধিতার তথ্যটি জেনে নিতে পারি :

> *কর্মদক্ষতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের পদোন্নতি হল ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৮১। নতুন পদ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির। রাইটার্স বিল্ডিংসের ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ। 'আনন্দমঠ' বঙ্গদর্শনে বের হচ্ছে। প্রথম খণ্ড শেষ হয়ে গেছে। সে পর্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে খুব কিছু ছিল না। 'বঙ্গদর্শনের' প্রকাশ তখন খুবই অনিয়মিত। ১২৮৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা বের হয় ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১ ; আষাঢ় সংখ্যা বের হয় ১২ই ডিসেম্বর ১৮৮১। ১২৮৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা বেরুলো জানুয়ারি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংখ্যায় 'আনন্দমঠের' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদ ছাপা হয়। এই সংখ্যায় ব্রিটিশ বিদ্বেষ সুস্পষ্টরূপে পাওয়া গেল। প্রথম খণ্ডে ব্রিটিশ বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত সামান্যই আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে ইংরেজদের প্রতিনিধি হিসাবে কাপ্তেন টমাসকে আনা হয়েছে। টমাস সাঁওতাল রমণীর প্রতি আসক্ত ; সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মতো কর্তিত হয়েছে। সাতজন সন্তান বন্দী করে কাপ্তেন সাহেব কলকাতায় রিপোর্ট পাঠালেন ২১৫৩ জন সন্তান হত্যা করা হয়েছে। "কাপ্তেন টমাস, ব্লেনহিম বা রসবাসের মত দ্বিতীয় যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁপ দাড়ী চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্তত বেড়াইতে লাগিলেন।" ইংরেজের শৌর্যবীর্যের প্রতি শ্লেষাত্মক মন্তব্য এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ এই কিস্তিতেই প্রথম পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই ইংরেজ কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের আশংকা হয়েছিল শাসিতের মন থেকে শ্রদ্ধার মনোভাব দূর হলে প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে। ১৬ জানুয়ারি (১৮৮২) শ্রাবণ সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং সরকারের হাতে পড়ে।*

এর এক সপ্তাহের মধ্যেই (২২শে জানুয়ারি) বঙ্কিমচন্দ্রকে বিদায়ের নোটিশ দেওয়া হল। বাংলা সরকার তাঁদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁকে রাখা নিরাপদ মনে করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মতো যথেষ্ট তথ্য ছিল না। তাই পরোক্ষ শাস্তির পথ অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিয়ে দেওয়া হল সরকারের অসন্তোষ।

—*আনন্দমঠ রচনার প্রেরণা ও পরিণাম*

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সুবিখ্যাত লেখক-তথা-দায়িত্বপূর্ণ সরকারি আমলাকে হঠাৎ একটি উচ্চপদ থেকে সরিয়ে দিয়ে, নতুন-সৃষ্ট পদটিকে লোপ করে, বঙ্কিমচন্দ্রের পদোন্নতি ঘটিয়ে ইংরেজ সরকার দেশীয় মহলের সম্ভাব্য ক্ষোভ নিরসন করতে চেয়েছিলেন। জানা যায়, সে-সময় সহকারী সচিবের পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল বাঙালি আমলাদের উৎসাহ দেওয়ারই জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ওই পদটিতে নিযুক্ত ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রকে পদ থেকে সরিয়ে পদের নতুন নাম দেওয়া হল 'আন্ডার সেক্রেটারি'। এবং সেখানে এক ইংরেজকে বহাল করা হল। পদটি তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হল। বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠানো হল আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অপসারণ সে-কালীন সংবাদপত্রে সবিশেষ আলোচিত হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয় :

The Charge against Bunkim Baboo is that during his time, office secrets oozed out from the office. This is the alleged charge, which of course everybody must regard as simply absurd. The story goes that when the appointment was given to Bunkim Baboo, it was done in opposition to the wishes of some secretaries who objected to have a native again. These Secretaries have now come forward with the charge that Bunkim Baboo permitted secrets to travel out of the office. His place has now been given to Mr. Blyth. So after all, the place which was made over to the natives of Bengal with so much beat of drum, has now been again given to a European. We wonder when will men in high position learn to be sincere, and adhere to the pledges they give.

—প্রাগুক্ত

সরকারি অসন্তোষের বিষয়টি সম্যক অনুধাবন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার *বঙ্কিমবাবু প্রসঙ্গ (কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র : সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত)* প্রবন্ধে লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র *অনেক বিবেচনার পর* আনন্দমঠ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, "*ইংরেজ সেনাপতি রানীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিল 'প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক পুরুষ।' আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্রণ করি, কিন্তু এক 'আনন্দমঠেই'*

সাহেবরা চটিয়াছে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।' বঙ্গদর্শন-এ-প্রকাশিত উপন্যাসের কিস্তিগুলি নানাভাবে পরিমার্জনা করে ১৮৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর আনন্দমঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *আনন্দমঠ* গ্রন্থে এইসব পরিবর্তনগুলির একটি সুবিস্তৃত তালিকা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে *আনন্দমঠ*-এর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি সংস্করণেই তিনি কম-বেশি পরিমার্জনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুবিস্তৃত পরিমার্জনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের রোষ সংক্ষিপ্ত করা। ফলে, এইসব সংশোধনের ফলে উপন্যাসটি সার্বিকভাবে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। আবার, ইংরেজকে তুষ্ট করতে গিয়ে তিনি দেশের মুসলমান-সম্প্রদায়কে আহত ও ক্ষুব্ধ করেছিলেন।

আমরা লক্ষ করি, উপন্যাসের *উপক্রমণিকা* অংশে বঙ্কিমচন্দ্র একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করে উপন্যাসের মূল সুরটিই বদলে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন। উপক্রমণিকার শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :

> *এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?" প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবন সর্বস্ব।"*
>
> *প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"*
>
> *"আর কি আছে? আর কি দিব?"*
>
> *তখন উত্তর হইল, "**ভক্তি**।"*

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থে 'ভক্তি' শব্দটি বড়, মোটা হরফে মুদ্রিত করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনে শব্দটির অস্তিত্বই ছিল না। সেখানে বঙ্কিম লিখেছিলেন, "*তখন উত্তর হইল, তোমাব প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব।*" অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র 'ভক্তি' শব্দটি ব্যবহার করে উপন্যাসটিকে ধর্মীয় আচ্ছাদন দিতে চেয়েছিলেন। রাজনীতি যে এর প্রতিপাদ্য নয়, তা যেন বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সরকারকে বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছিলেন 'ভক্তি' শব্দটিকে মোটা হরফে ব্যবহার করে। কিন্তু এতে যে তার খুব ঐহিক লাভ হয়েছিল, তা নয়। তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন, "*চাকরী আমার জীবনের অভিশাপ।*"

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> *অনেক বিবেচনার পর বঙ্কিম গ্রন্থাকারে 'আনন্দমঠ' প্রকাশ করলেন। তিনি কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের গভীরতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই অল্পবিস্তর রদবদল করে কর্তাদের তুষ্ট করা গেল না। বই অবশ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। হয়ত সাহিত্যজগতে বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেই। কিন্তু তাঁর একজন উপরওয়ালা সাহেব, এমন কি ছোটলাটও হতে পারেন, তাঁকে ডেকে বললেন, 'আনন্দমঠ' যে রাজদ্রোহমূলক নয় তার প্রমাণ দিতে হবে। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেলে বই বাজেয়াপ্ত হতে পারে এবং ব্যক্তিগত ক্ষতি হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রমাণ*

কিভাবে দেওয়া হবে? এর উত্তরে বঙ্কিমকে জানানো হল যে, কেশবচন্দ্র সেন যদি লিখে দেন 'আনন্দমঠে' রাজদ্রোহ নেই তাহলে সরকার মেনে নেবেন।

—*প্রাগুক্ত*

পরবর্তিকালে তেমনই করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন *আনন্দমঠ*-এর অনুকূলে মতপোষণ করে ইংরেজ সরকারকে বোঝাতে সচেষ্ট হন বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠ*-এ ইংরেজ-বিরোধী ভাবাদর্শ প্রচার কবতে চাননি। তাঁরা উপন্যাসটিকে 'কাল্পনিক উপন্যাস' বলে চিহ্নিত করতে চাইলেও, ইংরেজের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে-মহারাষ্ট্রের গোপন বিদ্রোহী বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের সংগ্রামী প্রেরণা আনন্দমঠের উৎসস্বরূপ ছিল। ফলে, আপসপন্থী বঙ্কিম তখন ওই ইংরেজ-সংশয় অমূলক প্রমাণ করার জন্য তৃতীয় সংস্করণে ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের অবতারণা করেন। প্রথম-দুটি সংস্করণে এর উল্লেখ ছিল না।

প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম সন্ন্যাসীদের অকিঞ্চিৎকর উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সেখানে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কোনওরকম ইঙ্গিত ছিল না। বঙ্কিম লিখেছিলেন :

> *... সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশে সে সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না কেন না তাহারা ভিক্ষোপজীবী ; লোকে আপনি খাইতে পায় না, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবে কে? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা তাহারা সকলেই পেটের দায়ে কাশী প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিত ; প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত।*

এই উল্লেখের প্রেক্ষিতে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের আভাস দেওয়ার সুযোগ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র তা দেননি। মনে হয়, প্রাথমিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের তেমন-কোনও অভিপ্রায়ই ছিল না। পরে, সম্ভবত, বাসুদেব ফড়কের জীবন-সাদৃশ্য থেকে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি সরাতেই তিনি নতুন করে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের অবতারণা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের জীবিকা-স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম হলেও, তিনি যে এর ফলে আরেকটি বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ফেললেন, তা আমরা আজও ভুলতে পারি না। সর্বোপরি, এখানে তিনি সাহিত্যের প্রতি, ইতিহাসের প্রতিও যাবতীয় অবিচার করে বসলেন। পরে মুসলমান-বুদ্ধিজীবীরা *আনন্দমঠ*-এর গায়ে সাম্প্রদায়িকতার মোড়ক এঁটে দেন। গৃহীত পাঠানুযায়ী তাঁরা যে খুব ভুল করেছেন, তা আমরা বলতে পারি না। আর, এখানেই বাংলা গদ্যভাষার প্রধানতম স্থপতি, উপন্যাসশিল্পের পিতৃপুরুষ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ট্রাজেডি। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ উপেক্ষা করতে না-পেরে, যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতেন না, তা-ই লিখতে বাধ্য হয়েছেন। ইংরেজের মহিমা-কীর্তন করে বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন লিখতে হয়েছিল :

> *প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু*

বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না।...

সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক।...ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না।

এই উদ্ধৃতির পাশাপাশি আমরা যদি *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫)-এর নিম্নাংশ পাঠ করি, তা হলে বঙ্কিমচন্দ্রের স্ববিরোধিতা বুঝে নিতে পারি :

ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেটিরিয়েল প্রসপেরিটির উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটিই প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এ দেশের বাহ্য সম্পদ-সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি।

এই পরস্পরবিরোধী ভাবধারাকে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার পবিবর্তন বলে চিহ্নিত করা যায়। সময়ের ব্যবধানে চিন্তার পরিবর্তন ঘটতেই পারে। কিন্তু, এ-ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি বলেই বঙ্কিমচন্দ্র-বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন। ইংরেজকে তুষ্ট করতেই বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী সংস্করণে এমন অবিশ্বাসের সংযোজন ঘটিয়েছিলেন।

আনন্দমঠ-এর ক্রমাগত পরিমার্জনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে-শব্দগত মৌলিক পরিবর্তন করেছিলেন, তা পরবর্তিকালে বঙ্কিমচন্দ্র-বিরূপতা জাগিয়ে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্র 'ইংরেজ', 'গোরা', 'ব্রিটিশ' শব্দের পরিবর্তে 'মুসলমান', 'নেড়ে', 'যবন' ইত্যাকার শব্দ ব্যবহাব করেন। যেমন, প্রথম সংস্করণের একাদশ পরিচ্ছেদে :

ভবানন্দ বলিল, 'ভাই ইংরেজ ভাঙ্গিতেছে...ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা ইংরেজের উপর পড়িল। ইংরেজ যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না।

এই অংশটি দ্বিতীয় সংস্কবণে :

...'ভাই নেড়ে ভাঙ্গিতেছে...ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না।

এই জাতীয় পরিবর্তনে যে বিপরীত বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তা ভেবে দেখেননি। আসলে, পশ্চাদবর্তী মুসলমান-সমাজকে সমকালে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত হিন্দুরা এ-রকম নিকৃষ্ট, অবমাননাকর অস্তিত্বেই দেখতেন। সমাজ-ব্যবস্থায় তা যেন স্বাভাবিকই হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভেবে দেখেননি এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। সমকালে

বিষয়টি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ সমালোচনার মুখে পড়তে না-হলেও *আনন্দমঠ*-এর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে সমালোচনার ঝড় উঠেছে গত শতকে। শিক্ষিত মুসলমান-সমাজ মনে করা শুরু করেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান-অবমাননাকর বিশেষণ নির্বিচারে ব্যবহার করে, তাদের প্রকৃতি বিষয়ে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে কেবল কুরুচির পরিচয়ই দেননি, তাঁর ঋষি-ব্যক্তিত্বের-আড়ালে-থাকা কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতার, বিদ্বেষেরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ-ছাড়া *আনন্দমঠ*-এর পৌত্তলিকতা-আশ্রয়ী, বন্দেমাতরম-শোভিত নিহিত ভাবাদর্শও মুসলমানদের ধর্মাচরণের বিপরীত অভিঘাত তৈরি করে। তাঁরা সে-কারণে *আনন্দমঠ*-কে জাতীয়তাবাদের সর্বজনীন প্রতীক হিসাবে গ্রহণ না-করে হিন্দু-ধর্মাদর্শের প্রকাশ-রূপেই দেখেছেন।

অবশ্য, না-দেখার কোনও কারণ যে নেই, তা নয়। আমরা *আনন্দমঠ*-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ধার করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্প্রদায়িক' ও 'ব্রিটিশ-ভক্ত' দৃষ্টিভঙ্গিটি বুঝে নিতে পারি :

১. *"কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ?"*
২. *"ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় গভর্নর জেনারেল।"*
৩. *"হরে মুরারে। উঠ। মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়ে মার।"*
৪. *ইংরেজ আগে রাজা না হইলে আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।*
৫. *তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা আর্য্যধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত আর্য্যধর্ম্ম—ম্লেচ্ছরা যাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে, তাহা লোপ পাইয়াছে।*
৬. *সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ 'বন্দেমাতরম', কেহ 'জগদীশ হরে' বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্য প্রকারে উপদ্রব করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে, "বল বন্দেমাতরম, নাহিলে মারিয়া ফেলিব।" কেহ ময়রার দোকান-পাট লুঠিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে "আমরা ব্রজগোপাল আসিয়াছি, গোপিনী কই?" সেই একরাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্ত কণ্ঠে হরি হরি বল। গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠিতে*

লাগিল। অনেক জীবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, 'মুই হেঁদু'।

বস্তুতপক্ষে, এইসব বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির একপার্শ্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে এখানে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের নিহিত বন্ধনটি অনেকটাই ছিন্ন করেছেন, তা অনস্বীকার্য। অবশ্য এ-কথা ঠিক, সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আধুনিক ধারণাটি গড়ে উঠেছে বিশ-শতকের শুরুতে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় কোনও কলঙ্ক-আরোপ করা মোটেই সুপ্রযুক্ত হয় না। মুসলমান-বুদ্ধিজীবীরা এ-বিষয়ে অভিমানী হয়েছেন সঙ্গত কারণেই। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ-শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের যে-দাঙ্গা সৃষ্টি হয়, আমরা দেখি, *আনন্দমঠ* উপন্যাস সেই বাস্তব দাঙ্গার আগে কল্পিত দাঙ্গার চিত্র আঁকে। বঙ্কিম লেখেন :

চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে, ভাই বিষ্ণু পূজা করবি? এই বলিয়া ২০/২৫ জন জড় করিয়া, মুসলমান গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমানরাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল।

কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বড় বিভ্রম জাগান। এখানে তিনি হিন্দুত্বের তাগিদে ইতিহাস ও রাজনীতিকে অনেকটাই উপেক্ষা করে বসেন। কেননা, আমরা জানি, *আনন্দমঠ*-এ বর্ণিত সময়কাল ১৭৭০ থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত। সে-সময় বাংলায় মুসলমান-শাসন অবসিত হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাৎস্যন্যায় চলছে। নবাবের ক্ষমতা তখন ইংরেজের কুক্ষিগত। ফলে সাধারণ হিন্দুজনের মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। হিন্দুধর্মের বিলোপের কোনও চিহ্নও তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে ছিল না। অন্যদিকে, যে-*আনন্দমঠ*-কে পরবর্তিকালের সন্ত্রাসবাদীরা গীতার সমতুল্য ভক্তিতে গ্রহণ করেছিল, সেই বিপ্লবীরা কখনওই বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত লুঠের মালের বখরা পেতেই একজোট হয়নি। তাঁরা বিদেশি শক্তির কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করারই ব্রত নিয়েছিল। আসলে, ঔপনিবেশিক-শিক্ষায়-শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র এক কল্পস্বর্গ গড়ে তুলতে চেয়েই এইসব বাস্তব ত্রুটি-বিচ্যুতির স্বরচিত ফাঁদে পড়েছিলেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, আমরা লক্ষ করেছি, *আনন্দমঠ* পরবর্তিকালে কখনও দাঙ্গার প্রেরণাগ্রন্থ হয়নি, তা বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার আধার হয়েছিল।

রেজাউল করিম লিখেছেন :

'আনন্দমঠে' কি আছে? ইহা জাগ্রত স্বদেশ-প্রীতিরই একটি বাস্তব রূপ। মুসলমান

নবাবদের অত্যাচার আবরণ মাত্র। যে যুগের চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা ছিল কোম্পানীর হাতের পুতুল—ক্লাইভের গর্দ্দভ, মীরজাফরের যুগ। সে যুগের অত্যাচার অনাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী কাহারও অবিদিত নয়। দেশের চতুর্দ্দিকে অরাজকতা, আফিঙখোর নবাবের সে দিকে দৃষ্টি নাই।...এই সময় কেমন করিয়া একদল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সেই অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেশকে অরাজকতা ও বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিল, গল্পচ্ছলে 'আনন্দমঠে' তাহারই মনোরম কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।...মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কথিত বাক্যগুলি বাহিরের আবরণ মাত্র—আইনের বেড়া-জাল হইতে পুস্তকটিকে বাঁচাইবার কৌশল মাত্র। 'আনন্দমঠে' স্বদেশ-প্রীতির যে করুণ আবেদন বহিয়াছে, তাহা প্রত্যেক পাঠকের মর্মস্থল স্পর্শ করিবে। মুসলিম-বিদ্বেষ তাহার নিকট বড় বলিয়া মনে হইবে না,—স্বদেশ-প্রীতিই যে ইহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, এই কথাটাই বারে বারে পাঠকের মনে হইবে।

যে যুগের ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া 'আনন্দমঠ' রচিত হইয়াছে, সে যুগের ইতিহাসের মাত্র সামান্য অংশই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের পটভূমিকায় ভারতের অনাগত যুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একখানি চিত্র ইহাতে অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

...

বলা হইয়াছে, যে, "আনন্দমঠে মুসলমানকে জঘন্যভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে।" এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। 'আনন্দমঠে' কোন প্রসিদ্ধ চরিত্রের ভূমিকায় মুসলমানকে নামান হয নাই। সুতরাং মুসলমানকে জঘন্যভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, একথা ঠিক নহে। যাহা হইয়াছে তাহা এই—পুস্তকে বর্ণিত কতকগুলি হিন্দু চরিত্রের মুখে মুসলমান সম্বন্ধে অসংযত ও অন্যায় কথা বলা হইয়াছে। উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রের মুখে যে সব কথা বলা হয়, তাহা অনেক সময় লেখকের নিজের কথা হয় না। 'আনন্দমঠে' মুসলমানদের সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহাও লেখকের নিজের কথা নয়।

...

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধটা কিরূপ ছিল, তাহারই একটা পরিচয় আমরা পাই। সে পরিচয়টা হয়ত এ যুগ হইতে বেশী পৃথক নহে। যাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ইতিহাস রচনা করিতে উদ্যত হইবেন, তাঁহারা হয়ত 'আনন্দমঠ' হইতে অনেক উপাদান পাইবেন। সে দিক দিয়া 'আনন্দমঠের' ঐতিহাসিক মূল্য বহু ইতিহাস অপেক্ষাও অনেক অধিক।

— বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ। রেজাউল করীম

কিন্তু, তা সত্ত্বেও কয়েকজন অর্বাচীন মুসলমান-সাহিত্যিক মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় এবং ব্রিটিশ শাসকের পরোক্ষ মদতে *আনন্দমঠ*-এর এক বহ্নুৎসব করেছিলেন প্রকাশ্যে। ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রেরণা-পুস্তকটিকে পুড়িয়ে ফেলে ব্রিটিশ-সরকাব ওই আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিল—যে-ভাবে তারা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত জনজীবনকে দাঙ্গার বীভৎসতায় ঠেলে দিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের নিরিখে বাংলাভাগ-তথা-ভারতভাগের সাফল্যে পৌঁছেছিল। ধর্মীয় মতিচ্ছন্নতায় মুসলমান-সাহিত্যিকরা এ-সব সাধারণ ব্রিটিশ-কৌশলগুলি বুঝতে পারেননি, বা বুঝতে চাননি।

অবশ্য, এ-জন্য *আনন্দমঠ*-এর পরোক্ষ প্রভাবও অস্বীকার কবা যায় না। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে সার্বিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় নিয়ে যেতে পারেননি। সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদকে হিন্দু-মুসলমানের অভিন্ন শত্রু হিসাবে চিহ্নিত না-করে তিনি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মুসলমানকে হিন্দুর শত্রু-রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। অবশ্য, এ-জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে একা দায়ী করে লাভ নেই। তিনি হিন্দু-মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের তৎকালীন মানসিকতা থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন। হিন্দু-জনসমাজের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর রচনার বিষয় হয়েছিল। এর ফলে মুসলমান-জনসমাজ ক্রমশই সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডেছিল। জন্ম হয়েছিল স্বতন্ত্র মুসলমান-জাতীয়তাবাদের ধারণা। সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী আন্দোলনেও প্রাথমিকভাবে তাদের অপাঙ্‌ক্তেয় রেখেছিল কংগ্রেস। মুসলমান-সাম্প্রদায়িক শক্তি *আনন্দমঠ*-কে উপলক্ষ করে যে-গ্রন্থভস্মের আন্দোলন শুরু করেছিল, তার বিষময় ফল আমরা এখনও ভোগ করছি। বিপরীতে *আনন্দমঠ*-এর অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম' গানটি একদিন যে-ভাবে স্বাধীনতাযোদ্ধাদের উদ্দীপিত করেছিল, আজও তা এ-দেশের একশো-কোটি মানুষকে সঞ্জীবনের প্রেরণা যোগায়।

বঙ্কিমচন্দ্র সঠিক আধুনিক অর্থে কোনও রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেননি। কিন্তু, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে একটি অমোঘ সামাজিক-ঐতিহাসিক উপাদান বহু-বিস্তৃত, তা হল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। এই সংকটময় টানাপোড়েনের সম্পর্কটি তাঁর উপন্যাসের একেবারে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবিশেষ গুরুত্বে গৃহীত। ভাবলে বিস্ময়বোধ হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন একটি নতুন ভাষা-ভাস্কর্য তৈরি করছেন, সৃষ্টি করছেন সাহিত্যের একটি অভূতপূর্ব ধারা, উপন্যাসশিল্প, তখনও তিনি সামাজিক ইতিহাসের একটি স্পন্দনকে গভীর গুরুত্বে রচনার বিষয় করেছেন। সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর কাছে নিছক শিল্পের দায় নয়, তাকে তিনি ঘোষিতভাবেই সমাজ ও মানুষের হিতার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর উপন্যাসে বিধৃত সময়সীমার (*দুর্গেশনন্দিনী*· ১৮৬৫, *সীতারাম*: ১৮৮৭) মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বা দ্বাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি থেকে একেবারে উনিশ শতক পর্যন্ত সময়কালকে উপন্যাসে আশ্রয় করেছেন। এই সময়সীমার মধ্যে

গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে তিনি নানা দৃষ্টিকোণ, নানা ঘটনা-প্রবাহ, নানা চরিত্র-সমারোহে বিস্তৃত করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই সময়সীমাটি এই সম্পর্কের টানাপোড়েনে, সংকটে, আলোড়নে, অবিশ্বাসে, আক্রমণে ক্রমশ জটিলতর হয়েছে। *দুর্গেশনন্দিনী*-র কাহিনি-সূচনা ৯৯৭ বঙ্গাব্দে, *রাজসিংহ* ও *সীতারাম* উপন্যাসের বিস্তার ঔরংজেবের রাজত্বকালে, *আনন্দমঠ* বিন্যস্ত হয়েছে মিরজাফর-ক্লাইভের শাসন-সময়ে। এই সময়সীমায় বঙ্কিমচন্দ্র সূচনায় (*দুর্গেশনন্দিনী*) দুই সম্প্রদায়ের নিকটবর্তিতার সামান্য কল্পলোক গড়তে চাইলেও, পরে তিনি আর সেই চেষ্টা করেননি। আসলে, তাঁর উপন্যাসগুলি কখনওই জনজীবনকে আশ্রয় করেনি, যে-জনজীবনে হাসেম শেখ ও রামা কৈবর্ত-র সুষ্ঠু সহাবস্থান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তার বদলে তাঁর সব উপন্যাসেই শাসক ও শাসিতের সম্পর্কটিই গ্রহণ করেছেন। বাঙালিকে কেবল হিন্দু-বাঙালি রূপেই বিবেচনা করেছেন। অবশ্য, এখানে এ-কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সাহিত্য যখন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দৈব-ভাবনা ছেড়ে মানুষের কথা বলা শুরু করেছে, তখনও রাজন্য শ্রেণিই শাসন করেছে সাহিত্যের পৃষ্ঠা। আর, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শ্রেণি-সীমায়ন অতিক্রম করে হাসেম শেখ বা রামা কৈবর্ত-র কথা যতটুকু বলেছেন, বলার চেষ্টা করেছেন, তাতেই আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সীমাবদ্ধতার কথা ভাবতে গেলে আমাদের মনে রাখা ভাল যে, তিনি এক পঙ্গু ইতিহাসের, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সন্তান—যে-ইতিহাস বা রাষ্ট্রশক্তির তিনি ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক নন।

বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবীচৌধুরাণী* (১৮৮৪) উপন্যাসটিও হিন্দুত্বের পবাকাষ্ঠায় পরিপূর্ণ। অনুশীলন তত্ত্বের নিরিখে তিনি নিজে এই উপন্যাসটিকে '*The substance of Religion is Culture*', '*The Fruit of it the Higher life*' এবং '*Man becomes more and more religious*' ইত্যাকার ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ ফল বলে বর্ণনা করেছিলেন। অবশ্য, এই ধর্মীয় আবেগেব সঙ্গে একটি বাস্তব কারণও নিহিত ছিল এই উপন্যাস-বচনার। সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *বঙ্গদর্শন* তখন প্রায় মুমূর্ষু-দশায়। বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন*-এ এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে পত্রিকাটির পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১২৮৯ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রকাশের পর *বঙ্গদর্শন*-এর প্রকাশ বন্ধ ছিল। পরে ১২৯০ কার্তিক সংখ্যা থেকে মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত বেরিয়ে পত্রিকার প্রকাশনা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে *দেবীচৌধুরাণী*-র দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৪) উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে বের হয়। আচার্য যদুনাথ সরকার উপন্যাসটিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> *...যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ 'দেবীচৌধুরাণী'র সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য। খাঁটি বাঙ্গালীরাও ডাকাতি করিত। চলনবিলের ধারে একটি গ্রামের এক বিখ্যাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশের পুরুষেরা নৌকাযোগে ডাকাতি করিতে করিতে যে নিজের নূতন*

জামাইকে হত্যা করেন এবং তাহার অনুতাপে ঐ পাপ-ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন, তাহার কথা রাজসাহী পাবনা জেলায় লোক-প্রসিদ্ধ।

বস্তুত, *দেবীচৌধুরাণী*-র প্রেক্ষিত ওয়ারেন হেস্টিংসের গভর্নর হওয়ার সময়কালে বিস্তৃত। ওয়ারেন হেস্টিংস শাসনভার গ্রহণ করেন ১৭৭২ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র সে-সময়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। এই সময়সীমায় বিদ্রোহের বিষয়টি স্থাপন করে তিনি দেশের অরাজক অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে তখন নবাবি শাসন অস্তমিত, অন্যদিকে ব্রিটিশ-শাসনও সুপ্রতিষ্ঠ হয়নি। এই বৃহত্তর প্রেক্ষিতে তিনি একটি পারিবারিক কাহিনির মাধ্যমে অনুশীলন তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। গৃহ-বিতাড়িত বধূ প্রফুল্লর দেবীচৌধুরানিতে পরিণত হওয়া, ভবানী পাঠক নামে এক দেশদ্রোহী, ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-ডাকাতের শিক্ষায় দেবীচৌধুরানি হয়ে ডাকাতদলের নেতৃত্ব দেওয়া থেকে শুরু করে গীতার নিষ্কাম তত্ত্ব অনুধাবন করার পর যাবতীয় ঐশ্বর্য হেলায় ত্যাগ করে ফের স্বামীর ঘরে এসে কূলবধূ হয়ে পুকুরঘাটে বসে বাসন মাজার মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর তত্ত্ব ও কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রক্ষণশীল হিন্দুত্বের প্রবক্তা-রূপে যতটা সফল, ঔপন্যাসিক হিসাবে ততটা নয়।

সীতারাম (১৮৮৭) উপন্যাসের শুরুতেই তিনি ফের উগ্র হিন্দুয়ানির প্রকাশ ঘটান। এখানে তিনি 'হিন্দু, উত্তরবাটী কায়স্থ' গঙ্গারামের উপর মুসলমান-শাসকগোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। আমরা অংশটুকু উদ্ধার করতে পারি :

সে কালে মুসলমান ফকিরেরা বড় মান্য ছিল। খোদ আকবর শাহ ইসলাম ধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়াও একজন ফকিরের আজ্ঞাকারী ছিলেন। হিন্দুরা ফকিরদিগকে সম্মান করিত, যাহারা মানিত না, তাহারা ভয় করিত। গঙ্গারাম সহসা ফকিরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহস করিল না। বলিল, "সেলাম শাহ সাহেব। আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িলেন না, কোনও উত্তরও করিলেন না।—গঙ্গারাম জোড়হাত করিল, বলিল, "আল্লা তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন, আমার বড় বিপদ। আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িলেন না। গঙ্গারাম জোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকির কিছুতেই নড়িলেন না, কথাও কহিলেন না। অগত্যা গঙ্গারাম তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল ; বোধহয়, সেটুকু ফকিরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া করিরাজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফকিরও গাত্রোত্থান করিলেন—কাজির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

...

...এমন সময়ে দুই জন পাইক, ঢাল-সড়কি-বাঁধা—আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল।

পাইকেরা জাতিতে ডোম, গঙ্গারাম তাহাদিগের স্পর্শে বিষণ্ণ হইল। সভয়ে দেখিল, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ্ সাহেব। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইতে হইবে? কেন ধর?—আমি কি করিয়াছি?"

শাহ সাহেব বলিলেন, "কাফের! বদ্‌বখত্! বেতমিজ! চল্!"

একজন পাইক ধাক্কা মারিয়া গঙ্গারামকে ফেলিয়া দিল। আর একজন তাহাকে দুই চারিটা লাথি মারিল। একজন গঙ্গারামকে বাঁধিতে লাগিল, আর একজন তাহার ভগিনীকে ধরিতে গেল। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। যে প্রতিবাসীরা সঙ্গে ছিল, তাহারা কে কোথা পলাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজির কাছে লইয়া গেল। ফকির মহাশয় দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে হিন্দুদিগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অতি দুর্বোধ্য ফারসী ও আরবী শব্দ সকল সংযুক্ত নানাবিধ বক্তৃতা করিতে করিতে সঙ্গে গেলেন।

গঙ্গারাম কাজি সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। ফরিয়াদী শাহ সাহেব—সাক্ষীও শাহ সাহেব এবং বিচারকর্ত্তাও শাহ সাহেব। কাজি মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ফকিরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, কোবাণ ও নিজের চশমা এবং শাহ সাহেবের দীর্ঘবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুর সম্যক সমালোচনা করিয়া, পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল। যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "যা হইবার তা ত হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। তোবা তোবা বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন।...পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল...এবং ঘুষি. কিল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল... পরদিন তাহার জীয়ন্তে কবর হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র *সীতারাম* উপন্যাসের শুরুতেই এইভাবে সমকালীন মুসলমান-শাসকশ্রেণির হিন্দু-অত্যাচারের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় লেখেন। এবং, এই সূত্রপাতই যে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু, তা আমরা সকলেই জানি। এই অহেতুক অত্যাচারের পরিণতি-স্বরূপ যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে উপন্যাসে। *সীতারাম* উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ-চরিত্র পরিহার করেছেন। উপন্যাসের নায়ক সীতারামকে লডতে হয়েছে মুসলমান-শক্তির সঙ্গে। সীতারামের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে মুসলমান-শক্তির আঘাতে। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের পরাভবের কারণ হিসাবে তার চারিত্র্যকেও দায়ী করেছেন। বস্তুত, বিরোধী মুসলমান-শক্তির প্রাচুর্যই তার পরাজয়ের কারণ। কিন্তু, ওই বাস্তব কারণ উপেক্ষা করে বঙ্কিমচন্দ্র তাত্ত্বিক কারণের উপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন। ব্যক্তির প্রণয়-পিপাসা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অধর্ম-রূপে বিবেচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও স্বাদেশিকতার অবলম্বন করেছেন ধর্মকে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যেন

এখানে সম্পূর্ণ ধর্ম-প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ইংরেজের বদলে মুসলমানকেই শত্রুর ভূমিকায় রেখেছেন।

উপন্যাসেব প্রথম সংস্করণের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন একেবারে সরাসরি। চাঁদশাহ ফকিরের উপদেশাংশটি তিনি অবশ্য পরবর্তী সংস্করণ থেকে বাদ দেন। প্রথম সংস্করণে ছিল : "*এখন যাও জয়ন্তী। প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিনী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুই জনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সম্পন্ন কর।*" অন্যদিকে, উপন্যাসের অন্তিমে সীতারামের '*মুসলমান কণ্টক কাটিয়া বৈরীশূন্যস্থানে উত্তীর্ণ হওয়া*' এবং চাঁদশাহ ফকিরের উক্তি "*যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর ফকির না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে*' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সূচনায়ই বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসের যে-সম্ভাব্যতা চিত্রিত করেছেন, তা গোটা ঘটনা-প্রবাহকেই নিযন্ত্রণ করে। আমরা দেখি, গঙ্গারামের কবরস্থলে সীতারাম তার পরিত্যক্ত স্ত্রী শ্রী-র আকুল ডাকে সাড়া দিয়ে শ্রী-র ভাই গঙ্গারামকে মুসলমান-শক্তির কবল থেকে মুক্ত করার প্রণোদনায় ঘটনাস্থলে আসে। অবশ্য, তাঁর সেই আসা আত্মীয়তার টানে নয়, "*হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?*"—এই ধর্মীয় প্রেরণায়। শেষপর্যন্ত গঙ্গারাম অনিবার্য মৃত্যুকবল থেকে পালাতে পারলেও সামাজিক পরিণতি হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। সমবেত হিন্দু ও মুসলমান-জনতা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িক আক্রোশে। 'বন্দেমাতরম' আর 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে উঠল। সেই তথাকথিত ধর্মযুদ্ধের প্রেরণাদাত্রী হয়েছে শ্রী। বঙ্কিমচন্দ্র ধ্রুপদী ভাষায় সেই বীভৎসতার গৌরবাত্মক চিত্র আঁকেন :

> *মহামহীরূহের শ্যামল পল্লাবরাশিমণ্ডিতা চণ্ডীমূর্তি দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া বাম হস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে "মার! মার! শত্রু মার!"—অঞ্চল ঘুরিতেছে, অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে—দৃপ্ত পদভরে যুগল শাখা দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমাময় দেহ উঠিতেছে নামিতেছে—যেন সিংহবাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে। যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন, "মার! মার! শত্রু মার!" শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, বিরাম নাই—কেবল ডাকিতেছে, "মার—শত্রু মার।"*

এত করেও কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন না বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর, বা সীতারামের, হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন ভেঙে যায়। নারী-আসক্তিতে গঙ্গারাম বিশ্বাসঘাতকতা করে, সীতারামও কাঙ্ক্ষিত জয়কে দূরে ঠেলে দেয় নারী-বাসনায়। আমরা দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র যাঁদের বৃষস্কন্ধে হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা আসলে রণব্যর্থ প্রবল প্রেমিক!

পাশাপাশি চাঁদশাহ ফকিরের চরিত্রটি সৃষ্টি করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কেন্দ্রীয় ভাবনার তত্ত্বটির যেন বিরোধিতাও করতে চান। ধর্মীয় আবেগসর্বস্বতা ও যুক্তিবাদের দ্বন্দ্বেরই

প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি ওই চরিত্রটির মাধ্যমে। উপন্যাসের শুরুতে আমরা যে-ফকিরকে দেখেছি, কেবল তার বিপরীতেই নয়, সামগ্রিক মুসলমান-বিরোধিতার পাশে এই চরিত্রটির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বজনীন মানবধর্মের কথাই বলেন। *আনন্দমঠ* বা *সীতারাম*-এর ধর্মান্ধতার পাশে এই চরিত্রটি, তুলনায় সংক্ষিপ্ত ও প্রান্তিক হলেও, তা বঙ্কিমচন্দ্রের তথা তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মানসিক দ্বন্দ্বই পরিস্ফুট করে। আমরা বুঝতে পারি, এই দ্বন্দ্ব আসলে সময়ের দ্বন্দ্ব, যে-দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্রও আলোড়িত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে যাঁরা 'সাম্প্রদায়িক' বলে চিহ্নিত করতে চান, এইসব দ্বন্দ্বের গভীর আলোড়ন তাঁদের চোখে পড়ে না। দুর্ভাগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, আমাদের।

রবীন্দ্রনাথ : পথের শেষ কোথায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মারা গেলেন ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র। রবীন্দ্রনাথ তখন ৩২-বছরের যুবক। ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছেন *বউঠাকুরানীর হাট* (১২৮৮-৮৯), *রাজর্ষি* (১২৯২)-এর মতো উপন্যাস। ১৩০৮ সালে লিখলেন তাঁর অন্যতম উপন্যাস *চোখের বালি।* বস্তুতপক্ষে, আমরা লক্ষ করি, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ধারাটি সূচিত করে, ক্রমান্বয়ে তেরোটি উপন্যাস লিখে যেখানে শেষ করলেন, রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন একেবারে সেখান থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে বিধৃত করেছিলেন ঐতিহাসিক-রোমান্স, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে আশ্রয় করলেন সমাজ-বাস্তবতা। বঙ্কিমচন্দ্র *বিষবৃক্ষ* বা *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের মাধ্যমে এই ধারাটির বীজবপন করেছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ সেই চারাটিতে জলসিঞ্চন করলেন। উপন্যাস লেখার পাশাপাশি তিনি ছোটগল্পের একটি প্রবাহ লিখে দিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। পাশাপাশি লিখলেন অসংখ্য বিবিধ-বিষয়ী প্রবন্ধ, কবিতা ও গান। এই সবকিছু কিছুটা পাশে সরিয়ে রেখে আমরা লক্ষ করব তাঁর কথাসাহিত্য কীভাবে সামান্য পরিসরেই অসামান্য ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ করেছে বাঙালি-হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিল টানাপোড়েন।

আমরা জানি, বাঙালির চিন্তা-চেতনায় রবীন্দ্র-আধিপত্য এতটাই সর্বাত্মক যে, কোনও সঙ্কীর্ণ আলোচনার প্রেক্ষিতে তাঁকে সীমায়িত করা যায় না। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে তিনি যে অনেক লিখেছেন, তা নয়। কিন্তু যতখানি লিখেছেন, তা আমাদের বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে। আপাতভাবে, রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে মুসলমান-চরিত্র স্বল্পদৃষ্ট হলেও, ঈষৎ ইসলাম-অমনস্কতা দর্শিত হলেও, যে-কোনও রবীন্দ্র-আলোচনায়ই এ-সব শ্যেনদর্শন বস্তুতই খুব অবান্তর হয়ে যায় তাঁর সামগ্রিকতার প্রাবল্যে।

ব্যক্তিগত জীবনে ঔপনিষদিক ব্রাহ্মবাদী হওয়ায় তাঁর কেন্দ্রীয় ধর্মচিন্তা চূড়ান্ত জীবনধর্মে, মানবধর্মে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভবত অনিবার্য ছিল। *ধর্মপ্রচার, ধর্মশিক্ষা, ধর্মের অধিকার, ধর্মের অর্থ, ধর্মের নবযুগ* ইত্যাকার প্রবন্ধে তাঁর যে-ধর্মবোধটি সুগভীর তাৎপর্যে মহিমময় হয়ে ওঠে, তা তো বস্তুতই জাতি-সম্প্রদায়-আচার-অর্চনাকেন্দ্রিক বিভাজিত কোনও বিচ্ছিন্ন ধর্মভাবনা নয়। তা এক অখণ্ড মানবধর্ম। কারণ তিনি জানতেন, '*সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী? সোনার চেয়ে হয় ধূলা সহজ*'—সে-ধূলা রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন হতে পারে না। ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত দুই পরধর্ম জ্যোতির্ময় পুরুষের কথা স্মরণ করতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি লিখেছেন :

> *যীশু যখন বাহ্য অনুষ্ঠানপ্রধান ধর্মকে নিন্দা করিয়া ধর্মের বার্তা ঘোষণা করিলেন তখন য়িহুদিরা তাহা গ্রহণ করেন নাই। তবু তিনি নিজের গুটিকয়েক অনুবর্তীমাত্রকেই লইয়া সত্যধর্মকে নিখিল মানবের ধর্ম বলিয়াই প্রচার*

করিয়াছিলেন। তিনি এ-কথা বলেন নাই এ-ধর্ম যাহারা বুঝিতে পারিতেছে তাহাদেরই, যাহারা পারিতেছে না তাহাদের নহে। মহম্মদের আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়রা যে তাহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন নাই, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ তাহাই তোমাদের ধর্ম, তোমরা বাপ দাদা ধরিয়া যাহা মানিয়া আসিয়াছ তাহাই তোমাদের সত্য। এ-কথা বলিলে উপস্থিত আপদ মিটিত কিন্তু চিরকালের বিপদ বাড়িয়া চলিত।

বাংলা-ভাগাভাগির পরে রবীন্দ্রনাথ এই 'চিরকালের বিপদ'টি আরও বেশি করে উপলব্ধি করেছিলেন। এ-সময় তিনি *ব্যাধি ও প্রতিকার* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তাঁর মানসিক আলোড়নের প্রকাশটি খুব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইতেছে। এইবার প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে। সেটা এই যে, আমরা যতই গভীর রূপে বেদনা পাই না কেন সে বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেন্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। গবর্মেন্ট আমাদের হইতে যে কতদূর পর তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই।

...

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্‌কার দিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে ; এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি নাই।

অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই শয়তান

যখন উগ্রমূর্তি ধরিয়া ওঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানটাতে কতবড়ো যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।

পরিচয় তো পাইলাম, কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা করিতেছি না। যাহা আমরা কোনো মতেই দেখিতে চাই নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন ; তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল, অপমান ও দুঃখের একশেষ হইল—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই থাকিবে।

আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি ; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধে মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারে না।

আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।

মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত—যাহারা সামান্য স্খলনেই আপনার লোককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ করিতে

জানে না—সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য শিষ্টতার নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে—মানুষের সংসর্গ নানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয়—মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্বল হইতেই হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন নিষ্কৃতি পাইবে না।

যাহা হউক, 'বয়কট'-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম : মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যত-কিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল। আমরা নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক, এ কথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে, কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজেদের পাপ হইতে।

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপর এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে, সে কি কেবল নিজের জোরে। আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।

হিন্দু-মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এ স্থলে মুখে আনিবার নহে ; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভালো চলে, কিন্তু সেইটেই দুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যকর নহে। আসল কথা, আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম। আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান—আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশত, শুধু সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্ব ধিক্। আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।

এই জন্য অদ্যকার অত্যন্ত উত্তেজনার দিনেও আমাকে এ কথা বলিতে হইতেছে যে স্পর্ধা করিবার, লড়াই করিবার দিন আজ আমাদের নহে। স্পর্ধা করাটা শক্তিমানের পক্ষে একটা বিলাসের স্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু অশক্তের পক্ষে তাহা দেউলে হইবার পন্থা। যে শক্তি তাহাতে অপব্যয় হয় তাহা খরচ করিবার সম্বল আমাদের আছে কি। শুধু তাই নয়, যে হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এতটা আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে হিসাবটা কি ভালোরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। যে নৌকায় কোনমতে ভর সয় মাত্র সে নৌকায় নৃত্য করিতে শুরু করিলে যদি তাহার ফাটাগুলা দিয়ে জল উঠিতে থাকে তবে সেটাকে আমরা এমন অভাবনীয় বলিয়া মনে করি কেন। এই নৃত্যব্যাপারে আমি আপত্তি করিতে চাই না, কিন্তু ইহাই যদি আমাদের অভিপ্রায় থাকে তবে একটু সবুর করিয়া অন্তত ঐ ফাটাগুলো সারাইয়া লইতে হইবে তো?—তাহাতে বিলম্ব হইবে। তা হইবে বটে। কিন্তু জগতের মধ্যে আমরা এমন পুণ্য করি নাই যে, ভাঙা আসবাব লইয়া কাজও করিব, দুর্লভ ধন লাভও করিব, অথচ বিলম্বও ঘটিবে না।

তবে করিতে হইবে কী। আর কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন আর নূতন দলই হউন, যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে, দেশের ভার তাঁহারা লইতে পারেন। তাঁহাদের মত কী সে তো বারংবার শুনিয়াছি, তাঁহাদের কাজ কী কেবল সেইটেই দেখা হইল না। দেশের সমস্ত সামর্থকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর দান করিতে না পারি, যদি সেইখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনো প্রকার কর্মনীতি ও কর্মসংকল্প না থাকে, তবে আজিকার এই আস্ফালনকাল আমাদিগকে নিষ্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে।

যদি সকলে মিলিয়া একটা কাজের আয়োজন গড়িয়া তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না হইয়া থাকে তবে অগত্যা আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা অসময়ে ঔদ্ধত্য করিতে থাকি সেই বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ক্ষেত্র একেবারে নষ্ট হয়। গর্ভিণীকে সমস্ত অপঘাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া সাবধানে চলিতে হয় সেই সতর্কতা ভীরুতা নহে, তাহা তাহার কর্তব্য।

হিন্দু-মুসলমানেব সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা রচনায় গভীর-ভাবিত হয়েছেন, আমরা দেখেছি। কোনও ক্ষেত্রে মুসলমান-নারী-পুরুষ-তথা-মুসলমান-সম্প্রদায় তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। *মুসলমান মহিলা*, *ইংরাজ ও ভাবতবাসী*, *ইংরাজের আতঙ্ক* ইত্যাদি নানা প্রবন্ধে তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান-সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

অন্যদিকে, *হিন্দু ও মুসলমান* নামে একটি প্রবন্ধে তিনি সরাসরি ইতিহাসের নিরিখে আলো ফেলেছেন দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দু-মুসলমানে সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা। অন্য-দেশের কথা জানি না কিন্তু বাংলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশিসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আজকাল এই সম্বন্ধ ক্রমশ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলমান বলিতেছিলেন বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত নিতান্ত ভালোভাবে মেশামিশি করিতেন। তাঁহাদের মা-মাসিগণ ঠাকুরানীদের কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারুর শলাকার মতো আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন, কাহারো কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। হঠাৎ বাবুর বাবুয়ানীর মতো তাঁহাদের হঠাৎ হিঁদুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজে পত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাংলা শিখিতেছেন এবং বাংলা লিখিতেছেন—সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ হইতে ইঁট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় তুর্কীর সুলতান তিনশত পাচক রাখিয়াছেন, ইহা লইয়া ম্লেচ্ছদিগকে তিরস্কার ও হিঁদুয়ানির বড়াই করিয়া আপন পাড়ার প্রতিবেশীদের সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিলে তাহাতে হিন্দুদের মাহাত্ম্য নহে, পরন্তু ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দেওয়া হয়। যদি আমাদের ধর্মের এমন কোনো গুণ থাকে যাহাতে আমাদের পুরাতন পাড়ার লোককেও আপন করিয়া লইতে বাধা দেয় তবে সে ধর্মের জন্য অহংকার করিবার কারণ কিছুই দেখি না।

— সাধনা, চৈত্র ১৩০১

অন্যদিকে *মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা* নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখ দুঃখ নানা সূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছোটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙালি হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভালো করিয়া পালন করিতে পারিবে না।

—ভারতী, কার্তিক ১৩০৭

ওই প্রবন্ধের অন্য অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

সম্প্রদায়গত পক্ষপাতের হাত একেবারে এড়ানো কঠিন। য়ুরোপীয় ইতিহাসের অনেক ঘটনা ও অনেক চরিত্রচিত্র প্রটেস্টান্ট লেখকের হাতে একভাবে এবং রোমান ক্যাথলিক লেখকের হাতে তাহার বিপরীতভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। য়ুরোপের দুই সম্প্রদায়ের বিদ্যালয় অনেক স্থলে স্বতন্ত্র, সুতরাং ছাত্রদিগকে স্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কথা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয় না। কিন্তু ইংরাজ লেখকের সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কার আমরা শিরোধার্য করিয়া লইতে বাধ্য, এবং সেই-সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো বাংলা বই রচিত হইলে তাহা কোনো বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইংরাজ লেখকেরই মত বাংলা বিদ্যালয়ের আদর্শ মত—সেই মত অনুসারে পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা পরীক্ষার নম্বরেই দেখা যাইবে সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

...

সৈয়দসাহেব (সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী) বাংলা সাহিত্য হইতে মুসলমান বিদ্বেষের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসংযত জ্ঞান করি। বঙ্কিমবাবুর মতো লেখকের গ্রন্থে মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। থ্যাকারের গ্রন্থে ফরাসি-বিদ্বেষ পদে পদে দেখা যায়, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যপ্রিয় ফরাসি পাঠক থ্যাকাবের গ্রন্থকে নির্বাসিত করিতে পারেন না। আইবিশদের প্রতি ইংরাজের বিরাগ অনেক ইংবাজ সুলেখকেব গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ-সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনার বিষয়। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দার্হ তাহা সমালোচক-কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোনো সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনোরূপে ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।

—প্রাগুক্ত

অন্যত্র, প্রবাসী কালিদাস নাগকে একটি চিঠিতে, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃস্টানধর্মাবলম্বীদেব সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন, তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে অপরধর্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা

দেয় না। য়ুরোপ আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। 'য়ুরোপীয় বৌদ্ধ', বা 'ইউরোপীয় মুসলমান' শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ, ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। 'মুসলমান বৌদ্ধ' বা 'মুসলমান খৃস্টান' শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপরপক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-cooperation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভাবতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল ; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?

—শান্তিনিকেতন পত্র, শ্রাবণ ১৩২৯

দুই সম্প্রদায়েব, হিন্দু ও মুসলমানের, এই রুদ্ধ দ্বারে বারবাব করাঘাত করতে চেযেছেন ববীন্দ্রনাথ। বারবার খতিয়ে দেখতে চেযেছেন এর অন্তর্গত কারণাকারণ। 'নেশন' শব্দটি যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ফলাফল, তা বিশ্বাস করতে চেয়েও বারবার দ্বন্দ্বে পডেছেন বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে, অভিজ্ঞতাব বেদনায়। 'সমস্যা' নামে একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছেন :

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত, আমরা কি নেশন না নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতুম তা বলতে পারি নে, কিন্তু আমরা নেশন নই এ কথা যে মানুষ বলত রাজা হলে তাকে জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোপা নাপিত বন্ধ করতুম। ...তখন এ সম্বন্ধে একটা বাঁধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজারল্যান্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে তবুও তো তারা এক নেশন, তবে আর কী।...সুইজারল্যান্ডে

ভেদ যতগুলোই থাক, ভেদবুদ্ধি তো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই—ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্‌বেগে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হর্‌তাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীরে আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না।

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

এখানেই থামেননি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মনীষা তাঁকে বুঝিয়েছিল দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক আসলে তুচ্ছ অহংবোধের উপর নির্ভর করে রয়েছে—হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে তিনি এক গভীর সমস্যা রূপেই দেখেছিলেন, চিহ্নিত করেছিলেন :

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য, তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমানির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করেছে—আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। ...

হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম-দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই-যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারিদিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সংকীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে. এইজন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্য বিধান, কৃত্রিম প্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।

—প্রাগুক্ত

রবীন্দ্রনাথ ভাষাগত বিভেদের দিকেও তর্জনী তুলেছিলেন। তিনি বারবার বোঝাতে চেয়েছেন ভাষা ধরে থাকে মানুষের সংস্কৃতি, প্রাণ আর প্রেমকে। ভাষা কোনও ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি মানে না। মাতৃভাষা আর মা আলাদা কিছু নয়। মানুষ যখন নিজের মানুষকে পরিত্যাজ্য করে কোনও ঐহিক বা পারমার্থিক লাভালাভের কথা মনে করে, তখন সে আসলে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের বশে মাকেও ত্যাগ করে বসে। বাঙালি মুসলমানের

নিজস্ব ভাষা বাংলার পরিবর্তে যখন তাদের উপর উর্দু চাপাবার একটি প্রয়াস কেন্দ্রীভূত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন নীরব থাকতে পারেননি। ভাষা যে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে, তা অনুধাবন করে তিনি *সাহিত্য সম্মেলন* প্রবন্ধে লিখলেন :

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি। চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনাভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানের খর্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্বতা ঘটে যদি জবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা হয়, তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলাভাষাতে তাঁহারা মুসলমানি মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরও জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলাভাষার মধ্যে তো সেই উপাদানের কম্‌তি নাই—তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই তো। যখন প্রতিদিন মেহন্নৎ করিয়া আমরা হয়রান হই, তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে। যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ত তাহার হিন্দু জমিদারের প্রতি আল্লার দোয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দুহৃদয় স্পর্শ করে না। হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া, ঝগড়া করিয়া, যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই ভালো হয়। বিষয়সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষা-সাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রস্তাব কখনও চলে।

—শান্তিনিকেতন পত্র, ফাল্গুন, ১৩৩২

ঢাকা মুসলিম হলে ১৩০৩ সালে এক অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখে নিতান্ত দুঃখিত, মর্মাহত, লজ্জিত হই। ধর্মে ধর্মে বিরোধ হতে পারে না। কারণ ধর্ম হল মিলনের সেতু আর অধর্ম বিরোধের। আমাদের অপরাধ স্বীকার করতে হবে, আমরা ধর্মের অবমাননা করেছি বিরোধ করে। সকল ধর্মই বিচ্ছেদের কলুষে কলঙ্কিত হয়েছে, সে জন্য লজ্জিত হতে হবে। ধর্ম যেখানে আছে, এতটুকু আত্মসম্মান যেখানে আছে, সেখানে এত বিরোধ কখনো বিশ্বাস করা যেতে পারে না।

—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৩

অন্যত্র তিনি লিখেছেন :

যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ।

...

যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি বয়কট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালারা নির্মমভাবে তাঁদের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হননি। সেই সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালি মুসলমান সে দিন আমাদেব থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই ভুলেই বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল। অপরাধটা প্রধানত কোন্ পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে, সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে বাঙালিজাতের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল।

—প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথের এইসব সবিস্তার মনীষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর কয়েকটি উপন্যাসাংশ, কযেকটি ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ সার্বিক বিচারে কবি হলেও, সৌন্দর্য-নিসর্গ-উপনিষদের ভাববাদে নিয়ন্ত্রিত হলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনার ক্ষেত্রে, সঠিক অর্থে তিনিই ছিলেন ভারতীয় রাজনীতিবিদদের অগ্রদূত। বস্তুত, গান্ধীজির আগেই তিনি 'জনসমাজ' বা সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ খুব কাছ থেকেই সামাজিক বিন্যাসগুলি লক্ষ করেছিলেন, অনুধাবন করেছিলেন। গোটা উনিশ-শতক-বিস্তারী ধর্মীয় জিজ্ঞাসা, সংশয়-তথা-সংঘাতকে তিনি যেমন বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, তেমনই সমাজবাস্তবতার চিত্রটি আঁকার প্রয়াস করেছিলেন কয়েকটি উপন্যাসে। বিশেষত *গোরা* উপন্যাসে এই ভাবনার প্রকাশ আমরা লক্ষ কবেছি। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সভ্যতা এবং সমাজে তার প্রভাব ও সদর্থকতাকে কখনও অস্বীকার করেননি। কিন্তু, শিলাইদহে জমিদারি সামলাতে গিয়ে কিংবা শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতায় তাঁর মধ্যে একটি বিপরীত বোধোদয়ও হয়েছিল যে, ওইসব পাশ্চাত্য আলো সমাজের অন্তস্তলে বিন্দুমাত্র প্রবেশ করেনি। তিনি বুঝেছিলেন, শিক্ষিত বাঙালির চিন্তা ও সক্রিয়তার সঙ্গে বৃহত্তর জনসমাজের কোনও যোগ নেই। এমনকী, স্বদেশি আন্দোলনের নানা উন্নাসিকতা ও সীমায়ন তাঁব চোখ এড়ায়নি। ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন,

বৃহত্তর জনসমষ্টিকে বাদ দিয়ে তথাকথিত 'সিভিল সোসাইটি' কখনও সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারত, আধুনিক ইউরোপ, ইংরেজ ঔপনিবেশিকতা—কোনটি যে আধুনিক ভারতের আদর্শ হতে পারে, তা সঠিক অনুধাবন করতে পারেননি। কিন্তু, তিনি জমিদারি পরিচালনায় কিছুটা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ, কিংবা শান্তিনিকেতনে সনাতন ভারতের আদর্শ আরোপ করে একটি নতুনতর পথের সন্ধান-অভিপ্রায়ী হয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর সেই কল্পস্বর্গের প্রয়াস যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে, তা বলা মুশকিল।

অবশ্য, তাতে খুব-কিছু আসে-যায় না। তিনি যে নিজের মতো করে ব্যক্তিগত উদ্যোগটি অন্তত নিয়েছিলেন, তা-ই বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই অনুধাবন করেছিলেন, ইউরোপের আদলে রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এ-দেশের, এ-সমাজের মুক্তি নেই। জনসমাজ-বিচ্ছিন্ন রাজনীতিতে তিনি যুগপৎ সঙ্কীর্ণতা ও চরিত্রহীনতার আশঙ্কা করেছিলেন। রাজনীতি বা সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মকে বিজড়িত করা যে একধরনের বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি করতে পারে, তা-ও বুঝেছিলেন তিনি। বস্তুত, তিনি ব্যক্তি বা সমষ্টির পুনরাবিষ্কারে হিন্দুত্ববাদের যষ্ঠী-অবলম্বনে ছিলেন একেবারেই অনীহ। যুগপৎ তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন হিন্দুত্বের উচ্ছ্বাস এবং ইউরোপীয় প্রগতিবাদের মনীষা।

সাহিত্য-সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> *এ কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার স্পষ্ট করে বলেছেন, ভারত-ইতিহাসের মূলসূত্র রাষ্ট্র নয়, সমাজ। কোন সমাজ—না, বৃহত্তর প্রাচীন জনসমাজ। রাজা-রাজড়ার কাহিনীকে তিনি কোনদিনই ইতিহাসের প্রধান কাহিনী বলে মনে করেননি। তাই রাজনীতির ধারণাও ছিল তাঁর ভিন্ন : তিনি আহ্বান করেছিলেন রাজনীতিকদের গ্রাম পুনর্গঠনের আপাতনাটকহীন কঠিন ব্রতে, কারণ ভারতবর্ষের রাজনীতি ওখানেই নির্মিত হবে।...জনসমাজবিচ্ছিন্ন রাজনীতি যে ভারতীয় পটভূমিতে রাজনীতি হতে পারে না যথার্থ ও সঠিকভাবে, তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য কম নিন্দিতও হননি। তাঁর চিন্তার সঙ্গে অনেক গরমিল থাকলেও, এর একটা আভাস তিনি পরবর্তীকালে গান্ধীর মধ্যে দেখেছিলেন বলেই, গান্ধীকে মহাত্মা বলতে তাঁর আটকায়নি, আবার রাশিয়ায় গিয়ে যে তিনি ঈপ্সিতকে পান, তার মূলেও ঐ জনসমাজের জাগরণ, পুনর্নির্মাণের বিপুল প্রয়াস।*
>
> *—উপন্যাস রাজনৈতিক*

প্রসঙ্গত আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি অভিভাষণ মনে করতে পারি। ১৮০৯ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

> *কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে, তেমনি ব্রিটিশ শাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম সমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তারবশত ছোটো ব্যবস্থা যখন বড়ো ব্যবস্থায় পরিণত হয়*

তখন তাহাতে ভালো বৈ মন্দ হয় না—কিন্তু তাহার স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্য ব্যবস্থা ছিল, ছোটো হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল। ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়োই হউক তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে, তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিকমত করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনই ঠিকমত হইতে পারে না।

আর, এখান থেকেই বিভেদ তৈরি হতে থাকে সমাজে—সেই বিভেদ কখনও সামাজিক বা আর্থিক, প্রায়শই ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যে-গণসমাজ গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন, তা ছিল হিন্দু-মুসলমান-যৌথজনশক্তিসমৃদ্ধ। এই সূত্রে তিনি বাঙালি-জনসমাজে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, *"মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গিয়াছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই, দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।"* অন্যদিকে তিনি দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভেদটির দিকেও দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, *"ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি, সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত আছে।"* অন্যদিকে, *"অনেকস্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।"* সর্বোপরি, *"...রাজা যদি চেষ্টা করিয়া এই ভেদটা বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগা দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন।"*

এই সব বেদনাবিদ্ধ সামাজিক চিন্তা যে কেবল কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তাঁর প্রবন্ধাবলিতে, তা-ই নয়, উপন্যাস ও ছোটগল্পেও তিনি সমকালীন-তথা-চিরকালীন এই জ্বলন্ত সমস্যার পাশ কাটাতে পারেননি। সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র-পরবর্তী উপন্যাসধারা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা সেরে নিতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শেষ উপন্যাস *সীতারাম* লেখেন ১৮৮৭ সালে। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস *করুণা* লেখেন ১৮৭৭-৭৮ সালে। *ভারতী* পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ রচনাটির অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্পর্কে এতটাই অবহিত ছিলেন যে তিনি এটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেননি (*অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*)। প্রথম সার্থক উপন্যাসটি তিনি লেখেন মাত্রই বাইশ-বছর বয়সে। সেই উপন্যাসটি, *বউ-ঠাকুরানীর হাট*, প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। ক্রমশ উপন্যাসশিল্পটি তাঁর কেবল করায়ত্তই হয় না, তিনি হয়ে ওঠেন বাংলা উপন্যাসশাখার অন্যতম লেখক। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি স্তর-বিন্যাসে বিন্যস্ত করা যায় :

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস, দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস, বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস, মিস্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস ইত্যাদি।

আমরা লক্ষ করেছি, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লেখার সূচনায় বঙ্কিম-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাটিই গ্রহণ করেছিলেন। *বউ-ঠাকুরানীর হাট* (১৮৮৩), *রাজর্ষি* (১৮৮৭), এই ধারার উপন্যাস। দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাসের ধারায় তিনি লিখেছিলেন *চোখের বালি* (১৯০৩), *নৌকাডুবি* (১৯০৬), *যোগাযোগ* (১৯২৯)। বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস ধারায় রবীন্দ্রনাথ *গোরা* (১৯১০), *ঘরে বাইরে* (১৯১৫) এবং *চার অধ্যায়* (১৯৩৪) লিখে বাংলা উপন্যাসশিল্পকে সমৃদ্ধতর করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিভিন্ন-ধর্মী উপন্যাসগুলিতে রবীন্দ্রনাথ, কবি ও প্রাবন্ধিক-সত্তার ঊর্ধ্বে, নিজেকে উজ্জ্বলতব প্রতিভাত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে বা অনুপ্রেরণায় তিনি ইতিহাস-উপাদান-সমৃদ্ধ উপন্যাস লিখলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের সার্বিক প্রবণতার বাইরে বাংলা উপন্যাসকে ব্যক্তির জটিলতা, সমাজের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বেব প্রেক্ষিতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা আজও বাংলা উপন্যাসের অন্যতম অবলম্বন।

বাংলা উপন্যাসের সূচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, আর রবীন্দ্রনাথ সেই নির্মিত পথটিকে সুপ্রশস্ত কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত রোমান্স ও ইতিহাসধর্মী উপন্যাস লিখেছিলেন। এব পিছনে সামাজিক প্রযোজনের এক অনিবার্য চাপ ছিলই। ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন :

> *বাঙলা সাহিত্যে সার্থক ছোট গল্প যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন রবীন্দ্রনাথ, সার্থক উপন্যাসের সূচনা করিয়া গিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের দৃঢ় সুপ্রশস্ত রাজপথ কাটিয়া দিয়াছেন তিনিই। যে সূর্যালোকদীপ্ত বাস্তব জীবন, যে সংঘাত-বিক্ষুব্ধ জীবন ও সমাজ প্রবাহ এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মায়াঘন বর্ণচ্ছটার যে বিচিত্র সমারোহ, যে গীতধর্মী কাব্যময় ভাব ও বর্ণনোচ্ছ্বাস এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারণধর্মী সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এখনও পর্যন্ত আমাদের উপন্যাসের উপজীব্য তাহার সমস্তই সূচনা করিয়া গিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তবনিষ্ঠা রোমান্সের রামধনুর রঙে রহস্যমণ্ডিত অভিপ্রাকৃতের স্পর্শে অসাধারণ, বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিগূঢ় ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার উপন্যাস এই রহস্য ও অতি-প্রাকৃতের কল্পনায়, কাব্যের ঝঙ্কারে, সতেজ আদর্শবাদে এবং সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক সমারোহে রোমান্সধর্মী। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে য়ুরোপীয় এবং বাঙলা সাহিত্যেও ইহাই ছিল উপন্যাসের প্রকৃতি ; সামাজিক প্রয়োজনেই, সামাজিক বিবর্তনের ফলেই এই প্রকৃতির উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উত্তরাধিকার লইয়াই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-যাত্রার সূত্রপাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র নহেন, দুই মানসও বিভিন্ন ; রবীন্দ্রনাথের কাল বঙ্কিমচন্দ্রের কালও নয় ; বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমাজধর্মের চেতনাও এক নয়।*

বঙ্কিমচন্দ্রের কাল ও রবীন্দ্রনাথের কালের মধ্যে বাঙলা দেশে যে সামাজিক বিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা একবার দেখা যাইতে পারে। উনবিংশ শতকের শেষাশেষি বিংশ শতকের গোড়ায় বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ পুরাপুরি গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহার ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ, তাহার অন্তর্নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব, তাহার জীবনসংগ্রাম ইত্যাদি সমস্তই এই পঞ্চাশ বৎসরে অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে, তাহার জীবন-প্রবাহ একটি বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে এবং বেগবান তরঙ্গ মুখর সেই ধারাটি অন্যান্য শ্রেণীর বা সমাজ অংশের জীবনধারাকে ছাপাইয়া যাইতেছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানানসই প্রগতিশীল এবং সমাজের সকল প্রকার কর্মে ও প্রতিষ্ঠানে ইহাদেরই আধিপত্য; এই শ্রেণীই সামাজিক আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার নিয়ন্তা। বঙ্কিমের কালে মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রতিষ্ঠা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ভূমি-স্বত্বাধিকারী অভিজাত সমাজের প্রতিষ্ঠা তখনও অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু যে হেতু তাহাদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে ভূমি ও প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রিক বিধিব্যবস্থা অটুট রাখার উপর সেই হেতু তাহাদের মনোভাব ও আদর্শ রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী। এই সমাজ শ্রেণীর অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যানধারণা হইতে নিজেদের অনেকাংশে মুক্ত রাখিয়াছিলেন, স্বল্পসংখ্যক মুষ্টিমেয়, যে কয়েকটি পরিবার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই আদর্শ ও ধ্যানধারণার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহারা অভিজাত সমাজের লোক হইলেও তাহাদের মানস মধ্যবিত্ত সমাজাদর্শেই গঠিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই অভিজাত সমাজ-মানসের মধ্যে একদিকে যেমন প্রবল ছিল পৌরাণিক হিন্দু-সংস্কৃতির নাগরিক ও গ্রাম্য প্রকাশের ধারা, অন্যদিকে তেমনই ছিল সুদূর দিল্লী—আগ্রা-লক্ষ্ণৌ-পাটনায় নিম্নস্তরের ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতির ধারা, অবশ্য শেষোক্ত ধারা জীবনের দেউড়ি পার হইয়া অন্দরমহলে ততটা প্রবেশ করিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ প্রাচীন সামন্ত সমাজের স্মৃতি এই পঞ্চাশ যাট বৎসরে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। এই স্মৃতি বঙ্কিমের কালে বিকাশোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসকে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের কালে সেই স্মৃতির সেই জোর আর ছিল না।

—কবিতা, আষাঢ়, ১৩৪৮

এই পরিস্থিতিতেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে একটি মৌলিক তফাত তৈরি হয়েছিল। সামাজিক বিবর্তনই ঐতিহাসিক উপন্যাসকে একরূপ পরাভূত করল। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের ছবি ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের পরাভবে জেগে উঠল সামাজিক ও ব্যক্তিক নানা সমস্যা-সঙ্কুলতা, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সমারোহ—দ্বন্দ্ব, দৈন্য, রিক্ততা, বিষাদ, বিক্ষোভ ও হর্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতাভিত্তিক রোমান্টিকতায় উন্নীত হল—অতি-

প্রাকৃত আকস্মিকতার স্থানে এল ঘটনার বৈচিত্র্য ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও চরিত্রের বিস্তার। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স ছিল ঘটনাগত, বহির্বিস্তারী ; আর রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন চরিত্রগত এক অন্তর্মুখী রোমান্টিকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘটনা-বিস্তৃত বহির্মুখী আখ্যানে তার বিশেষ সুযোগও ছিল না। ব্যক্তির স্ফূর্তি বা হাহাকার ঐতিহাসিক রোমান্সের ঘনঘটায় চাপা পড়েই গিয়েছিল। কেবল ঐতিহাসিক উপন্যাসেই নয়, সামাজিক উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র এই অপারগতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কেননা, সেখানেও পূর্ব-নির্দিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্প উপন্যাসকে চালিত করেছে।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ যখন সামাজিক উপন্যাস লিখলেন, প্রথমদিকের কয়েকটি রোমান্সধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনার পরে, তখন তিনি এই পূর্ব-নির্দিষ্ট আদর্শের প্রভাব সম্পূর্ণ পরিহার করলেন। ব্যক্তিকে নিজের বিকাশের ধারায়, আত্মপরিচয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ওইসব উপন্যাসে। *চোখের বালি* এই ধারার প্রথম অনবদ্য সৃষ্টি। তা কেবল রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধারায়ই নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তা অভূতপূর্ব।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল ব্যক্তিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সংক্ষোভ-নিরাশার চিত্র এঁকেই পরিতৃপ্ত থাকতে পারেন না। সে-জন্যই তাকে লিখতে হয় *গোরা*-র মতো উপন্যাস। সমকালীন রাজনীতি-সমাজনীতির সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের *বউ-ঠাকুরানীর হাট* উপন্যাসটি মোগল-হিন্দু দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে রচিত হলেও, লেখক এখানে দুই পরস্পরবিরোধী, যুযুধান পক্ষকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই বিচার করেছেন—এখানে তিনি ঘুণাক্ষরেও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে চিহ্নিত করেননি দুই সম্প্রদায়কে। বরং, এই উপন্যাসে তিনি মোগল সম্রাটের বিপক্ষ প্রতাপাদিত্যকেই সমধিক সমালোচনা করেছেন। প্রতাপাদিত্যের সাম্রাজ্য-স্পৃহাকে রবীন্দ্রনাথ সুনজরে দেখেননি, তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি লেখার সময় নানা প্রতিকূল সমালোচনায় কণ্টকিত হয়েছিলেন। আমরা এই তথ্য জেনে বিস্ময়াভিভূত হই যে, মাত্রই বাইশ-বছর-বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন। সমকালে তিনি উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য সমালোচিত হলেও, পরে প্রমাণিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণই সঠিক ছিল। উপন্যাসশিল্প হিসাবে *বউ-ঠাকুরানীর হাট* সফল না-হলেও রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রগতিশীল মনোভাবের জন্যই উপন্যাসটি চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। *বউ-ঠাকুরানীর হাট*-এ রবীন্দ্রনাথ যদিও কোনওরকম কঠিন-কঠোর জাতীয়তাবাদের বশবর্তী হননি। কিন্তু, সে-সময়ে লেখা তাঁর কোনও প্রবন্ধে (*নববর্ষ*, ১৩০৯ বা *ব্রাহ্মণ*, ১৩০৯ শীর্ষক রচনায়) তিনি হিন্দু-জাতীয়তাবাদের সমর্থকই ছিলেন। তবে, তা আক্রমণাত্মক বা সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় আশ্রিত ছিল না কখনও। তাঁর কাছে হিন্দুত্ব ছিল উদার ভারতীয়ত্বেরই সমার্থক। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী। ১৩১৩ সাল থেকে তাঁর এই চিন্তা-রূপান্তর খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিন্দুত্বের

ঊর্ধ্বে জাতীয়তাবাদ, আর জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে মানবতার জয়যাত্রা সম্ভব কি না, তার এক ব্যক্তিক ও সাহিত্যিক নিরীক্ষায় রত হয়েছিলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ-রোধ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, লিখেছেন *গোরা*-র মতো রাজনৈতিক-মহাকাব্যিক উপন্যাস।

সার্বিকভাবে *বউ-ঠাকুরানীর হাট* হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। উপন্যাসের মুসলমান-চরিত্রগুলির রূপায়ণে তিনি কখনওই বিদ্বেষ-প্রসূত হননি। এখানে মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তেও হিন্দু বসন্ত রায় মুসলমান মুক্তিয়ার খানকে আন্তরিক আলিঙ্গন করেছে। আমরা সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি উদ্ধৃত করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> *মুক্তিয়ার খাঁ ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্ত রায় আহ্নিক সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুক্তিয়ার খাঁর গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব ভালো আছ তো?"*
>
> *মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, "হ্যাঁ মহারাজ।"*
>
> *বসন্ত রায় কহিলেন, "আহারাদি হইয়াছে।"*
>
> *মুক্তিয়ার। আজ্ঞা হাঁ।*
>
> *বসন্ত রায়। আজ তবে তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দি।*
>
> *মুক্তিয়ার কহিল, "আজ্ঞা না, প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনই যাইতে হইবে।"*
>
> *বসন্ত রায়। না, তা হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না। আজ এখানে থাকিতেই হইবে।*
>
> ...
>
> *মুক্তিয়ার। ...মহারাজার একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।*
>
> *বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,*
>
> *"কী আদেশ? এখনই বলো।"*
>
> ...
>
> *বসন্ত রায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এসো সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।"*
>
> *মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ আমাকে মার্জনা করিবেন—আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নাই।"*
>
> *বসন্ত রায় কহিলেন, "না সাহেব, তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জনা করিব কী?" বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন : কহিলেন, "প্রতাপকে বলিয়ো, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখো খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ—দেখিয়ো অন্যায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।"*

বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে এমন পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষকে বিশেষায়িত করে তুলেছেন, দুই প্রতিপক্ষকে সাম্প্রদায়িক বিভেদে জর্জরিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সুযোগ পেয়েও সে-ক্ষেত্রে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করেননি। মানুষকে ধর্ম-পরিচয়ে চিহ্নিত করেননি, সেই বাইশ বছর-বয়সেও।

এই উপন্যাসের পরবর্তী একাংশে রবীন্দ্রনাথ বসন্ত রায় আর খাঁ সাহেবের মতো দুটি বিপরীত ধর্মের মানুষকে সম্মিলিত গানের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন :

> *কিছুক্ষণ পরে বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, একটা গান গাও না—একটা গান গাও ; তাজবে তাজ নওবে নও।"*
>
> *খাঁ সাহেব গান ধরিলেন,—*
>
> *তাজতে তাজ নওবে নও।*
>
> *দেখিতে দেখিতে বসন্ত রায় মাতিয়া উঠিলেন, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একত্রে গাহিতে লাগিলেন এবং বারবার করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার হইয়া আসিল, রাখালেরা বাড়ি মুখে আসিতে আসিতে গান ধরিল।*

রবীন্দ্রনাথ একটি গানের বাণী বসিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে-ভাবে একটি অনুপম নৈসর্গিক দৃশ্যের অবতারণা করলেন, তাতে তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের উর্ধ্বে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক চিরকালীন বাঙ্ময়তা—যেখানে মুখ লুকোয় ঈর্ষা-দ্বেষ-হিংসা-প্রতিহিংসা। আমরা জানি, এখানেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। তরুণ-বয়সে-লিখিত *বউ-ঠাকুরানীর হাট* উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য বিশেষ না-থাকলেও এই সুনির্মিত সম্প্রীতির মূল্য কম নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিস্তৃত সাহিত্য-জীবনে কোনও সীমায়নে বাঁধা পড়েননি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রতিভা ও খ্যাতির মধ্য-গগনে, তখন তিনি লিখছেন *আনন্দমঠ*। ১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু হয়ে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত *আনন্দমঠ, বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়সীমায়, ১২৮৮ সালের কার্তিক থেকে ১২৮৯ সালের আশ্বিন পর্যন্ত, *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের *বউ-ঠাকুরানীর হাট*। লক্ষণীয়, পরিণত বঙ্কিমচন্দ্র যখন *আনন্দমঠে*এ উগ্র হিন্দুয়ানির প্রবর্তনায় রত, তখন তরুণ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন হিন্দু-চরিত্রের প্রবল রাজ্যলিপ্সার নিষ্ঠুর পরিচয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যদের আলোকবর্ষ-তফাত। যেন, রবীন্দ্রনাথ একদিকে, অন্য সকলে আরেকদিকে। তরুণ রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্য চরিত্রটিকে কালিমালিপ্ত করছেন বলে সমকালে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। পরবর্তিকালের গবেষণায় জানা গিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে সঠিকই লিখেছিলেন।

বঙ্কিম-ধাঁচে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত হয়েছিলেন। *বউ-ঠাকুরানীর হাট* রচনার পর তিনি লিখলেন *রাজর্ষি*। এই উপন্যাসে কয়েকটি অপ্রধান মুসলমান-চরিত্র রয়েছে। তাদের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু, এখানে হিন্দু-ধর্মের

জিঘাংসার দিকটি সুস্পষ্ট করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কট্টর হিন্দুত্ববাদী। তিনি ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় বিশ্বাসে ছিলেন ব্রাহ্ম। কিন্তু, তিনি, প্রকৃতপক্ষে, ছিলেন একজন গভীরতম মানবতাবাদী। ধর্মের উগ্রতা ব্যক্তি বা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এ ছিল তাঁর কাছে প্রবল বেদনার বিষয়। *রাজর্ষি* উপন্যাসে তাঁর সেই মনোবেদনাই ফুটে উঠেছে জয়সিংহ-রঘুপতির আত্মনিবেদন আর নৃশংসতার পরিচয়ে।

ত্রিপুরার রাজবংশের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে অনুরুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৭ সালে *রাজর্ষি* উপন্যাসটি লিখেছিলেন। এই উপন্যাস কল্পনাধর্মী হলেও কখনও ইতিহাসকে অতিক্রম করেনি, তথ্যের বিকৃতি ঘটেনি সেখানে। ইতিহাসের প্রেক্ষিতেই কাহিনি বিস্তারিত হয়েছে।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য ধর্মপ্রবণ হলেও ছিলেন মন্দিরে বলিদানের প্রবল বিরোধী। বিপরীতে মন্দিরেব পুরোহিত রঘুপতি চান দেবীকে নরবলিতে প্রীত করতে। দুই চরিত্রের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়—দ্বন্দ্ব ভিতরের, দ্বন্দ্ব বাইরের। রঘুপতি জয়সিংহকে ধর্মের নামে রাজরক্ত আনতে আদেশ করেন, প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেন। শেষ পর্যন্ত রঘুপতির সন্তানপ্রতিম শিষ্য জয়সিংহ আত্মবলিদানে দেবীকে তুষ্ট করেন। বেদনায়, হতাশায়, শোকে ভেঙে পড়েন রঘুপতি। ধর্মের জিঘাংসা এই ট্র্যাজিক পরিণতিতে পৌঁছয় উপন্যাসের শেষাংশে। রঘুপতির ব্রাহ্মণ্য সংস্কার তছনছ হয়ে যায় বাৎসল্যের হাহাকার ও শূন্যতায়। প্রথা ও সংস্কারের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে মানবিক মূল্যবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, যা তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলির সারাৎসার।

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে রক্তপাতের ধর্ম, রক্তপাতের রাজনীতির বিপরীতে স্থাপন করেছেন হাসি ও তাতা নামে দুই অনাবিল শিশুকে। তিনি লিখছেন :

> *যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেত প্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে এক-শো-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।*
>
> *হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা একপ্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগা বাবা!"*
>
> *রাজা বলিলেন, "রক্তের দাগ মা।"*
>
> *সে কহিল, "এত রক্ত কেন!" এমন একপ্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল 'এত রক্ত কেন', যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল 'এত রক্ত কেন!' তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন।*

আর এই কেন্দ্রবিন্দু থেকেই উপন্যাসটি গতি-পরিবর্তন করল। রাজা ত্রিপুরায় বলিপ্রথা বন্ধ করলেন। ক্রুদ্ধ হলেন রঘুপতি। তিনি প্রিয় শিষ্য জয়সিংহকে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেবীকে নিবেদন করার আদেশ দিলেন। জয়সিংহকে ধর্মের নামে ঘাতক তৈরির

পরিকল্পনা করলেন। হত্যায় অপারগ জয়সিংহ আত্মবলিদানে দেবীর-তথা-রঘুপতির-তথা-ধর্মীয় স্বার্থ তুষ্ট করার প্রয়াস পেলেন। রবীন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে :

> *রঘুপতি তাঁহাকে ধরিয়া কানের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন, "রাজরক্ত আনিয়াছ?"*
>
> *জয়সিংহ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "আনিয়াছি। রাজরক্ত আনিয়াছি। আপনি সরিয়া দাঁড়ান, আমি দেবীকে নিবেদন করি।" শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।*
>
> *কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস মা! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষা মিটিবে না? জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর-কাহারও দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহবংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এই নে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে।" গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন—বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল—চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন ; পাষাণ-প্রতিমা বিচলিত হইল না।*
>
> *রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—জয়সিংহকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপরে পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেত প্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল।...প্রভাতে বন হইতে যখন পাখি ডাকিয়া উঠিল, তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।*

ধর্মীয় উন্মাদনা কীভাবে ব্যক্তি-তথা-সমাজের বুকে ঘনিয়ে তোলে ট্র্যাজেডি, রাজর্ষি উপন্যাসে তা-ই প্রতিপাদ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

এ-উপন্যাসে কয়েকটি অপ্রধান মুসলমান-চরিত্র রয়েছে। মোগল-শাসিত ত্রিপুরার পটভূমিতে *রাজর্ষি* লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে, এখানে মুসলমান-চরিত্র এসেছে স্বাভাবিক নিয়মেই। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর উপাসক রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করার অভীপ্সায় মুসলমান-নবাব সুজার দ্বারস্থ হতে দ্বিধা করেননি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> *যদিও সুজা নিজে ভ্রাতার সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সংকুচিত হন না, তথাপি এ স্থলে তাঁহার মনে কেমন আপত্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু রঘুপতির প্রার্থনা পূরণ করাই তাঁহার আগাতত সকলের চেয়ে সহজ বোধ হইল—নহিলে রঘুপতি বিস্তর বকাবকি করিবে এই তাঁহার ভয়। বিশেষত দেড় লক্ষ টাকা নজরানার উপরেও অধিক আপত্তি করা ভালো দেখায় না এইরূপ তাঁহার মনে হইল।*

এইভাবে ধর্মহীন দুই চক্রীর সন্ধি হল। রবীন্দ্রনাথ খুব স্বল্প পরিসরে, ইঙ্গিতে প্রকৃত ধর্মের বিরোধী হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্ম-ব্যবসায়ীর স্বরূপ পরিস্ফুট করেছেন ঘটনা ও সংলাপের প্রেক্ষিতে—কোনও স্থূল, বিক্ষিপ্ত মন্তব্য-ব্যতিরেকেই।

উপন্যাসের শেষাংশে উষ্ণীষ আর তরবারিহীন গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি মোগল-সৈন্যদের বিদ্রূপের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান-দম্ভ আর সাম্প্রদায়িকতা ব্যক্ত করেন অনুরূপ স্বল্পবাক্যে :

> *পথের মধ্যে এক জায়গায় একদল মোগল-সৈন্য আসিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল, এমন কি তাঁহার অনুচরদের সহিত কিঞ্চিৎ কঠোর বিদ্রূপ আরম্ভ করিল।*

এই উপন্যাসের অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকতা আর মিলনের আখ্যান লিখলেন :

> *...জল সরিয়া গেলে জীবিত ব্যক্তিরা নামিয়া আসিয়া মৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়া আত্মীয়দিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অধিকাংশ মৃতদেহই অপরিচিত এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে আগত। কেহই তাহাদিগকে সৎকার করিল না। পালে পালে শকুনি আসিয়া মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শৃগাল-কুকুরের সহিত তাহাদের কোনো বিবাদ নাই, কারণ শৃগাল-কুকুরও সমস্ত মরিয়া গিয়াছে। বারো ঘর পাঠান গ্রামে বাস করিত ; তাহারা অনেক উচ্চ জমিতে বাস করিত বলিয়া তাহাদের প্রায় কাহারও কোনো ক্ষতি হয় নাই। অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা গৃহ পাইল, তাহারা গৃহে আশ্রয় লইল—যাহারা পাইল না, তাহারা আশ্রয়-অন্বেষণে অন্যত্র গেল।...এই সময়ে মৃতদেহে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া ও অন্যান্য নানা কারণে গ্রামে মড়ক আরম্ভ হইল। পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃতদেহের গোর দিবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার অবসর কাহারও রহিল না। হিন্দুরা কহিল, মুসলমানেরা গো-হত্যা পাপের ফল ভোগ করিতেছে। জাতিবৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতিভয়ে কোনো হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোনোপ্রকার সাহায্য করিল না। বিল্বন সন্ন্যাসী যখন গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের এইরূপ অবস্থা। বিল্বনের কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল, মড়কের ভয়ে তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিল। বিল্বন ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে বিরত করিলেন। তিনি পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন—তাহাদিগকে পথ্য পানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। বিল্বন কহিতেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত। ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত!" হিন্দুরা বিল্বনের অনাসক্ত পরহিতৈষণা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে সাহস করিল না। বিল্বনের কাজ ভালো কি মন্দ তাহারা স্থির*

করিতে পারিল না। তাহাদের অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান সন্দিগ্ধভাবে বলিল "ভালো নহে", কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে যে মনুষ্য বাস করিতেছে সে বলিল "ভালো"।

...

অবশেষে মড়ক মুসলমানপাড়া হইতে হিন্দুপাড়ায় আসিল। গ্রামে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল—চুরি-ডাকাতির শেষ নাই, যে যাহা পারে লুঠ করিয়া লয়। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া ডাকাতি আরম্ভ করিল। তাহারা পীড়িতদিগকে শয্যা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তক্তা মাদুর বিছানা পর্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইত। বিল্বন প্রাণপণে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বিল্বনের কথা তাহারা অত্যন্ত মান্য করিত—লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না।

রাজর্ষি উপন্যাসটি এইভাবে হয়ে ওঠে মানবিকতার এক অনবদ্য অভিজ্ঞান। রাজকাহিনি, কল্পনাবিস্তার, ইতিহাস, আখ্যান সবকিছু ম্লান হয়ে যায় সেই গভীরতম মানবিক উপলব্ধির কাছে।

উপন্যাস লেখার শুরুর দিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রোমান্টিকতার বশবর্তী। মানব-মানবীর হৃদয়াবেগ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, জট-জটিলতাকেই তখন তিনি অবলম্বন করেছিলেন তাঁর রচনায়। অবশ্য তার সঙ্গে স্বভাবতই সমাজ-পরিবার ও নীতি-দুর্নীতির মিশ্রণ ঘটাতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর সূচনায় অস্থির সময় ও সমাজ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তাঁর পাণ্ডুলিপিতে। ব্যক্তি বা পরিবারকেন্দ্রিক উপন্যাসের পৃষ্ঠা যেন সমস্যাসঙ্কুল পরিপার্শের ঝোড়ো বাতাসে উড়ে গেল—নতুন উপন্যাস এসে দাঁড়াল বৃহত্তর পটভূমিতে। জীবনের, সমাজের, রাজনীতির সমস্যাগুলির রূপারোপই শুধু নয়, তার সমাধানও খুঁজলেন তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। লেখা হল *গোরা, ঘরে বাইরে* এবং *চার অধ্যায়*। এই অভূতপূর্ব উপন্যাসগুলিতে উদ্ভাসিত হল ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি, স্বাদেশিকতার টানাপোড়েনের সুস্পষ্ট বৃত্তান্ত। আমরা রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চিনলাম।

গোরা উপন্যাসের সময় ও সমস্যা থেকে আজ আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। গোরা বা বিনয়ের কোনও প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা আজ আর আমাদের কাছে কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সে-জন্য আমরা উপন্যাসটিকে বর্জন করতে পারি না—যেমন পারি না *ইলিয়াড, ওডেসি* বা *রামায়ণ, মহাভারত* নামক মহাকাব্যগুলিকে। এখনও সে-জন্যই আমাদের পড়তে হয় শেকসপিয়র, বালজাক বা টলস্টয়। *গোরা* উপন্যাসটি একইভাবে তার সমকালীনতা অতিক্রম করে হয়ে ওঠে চিরকালীন।

কৃষ্ণদয়ালের পুত্র গোরা প্রকৃতপক্ষে আইরিশ-জাতক। সিপাই-বিদ্রোহের সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল। জন্মের পর তাঁর বিদেশিনি মা মারা গেলে কৃষ্ণদয়াল গোরাকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেন। গোরাও তাঁকে পিতা বলেই জেনেছিল। এই জন্ম-রহস্যের উন্মোচন হয় উপন্যাসের শেষাংশে। রবীন্দ্রনাথ গোরাকে প্রায় পরাধীন ভারতের প্রতীক

করে তুলেছেন। উনিশ শতকের শেষাংশ ও বিশ শতকের প্রথমাংশের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে সে এই উপন্যাসে। গোরা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-চারেকের বড়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পাঠকের কাছে গোরার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে বিশেষ রহস্যজাল বোনেননি। তার কাজই তার পরিচয়। গোরা নিজের অগোচরে হয়ে উঠেছিল হিন্দুধর্মের চরমতম প্রবক্তা। সে সরবে ঘোষণা করতে চেয়েছে, ভারতবর্ষ আসলে হিন্দুর দেশ, হিন্দুর আচার-আচরণ নিষ্ঠাভরে পালন করাই দেশপ্রেম, দেশহিতৈষণা। এ-জন্যই আশপাশের সকলের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব। তার প্রবল পৌরুষের চাপে সকলেই পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে—হিন্দু বা ব্রাহ্ম-নির্বিশেষে সকলেই তার জন্য তটস্থ। বন্ধু বিনয়কে সে প্রায় তার করতলগত করে রেখেছে। সব মিলে গোরা যেন উগ্র জাতীয়তাবাদের সমার্থক। সে যেন মানুষ নয়, মতবাদের প্রতীক-মাত্র, দল গড়া আর দল ভাঙার নিরলস কারিগর। এহেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোরার মানসিক পরিবর্তনই এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য।

গোরা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিঃসন্দেহে গোরা। উপন্যাসের নামকরণেই তার প্রমাণ। গোরার পাশে বিনয়, আনন্দময়ী, পরেশবাবু, সুচরিতা, ললিতা, হারানবাবু ইত্যাদি চরিত্রগুলি খুবই গৌণ হয়ে পড়েছে। মনে হয়, এরা যেন গোরার ক্রমবিকাশের জন্যই সৃষ্ট, তাদের কোনও নিজস্বতা নেই।

গোরা উপন্যাসটি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে। জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় তখন তিনি প্রবল-উদ্দীপ্ত। স্বদেশপ্রেমের গান-রচনায় তখন তাঁর লেখনি ঝর্ণার মতো বেগবান। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিজে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েও তিনি গোরার পক্ষাবলম্বন করেছেন বারবার। আসলে, এ-সময় তিনি স্বদেশ, ধর্ম, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি প্রচলিত ধারণাগুলি সম্পর্কে প্রশ্নব্যাকুল হয়েছিলেন। সাহিত্য-সমালোচক হাসান আজিজুল হক লিখেছেন :

> *আসলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথেরই যোগ্য এক অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিলেন এবং সেটা ধর্ম কী তা নয়, মানুষের ধর্ম কী ঠিক তাও নয়, তা হচ্ছে দেশের মূর্তি কী, স্বদেশের বিমূর্ত ধারণাটাই বা কী—মানুষের কাজ কোথায়, কার কাছে।...গোরাকে স্বদেশশূন্য করে তিনি একটা জবাব খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন।*
>
> —*কথা সাহিত্যের কথকতা*

অনেকেই মনে করেন, *গোরা* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে-সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন, গোরা যে-ভাবে পাতার-পর-পাতা কেবল কথার মালা বুনেছে, তা আসলে প্রবন্ধের বিষয়। এই উপন্যাসে গোরা কথা যত বলেছে, কাজ তত করেনি—উপন্যাসে কথা যত, ঘটনা তত নয়। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই সুবিশাল উপন্যাসে দেশ-কাল-মানুষের বহুমাত্রিক চিত্রটিই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। পৃথিবীতে যে তাত্ত্বিক উপন্যাসের সংখ্যা কম, তা নয়। রবীন্দ্রনাথ গোরার মতো একটি চরিত্র-সৃষ্টি করেছেন, যার ভিত্তিটি তাত্ত্বিক হলেও, পরিণতিতে তা মানবিক। জাতীয়তাবাদী, ধর্মান্ধ গোরাকে

রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে দেশহীন মানুষ-রূপে এঁকেছেন, তাতে লেখকের অভিপ্রায়টি বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন গোরা লিখছেন, তখন তাঁর বয়স ৪৯ বছর। উপন্যাসের গোরা বা বিনয় আসলে তাঁর নিজের যৌবনকালের প্রতিভূ। সে-সময় তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকও হয়েছিলেন। বিতর্ক করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। ব্রাহ্ম-সমাজের আদ্যোপান্ত ভাঙা-গড়া তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তান হয়েও তিনি কিন্তু উপন্যাসে ব্রাহ্ম-পক্ষাবলম্বন করেননি। তিনি ঔপন্যাসিক ভারসাম্য বজায় রেখে পানুবাবু, বরদাসুন্দরী, পরেশবাবুর মতো ব্রাহ্ম বা অবিনাশ ও আনন্দময়ীর মতো সমতুল্য হিন্দু-চরিত্র-সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এমনকী, গোরার মতো ইস্পাত-সদৃশ একমাত্রিক চরিত্র পর্যন্ত জেল থেকে বেরিয়ে ব্রাহ্ম বিনয় আর হিন্দু ললিতার বিয়ের সংবাদে আত্মবিশ্লেষণের কেন্দ্রে পৌঁছয়। সুচরিতাকে যে সে হিন্দুত্বের ব্যূহে আবদ্ধ হয়ে থাকার জন্যই সম্পূর্ণ করে পাচ্ছে না, তা-ও সে বুঝতে পারে ; বুঝতে পারে ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ধর্মের আবিল আবদ্ধতা।

শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মকাহিনি উদ্‌ঘাটিত করে দেন। গোরা জানতে পারে :

> *'তাহার মা নাই, বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, দেবতা নাই। তাহার সমস্তই একটা কেবল 'না'।*

গোরা তখন এই উপলব্ধিতে পৌঁছল যে সে হিন্দু নয় :

> *আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।*

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে মুখ্যত হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে আলোচনা করলেও আমরা লক্ষ করেছি, সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বিধা-দ্বন্দ্বও চোখ এড়ায়নি তাঁর।

গোরা উপন্যাসের ২৬-সংখ্যক পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> *উভয়ে চলিতে চলিতে এক জায়গায় নদীর চরে এক মুসলমান-পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আতিথ্যগ্রহণের প্রত্যাশায় খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত গ্রামের মধ্যে কেবল একটি ঘর মাত্র হিন্দু নাপিতের সন্ধান পাওয়া গেল। দুই ব্রাহ্মণ তাহারই ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া দেখিল, বৃদ্ধ নাপিত ও তাহার স্ত্রী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করিতেছে। রমাপতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সে তো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গোরা নাপিতকে তাহার অনাচারের জন্য ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল, "ঠাকুর আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা, কোনো তফাত নেই।"*
>
> *তখন রৌদ্র প্রখর হইয়াছে—বিস্তীর্ণ বালুচর, নদী বহুদূর। রমাপতি পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া কহিল, "হিন্দুর পানীয় জল পাই কোথায়?"*
>
> *নাপিতের ঘরে একটা কাঁচা কূপ আছে—কিন্তু ভ্রষ্টাচারের সে কূপ হইতে*

রমাপতি জল খাইতে না পারিয়া মুখ বিমর্ষ করিয়া বসিয়া রহিল।

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছেলের কি মা-বাপ নেই?"

নাপিত কহিল, "দু'ই আছে, কিন্তু না থাকারই মতো।"

গোরা কহিল, "সে কী রকম?"

নাপিত যে ইতিহাসটা বলিল, তাহার মর্ম এই—

যে জমিদারিতে ইহারা বাস করিতেছে তাহা নীলকর সাহেবদের ইজারা। চরে নীলের জমি লইয়া প্রজাদের সহিত নীলকুঠির বিরোধের অন্ত নাই। অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে, কেবল এই চর-ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরুসর্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুই বার পুলিসকে ঠেঙাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয়, কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল—আজ মাসখানেক হইল নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুঠ করে। সেই উৎপাতের সময় ফরুসর্দার সাহেবের ডান হাতে এমন এক লাঠি বসাইয়াছিল যে ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড়ো দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই। ইহার পর হইতে পুলিসের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মতো লাগিয়াছে—প্রজাদের কাহারো ঘরে কিছু রাখিল না। ঘরের মেয়েদের ইজ্জত আর থাকে না। ফরুসর্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন, এমন-কি, তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালক পুত্র তামিজ, নাপিতের স্ত্রীকে গ্রামসম্পর্কে মাসি বলিয়া ডাকিত, সে খাইতে পায় না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে। নীলকুঠির একটা কাছারি ক্রোশ-দেড়েক তফাতে, দারোগা এখনো তাহার দলবল লইয়া সেখানে আছে, তদন্ত উপলক্ষে গ্রামে কে কখন আসে এবং কী করে তাহার ঠিকানা নাই। গতকল্য নাপিতের প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাজিমের ঘরে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছিল। নাজিমের এক যুবক শ্যালক, ভিন্ন এলেকা হইতে তাহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল—দারোগা নিতান্তই বিনা কারণে 'বেটা তো জোয়ান কম নয়, দেখেছ বেটার বুকের ছাতি' বলিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া তাহাকে এমন একটা খোঁচা মারিল যে তাহার দাঁত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তাহার ভগিনী এই অত্যাচার দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেই সেই বৃদ্ধাকে এক ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। পূর্বে পুলিস এ পাড়ায় এমনতরো উপদ্রব করিতে

সাহস করিত না, কিন্তু এখন পাড়ার বলিষ্ঠ যুবাপুরুষমাত্রই হয় গ্রেফতার নয় পলাতক হইয়াছে। সেই পলাতকদিগকে সন্ধানের উপলক্ষ করিয়াই পুলিস গ্রামকে এখনো শাসন করিতেছে। কবে এ গ্রহ কাটিয়া যাইবে তাহা কিছুই বলা যায় না।

গোরা তো উঠিতে চায় না, ও দিকে রমাপতির প্রাণ বাহির হইতেছে। সে নাপিতের মুখের ইতিবৃত্ত শেষ না হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "হিন্দুর পাড়া কত দূরে আছে?"

নাপিত কহিল, "ক্রোশ দেড়েক দূরে যে নীলকুঠির কাছারি, তার তহসিলদার ব্রাহ্মণ, নাম মাধব চাটুজ্জে।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "স্বভাবটা?"

নাপিত কহিল, "যমদূত বললেই হয়। এত বড়ো নির্দয় অথচ কৌশলী লোক আর দেখা যায় না। এই যে কদিন দারোগাকে ঘরে পুষছে তার সমস্ত খরচা আমাদেরই কাছ থেকে আদায় করবে—তাতে কিছু মুনাফাও থাকবে।"

রমাপতি কহিল, "গৌরবাবু, চলুন আর তো পারা যায় না।" বিশেষত নাপিত-বউ যখন মুসলমান ছেলেটিকে তাহাদের প্রাঙ্গণের কুয়াটার কাছে দাঁড় করাইয়া ঘটিতে করিয়া জল তুলিয়া স্নান করাইয়া দিতে লাগিল তখন তাহার মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল এবং এ বাড়িতে বসিয়া থাকিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইল না।

গোরা যাইবার সময় নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই উৎপাতের মধ্যে তুমি যে এ পাড়ায় এখনো টিকে আছ? আর কোথাও তোমার আত্মীয় কেউ নেই?"

নাপিত কহিল, "অনেকদিন আছি, এদের উপর আমার মায়া পড়ে গেছে। আমি হিন্দু নাপিত, আমার জোতজমা বিশেষ কিছু নেই বলে কুঠির লোক আমার গায়ে হাত দেয় না। আজ এ পাড়ায় পুরুষ বলতে আর বড়ো কেউ নেই, আমি যদি যাই তা হলে মেয়েগুলো ভয়েই মারা যাবে।"

গোরা কহিল, "আচ্ছা, খাওয়াদাওয়া করে আবার আমি আসব।"

দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় এই নীলকুঠির উৎপাতের সুদীর্ঘ বিবরণে রমাপতি গ্রামের লোকের উপরেই চটিয়া গেল। বেটারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চায়। ইহা গোঁয়ার মুসলমানের স্পর্ধা ও নির্বুদ্ধিতার চরম বলিয়া তাহার কাছে মনে হইল। যথোচিত শাসনের দ্বারা ইহাদের এই ঔদ্ধত্য চূর্ণ হইলেই যে ভালো হয় ইহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। এই প্রকারের লক্ষ্মীছাড়া বেটাদের প্রতি পুলিসের উৎপাত ঘটিয়াই থাকে এবং ঘটিতেই বাধ্য এবং ইহারাই সেজন্য প্রধানত দায়ী এইরূপ তাহার ধারণা। মনিবের সঙ্গে মিটমাট করিয়া লইলেই তো হয়, ফেসাদ বাধাইতে যায় কেন, তেজ এখন রহিল কোথায়? বস্তুত রমাপতির অন্তরের সহানুভূতি নীলকুঠির সাহেবের প্রতিই ছিল।

মধ্যাহ্নরৌদ্রে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়া চলিতে চলিতে গোরা সমস্ত পথ একটি

কথাও বলিল না। অবশেষে গাছপালার ভিতর হইতে কাছারিবাড়ির চালা যখন কিছুদূর হইতে দেখা গেল তখন হঠাৎ গোরা আসিয়া কহিল, "রমাপতি, তুমি খেতে যাও, আমি সেই নাপিতের বাড়ি চললুম।"

রমাপতি কহিল, "সে কী কথা! আপনি খাবেন না? চাটুজ্জের ওখানে খাওয়াদাওয়া করে তার পরে যাবেন।"

গোরা কহিল, "আমার কর্তব্য আমি করব, এখন তুমি খাওয়া দাওয়া সেরে কলকাতায় চলে যেয়ো—ওই ঘোষপুর চরে আমাকে বোধ হয় কিছুদিন থেকে যেতে হবে—তুমি সে পারবে না।"

রমাপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গোরার মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দু ওই ম্লেচ্ছের ঘরে বাস করিবার কথা কোন মুখে উচ্চারণ করিল তাই সে ভাবিয়া পাইল না। গোরা কি পানভোজন পরিত্যাগ করিয়া প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিয়াছে তাই সে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তখন ভাবিবার সময় নহে, এক-এক মুহূর্ত তাহার কাছে এক-এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে ; গোরার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়নের জন্য তাহাকে অধিক অনুরোধ করিতে হইল না। ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটি খর্ব ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।

৬৫-পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"...হিন্দুসমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই। অন্তত সদর রাস্তা নেই, খিড়কির দরজা থাকতেও পারে। এ সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়...দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের।"

সুচরিতা কহিল, "সব সমাজই তো তাই।"

পরেশ কহিলেন, "না কোনো বড়ো সমাজই তা নয়। মুসলমান সমাজের সিংহদ্বার সমস্ত মানুষের জন্যে উদ্‌ঘাটিত, খৃস্টান সমাজও সকলকেই আহ্বান করছে। যে-সকল সমাজ খৃস্টান সমাজের অঙ্গ তাদের মধ্যেও সেই বিধি। যদি আমি ইংরেজ হতে চাই তবে সে একেবারে অসম্ভব নয়, ইংলন্ডে বাস করে আমি নিয়ম পালন করে চললে ইংরেজ-সমাজ-ভুক্ত হতে পারি, এমন-কি সেজন্যে আমার খৃস্টান হবারও দরকার নেই। অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ কবতে জানত, বেরোতে জানত না ; হিন্দু ঠিক তার উল্‌টো। তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ একেবারে বন্ধ, বেরোবার পথ শতসহস্র।"

সুচরিতা কহিল, "তবু তো বাবা, এতদিনেও হিন্দুর ক্ষয় হয়নি, সে তো টিকে আছে।

পরেশ কহিলেন, "সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে। ইতিপূর্বে হিন্দুসমাজের

খিড়কির দরজা খোলা ছিল। তখন এ দেশের অনার্য জাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এ দিকে মুসলমানের আমলে দেশের প্রায় সর্বত্রই হিন্দু রাজা ও জমিদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল, এইজন্যে সমাজ থেকে কারো সহজে বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ-অধিকার সকলকেই আইনের দ্বারা রক্ষা করছে, সে-রকম কৃত্রিম উপায়ে সমাজের দ্বার আগলে থাকবার জো এখন আর তেমন নেই। সেইজন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে। এরকমভাবে চললে ক্রমে এ দেশ মুসলমান-প্রধান হয়ে উঠবে, তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।"

সুচরিতা ব্যথিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা, এটা কি নিবারণ করাই আমাদের সকলের উচিত হবে না? আমরাও কি হিন্দুকে পরিত্যাগ করে তার ক্ষয়কে বাড়িয়ে তুলব? এখনই তো তাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে থাকবার সময়।"

পরেশবাবু সস্নেহে সুচরিতার পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আমরা ইচ্ছে করলেই কি কাউকে আঁকড়ে ধরে বাঁচিয়ে রাখতে পারি? রক্ষা পাবার জন্য একটা জাগতিক নিয়ম আছে—সেই স্বভাবের নিয়মকে যে পরিত্যাগ করে সকলেই তাকে স্বভাবতই পরিত্যাগ করে। হিন্দুসমাজ মানুষকে অপমান করে, বর্জন করে, এইজন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে। কেননা, এখন তো আর সে আড়ালে বসে থাকতে পারবে না—এখন পৃথিবীর চার দিকের রাস্তা খুলে গেছে, চার দিক থেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়ছে; এখন শাস্ত্র-সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেঁধে প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংস্রব থেকে কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দুসমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না জাগায়, ক্ষয়রোগকেই প্রশ্রয় দেয়, তা হলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ সংস্রব তার পক্ষে একটা সংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।"

৬৭-পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

পল্লীর মধ্যে বিচরণ করিয়া গোরা ইহাও দেখিয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে সেই জিনিসটি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়া দাঁড় করানো যায়। গোরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে গ্রামে কোনো আপদ বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা এমন হয় না। গোরা বারবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে এতবড়ো প্রভেদ কেন হইল। যে উত্তরটি তাহার মনে উদিত হয় সে উত্তরটি কিছুতেই তাহার মানিতে ইচ্ছা হয় না। এ কথা স্বীকার করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে। একদিকে যেমন আচারের বন্ধন তাহাদের সমস্ত কর্মকে অনর্থক বাঁধিয়া

> *রাখে নাই, অন্য দিকে তেমনি ধর্মের বন্ধন তাহাদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ। তাহারা সকলে মিলিয়া এমন একটি জিনিসকে গ্রহণ করিয়াছে যাহা 'না'-মাত্র নহে, যাহা 'হাঁ', যাহা ঋণাত্মক নহে, যাহা ধনাত্মক, যাহার জন্য মানুষ এক আহ্বানে এক মুহূর্তে একসঙ্গে দাঁড়াইয়া অনায়াসে প্রাণবিসর্জন করিতে পারে।*

গোরা উপন্যাসটি এইভাবেই শেষপর্যন্ত দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির এক সবিশেষ উপাখ্যান।

১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন *ঘরে বাইরে*, বই হয়ে বের হল ১৯১৬ সালে। তিন বছর আগে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। তবু তিনি সহজ-খ্যাতির পথ ছেড়ে লিখলেন এই বিতর্কিত উপন্যাস। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের জেরে এবং জাতীয়তাবাদের তীব্রতায় বাংলাদেশে জেগে উঠল সন্ত্রাসবাদ, নৈরাজ্য। যে-দেশপ্রেম শেষপর্যন্ত ব্যক্তি ও দলের স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হয়, দেশপ্রেমের আধারে চলে ব্যক্তি ও দলের আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস, তা কখনও সমর্থন করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। সেই ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতিবাদেই রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসটি লিখেছেন।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু, পরবর্তিকালে ওই আন্দোলনের নানা সংকীর্ণতা এবং ষড়যন্ত্র যখন তার সামনে উন্মোচিত হল, তখন তিনি সেই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্নভঙ্গের কথাই যেন লেখা হল *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসের পটভূমি ১৮৭০-৮০ সালের সময়সীমায়। স্বদেশি-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ঢেউ এই উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আছড়ে পড়েনি। কিন্তু *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পটভূমি। কেবল পটভূমি হয়েই রইল না সেই অস্থির সময়—তাকে সমালোচনায়ও বিদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবন্ধে যে-সব কথা তিনি আগে নানাভাবে বলেছেন, এখানে তা-ই তিনি বললেন কথাশিল্পের আধারে। *গোরা*-র সঙ্গে *ঘরে বাইরে*-র একটি সাদৃশ্য আমরা লক্ষ করি যে, দুটি উপন্যাসেব মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত চরিত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে জনবিচ্ছিন্ন থেকে কীভাবে স্বাদেশিকতার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। স্বদেশ ও স্বাদেশিকতা যে কেবল উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়, তা এই দুটি উপন্যাসে বোঝান রবীন্দ্রনাথ। আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতার নির্মোহ বর্ণনার সঙ্গে তা থেকে পরিত্রাণের পথও বাতলান। *গোরা*-উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন, গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের প্রতি শিক্ষিতশ্রেণির অজ্ঞতা-অবজ্ঞা-উদাসীনতা। আর *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে প্রতিফলিত হয় উচ্চ-মধ্যশ্রেণির আন্দোলনের ফল বৃহত্তর জনসমাজে কীভাবে প্রতিফলিত হয়। বাস্তবতার মাটিতে ভাবাদর্শ যে কাচের টুকরোর মতো ছড়িয়ে পড়ে, তা এই উপন্যাসে খুব সুস্পষ্ট। বাস্তবকে না-বোঝা এবং তাকে বুঝতে না-চাওয়া তৈরি করে এক ধরনের সুবিস্তৃত শূন্যতা, বিকৃতি, ট্র্যাজেডি। *ঘরে বাইরে*-র

নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপ সকলে রবীন্দ্রনাথের এই গভীর উপলব্ধির মাধ্যম ও প্রতীক হয়ে উপন্যাসটিকে শিল্পিত, প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ যখন *ঘরে বাইরে* উপন্যাসটি লেখেন, তখন সারা দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। *গোরা*-রচনার সময় তিনি যে-উপলব্ধির সত্যতায় দীপ্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে তা অনেকটাই ধূসর হয়ে এসেছে। সমালোচক নাজমা জেসমিন চৌধুরীর ভাষায় :

> *গোরার মতো সবল, সরল, অমল চরিত্রের জন্য যে মাটি, পরিবেশ, যুগ দরকার তাকে আর চারপাশে পাচ্ছেন না কোথাও, এমনকি মনের মধ্যেও নয়। পুরনো মূল্যবোধগুলি একে একে ধ্বংস হচ্ছে দেখে তিনি বিচলিত। 'গোরা'-র পরবর্তী উপন্যাসগুলির চরিত্রে এসে পড়েছে সেই জটিলতার ছাপ।*
>
> —*বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*

সন্ত্রাসবাদী স্বদেশি-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ত্রিকোণ কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথ যে-সুউচ্চ মাত্রাদান করেছিলেন *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা খুব-বেশি নেই। চলিত-ভাষায়-লেখা তাঁর এই প্রথম উপন্যাস শৈলীর দিক দিয়ে যেমন অভূতপূর্ব, তেমনই পরিপাশ-মনস্কতা এবং আদর্শায়নের দিক থেকেও তা হয়ে ওঠে অতুলনীয়।

জমিদার নিখিলেশ ও তাঁর বিদুষী স্ত্রী বিমলার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনে একদিন হঠাৎ ঝোড়ো বাতাসের মতো প্রবেশ করল সন্দীপ। সন্দীপ আত্মঘোষিতভাবে বিপ্লবী, স্বাদেশিক মন্ত্রে দীক্ষিত। বিমলার শান্ত-প্রসন্নতা তছনছ হয়ে গেল সেই ঝড়ের তাণ্ডবে। সে অন্দরমহল থেকে বাইরে এল। ঘর আর বাহিরের সীমারেখা নিমেষে গেল মুছে। নিখিলেশের বৈঠকখানায় সন্দীপ বিমলার জন্য গড়ে তুলল এক মিথ্যা স্বর্গ। এ-যাবৎ-ঘরবন্দি বিমলা পেল আত্মস্ফূর্তি। সন্দীপ তাকে নানা স্তব-স্তুতিতে বিমোহিত করল, দেশপ্রেমের নেশায় আসক্ত করল তাকে। সন্দীপের দেশপ্রেমে 'মক্ষী' হয়ে উঠল সে। সন্দীপের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তাকে আমূল শিকড়ছাড়া করে তুলল। তার আঁচল স্খলিত হয়ে গেল। সর্বনাশ এসে দাঁড়াল তাদের দু-জনের মধ্যে। সন্দীপের পরিকল্পিত ফাঁদে পা দিল বিমলা।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্বামী-নিখিলেশ আর প্রেমিক-সন্দীপের বিপরীত স্বরূপও চিনে নিতে পেরেছে সে। বুঝেছে নিজের অপরিমেয় ভুল, সন্দীপের দেশপ্রেমের-ছলনাশ্রিত লোভ-লালসা। বন্দেমাতরমে সন্দীপ যে আসলে তার মেধা নয়, রূপ-সৌন্দর্যেরই বন্দনা করেছে, তা যখন বুঝেছে বিমলা, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

চারদিকে ততক্ষণে জ্বলেছে দাঙ্গার আগুন, যা আসলে জ্বেলেছে স্বার্থান্বেষী রাজনীতি, সন্দীপেরই প্রত্যক্ষ প্ররোচনায়। দাঙ্গা থামাতে, নিজের প্রজাদের বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিখিলেশ। সন্দীপের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচ লাগেনি। বিমলা জড়িয়েছে বৈধব্যে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়নি বিমলা। যে-ঘর ছেড়ে একদিন সে

ভুল-বাহিরে এসে দাঁড়িয়েছিল, আজ সেই ঘরের বন্ধন তার কাছে শিথিল হলেও, প্রসারিত মুক্ত পৃথিবী তাকে সাদরে ক্রোড় দিল, সে-ও গ্রহণ করল তাকে।

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে বিমলার প্রতি দুই পুরুষের আকর্ষণ যেমন বর্ণনা করেছেন লাবণ্যভাষা আর আঙ্গিকে, তেমনই নারী-স্বাধীনতা আর স্বার্থান্বেষী, সংকীর্ণ রাজনীতির বীভৎসতাও যুগপৎ বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। রাজনীতি আর জমিদারির মধ্যে তিনি যদিও শ্রেণিস্বার্থ বজায় রেখে নিখিলেশেরই পক্ষ নিয়েছেন, সন্দীপকে কালো আর নিখিলেশকে সাদা করে এঁকে সাহিত্যের সম্পূর্ণ দায় হয়তো পালন করেননি রবীন্দ্রনাথ। গোরার মতো সে-ও যেন হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখপাত্র। এতকাল প্রবন্ধে-প্রবন্ধে দেশ-কাল নিয়ে তিনি যা লিখেছেন, উপন্যাসের পৃষ্ঠায় গোরা আর নিখিলেশকে দিয়েও তিনি তা-ই বলিয়েছেন। ফলে, চবিত্রদুটি উপন্যাসশিল্পের শর্ত না-মেনে হযে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের ধারক—চরিত্রের রক্তমাংস যেন এদের শরীরে নেই। বিপরীতে সক্রিয়, লোভী, আদর্শচ্যুত সন্দীপকে আমাদের অনেক-বেশি বাস্তবোচিত মনে হয়। অন্যদিকে, প্রবন্ধেব-উপকবণে-সৃষ্ট গোরা বা নিখিলেশের মতো চরিত্রগুলি হযে থাকে কেবল আইডিয়ার ধারক। কিন্তু, তা সত্ত্বেও *ঘবে বাইরে* হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য অভিজ্ঞান। উগ্র জাতীয়তাবাদ, অন্ধ সন্ত্রাসবাদের পাশাপাশি *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপরও তীব্র আলো ফেলেছেন। স্বদেশি ভাবনা এবং বিলাতি পণ্য-বর্জনেব ঘটনায় এই সম্পর্ক প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছে। বাংলার চাষ-নির্ভর অর্থনীতিতে মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রবল ভূমিকাটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অবহিত ছিল নিখিলেশও। সে স্বভাবতই মনে করত ওই বৃহত্তর মুসলমান-কৃষক-সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে দেশের রাজনীতি গড়ে উঠতে পারে না। কেবল সন্দীপকেই নয়, তার প্রজাদেরও সে এ-কথা বোঝাতে চেয়েছে।

নিখিলেশের আত্মকথায় :

> *ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকায় মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু-জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবব পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবার বুঝলুম, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষেব চাল।*
>
> *আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদেব হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কী? মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।*
>
> *তারা বললে, মহারাজ, এতদিন তো এ-সব উপসর্গ ছিল না।*

আমি বললুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বললে, না মহারাজ, সেদিন নেই, শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজি-পড়া ; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেছে। সে বললে, দেখুন এটা তো কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এ দেশে গোরু যে—

আমি বললুম, এ দেশে মহিষও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।

ইংরেজি-পড়া বললে, এর পিছনে কে আছে, সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না? মুসলমানেরা জানতে পেরেছে তাদের শাস্তি হবে না। পাঁচুড়েতে কী কাণ্ড তারা করেছে শুনেছেন তো?

আমি বললুম, এই-যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি ; ধর্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েছি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।

ইংরেজি-পড়া বললে, আচ্ছা, ভালো, তাই খরচ হয়ে যাক। কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে, আমাদেরই এবার জিত, যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ করেছি ; এতদিন ওরা রাজা ছিল, আজ ওদেরও আমরা ডাকাতি ধরাব। এ-কথা ইতিহাসে কেউ লিখবে না, কিন্তু এ-কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে।

অন্যত্র নিখিলেশকে ভ্রূক্ষেপহীন সন্দীপ সাফ জানিয়ে দেয় :

একটা চাষী তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্মনশাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের ছেলে তাদের শাল কটা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে গোলমাল চলছে।

আবার :

ভাই বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারবে না। ওদের একেবারে

নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক নাচ নাচাব। নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তাহলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে। আমি বলি তা হতে পারে, কিন্তু কোনখানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে, নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

সন্দীপ :

আমি ঘরে ঘরে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পুজো চান।.. ভারতবর্ষে এই যে দুর্গা জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালি উদ্‌ভাবন করেছে এইটেতেই সে আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ দেবী পোলিটিক্যাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়েব বর কামনা করেছিল এই দেবী তারই দুই-রকমের মূর্তি।

নিখিলেশ :

মুসলমান-শাসনে বর্গি বলো শিখ বলো, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল, বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল। কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগ-মহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণেব পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সতা দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই নিখিলেশকে করে তোলেন এক বাজনৈতিক চরিত্র। তাকে নিজের অবস্থান থেকে চ্যুত না-করে রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশকে যে-মাত্রাদান করেন, তা সন্দীপের নঞর্থক রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সন্দীপ ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়েছে সচেতন ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী রাজনীতির সঙ্গে নিখিলেশেব বিরোধ। এখানে গোবার সঙ্গে তার একটি সাযুজ্য লক্ষ কবা যায়। সন্দীপ দেশকে মাতৃভাবে দেখতে চায়, আর নিখিলেশ দেশকে দেখে মানুষেব ধারক-রূপে, যে-আধাবে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েবই স্বরাট স্থান ও অধিকার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাতাস ছড়াবার জন্য জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতিকেই দায়ী কবেন-নিখিলেশেব মাধ্যমে। স্পষ্ট করে বলেন, দেশদেবী ও দেশধর্মের নামে সেই রাজনীতি ইংরেজ-বিরোধিতার ছদ্মবেশে আসলে আত্মস্বার্থ বজায় রাখার জন্য জনসমাজকেই চায় ধ্বংস করতে, মুসলমান-সমাজকে চায় অধীনস্থ, নমিত করে রাখতে।

সাহিত্য-সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

ভারতবর্ষ সত্য হলে, মুসলমান নিয়েই সত্য—দেশ দেবী নয়, সত্য দেশের থেকেও বড় ; নিখিলেশের এই যুক্তিতে আর এক রাজনীতির আভাস—গোবা বা নিখিলেশ কেউই স্পষ্টত শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির কথা বলে না। কিন্তু তাদের

ভাবনায় প্রচ্ছন্ন থাকে এটাই ; শ্রেণী সংগ্রামকে হয়তো তারা প্রকাশ্যে আনে না, কিন্তু গোরার প্রতিবাদের ধরনে, নিখিলেশের পঞ্চু-চাষী চেতনায় সেটাই আসে। রবীন্দ্রনাথ খুব খোলাখুলিই দেখান সন্দীপের শিক্ষিত শ্রেণীর রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতাই চাষীকে বিরূপ করে, মুসলমানদের মধ্যে পাল্টা সাম্প্রদায়িকতা জাগায়। জনসমাজ আরও বিপন্ন হয়ে ওঠে।

—উপন্যাস রাজনৈতিক

আর নিখিলেশ এই বিপন্নতা অনুধাবন করে সন্দীপকে সম্পূর্ণ ও সঠিক বুঝতে পেরে। সন্দীপের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকেই প্রতীকায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিখিলেশও প্রতীকী। দুই বিপরীত সংঘাতের অবসান ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে অবলম্বন করেন। দাঙ্গার আগুন নেভাবার জন্য নিখিলেশ এই প্রথম ঘর ছেড়ে বাইরের প্রতিকূলতায় ঝাঁপ দেয়—মৃত্যু দিয়ে জীবনের, জাতির, সত্যেব ঋণ শোধ করে। কেননা, সে ততদিনে বুঝে গিয়েছে সন্দীপকে, তার তথাকথিত বাজনীতিকে :

মধ্য-আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত তাহলে নরবলি দিযে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ কবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নতুন যুক্তিতে প্রমাণ করে ও পুলকিত হয়ে উঠত।...যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্ছে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো হাত না থাকে।

নিখিলেশ সারা জীবন তাব সামনে ঘনীভূত সমস্ত সমস্যা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে, মোকাবিলা কবেনি, মুখোমুখি হয়নি, আদর্শের ঘেরাটোপে থেকেছে। কিন্তু, ববীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত তাকে সমস্যাব মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিয়েছেন। উপন্যাসের পরিণতিতে বিমলা তার আত্মকথায় জানাচ্ছে :

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মত লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে বাখার মতলব করেছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে অতএব এখনকার মতো চললুম। তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোরো না। মক্ষীরানী, বন্দে প্রলয়রূপিণীং হৃদপিণ্ডমালিনীং!

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর-কোনোদিন এমন করে দেখতে পাইনি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কী ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম, এখন মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই—কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললেন,

আর তো বেশি সময় নেই, এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক।

এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সংকুচিত হলেন; বললেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আসতে পারি নি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্য ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।

আমার স্বামী বললেন, আমি তবে চললুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বললুম, তুমি গিয়ে কী করতে পারবে? মাস্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, মা, বারণ করবার তো সময় নেই।

আমার স্বামী বললেন, কিচ্ছু ভেবো না বিমল।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্র ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি অকিঞ্চিৎকর, সামান্য, সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে কত সুদূরপ্রসার ঘটিয়ে দিলেন এই উপন্যাসের, তা আজ আর নতুন করে বলার নয়। '*হাতে তাঁর কোনো অস্ত্র ছিল না*' বাক্যটি আমাদের বুঝিয়ে দ্যায় নিখিলেশ দাঙ্গা-দমনে কতটা সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হতে পেরেছিল, গোটা উপন্যাসে সে তার নিষ্ক্রিয় ভাবুকতার যে-ক্রমপ্রসার ঘটিয়ে গিয়েছে, আজ তা সর্বাংশে সক্রিয় হল। কেবল তা-ই নয়, ওই-একটি বাক্যে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দেশে অহিংস আন্দোলনের তাৎপর্যও। বুঝিয়ে দেন, সন্ত্রাসবাদীদের শেষপর্যন্ত সন্দীপের মতো পালিয়ে বাঁচতে হয়, আর মানসিক-বলীয়ান নিখিলেশের মতো অহিংসাবাদীরা সন্ত্রাস বা দাঙ্গা রুখতে অস্ত্রহীন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে মৃত্যুর মুখে। নিখিলেশের স্পষ্ট-মৃত্যু লেখেননি রবীন্দ্রনাথ। আমরা ধরে নিতে চাই তার মৃত্যুই হয়েছে। কেননা, তা হলেই বিমলার ট্র্যাজেডিটি সম্পূর্ণ হয়, গভীরতর হয়। যে-ট্র্যাজেডি আসলে দেশ ও সময়ের—যে-দেশ ও সময় এরপর বিমলারই মতো রিক্ততর হয়।

এর আগে রবীন্দ্রনাথ একই সংক্ষিপ্তিতে দাঙ্গার বর্ণনা করেছেন একই পর্বের বিমলার আত্মকথায় :

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম-দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত সজনেগাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো—তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে

হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হু-হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর-গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহু দূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনায় দাঙ্গার বীভৎসতা নেই, রয়েছে এক সুতীব্র হাহাকার, যা কবল বিমলার নয়, পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়ে যেতে থাকে।

আমরা লক্ষ করি, উনিশ-শতকে-লেখা *ঘরে বাইরে* উপন্যাসটি আজও কেমন প্রাসঙ্গিক, াজনৈতিক। এ যদি কেবল বিমলা-নাম্নী এক মহীয়সী নারীকে কেন্দ্র করে দুই অতি-মানুষ ঃ অমানুষের দ্বন্দ্বে সীমায়িত থাকত, তাহলে কালান্তরে ব্যর্থই বিবেচিত হত এই ঃপন্যাস। তা হয়নি। তাই *ঘরে বাইরে* হয়ে উঠেছে সময়ের সম্পদ, অসামান্য ক্লাসিক।

শরৎচন্দ্র : মানবিকতার মরমী কথক

কবিতার কাছে কথাসাহিত্যের পরাভব ঘটে এখানেই যে, সমকাল অতিক্রম করে কবিতা কখনও নতুনভাবে জেগে ওঠে পাঠকের দরবারে, হৃদয়ে ; আর অধিকাংশ কথাসাহিত্যই সমকালীন প্রয়োজন মিটিয়ে ইতিহাসের উপকরণ হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে এ-কথা কম-বেশি সত্য। কিন্তু কবি-রবীন্দ্রনাথ বা কবি-জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে এ-কথা সত্য নয়। তারই মধ্যে লক্ষ করার, সমকালীনতা অতিক্রম করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) আজও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক, জনপ্রিয়। সাধারণ পাঠকের ভাবাবেগকে তিনি যে-ভাবে ছুঁতে পেরেছিলেন, আজও অনেক ক্ষেত্রে তা অক্ষুণ্ণ থেকে গিয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবকালটি খুবই বিস্ময়কর, আকস্মিক। একদিকে যখন রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের বিচিত্র ঐশ্বর্য ও তাৎপর্য, অন্যদিকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ফুটে উঠছে জীবনের নির্মিত মাধুর্য ; তখন শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব সুনিশ্চিতভাবেই ধূমকেতুর সঙ্গে তুল্য মনে হতে পারে। সে-সময় *ভারতী* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রমুখ লেখকদের আবেগবাহিত রোমান্টিক রচনাবলিতে পাঠক যখন নিমগ্ন ছিলেন, তখন, ১৯০৭ সালে, *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের *বড়দিদি* গল্পটি। এর আগে, ১৯০৩ সালে 'কুন্তলীন' পুরস্কারে ভূষিত হয় তাঁর *মন্দির* নামে গল্পটি। *বড়দিদি* প্রকাশের সময় অনেকেই ভেবেছিলেন ছদ্মনামে গল্পটি লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গল্পটি প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করলেন। শরৎচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ *বড়দিদি* প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে, আর তাঁর জীবিতকালের শেষ উপন্যাস *বিপ্রদাস* বের হয় ১৯৩৫ সালে। এই সময়সীমায় তিনি তিরিশটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর *শুভদা* (১৯৩৮) এবং *শেষের পরিচয়* (১৯৩৯) উপন্যাসদুটি প্রকাশিত হয়েছিল। বিচিত্রধর্মী কথাসাহিত্যের প্রণেতা হিসাবে আজও তাঁর জনপ্রিয়তা প্রায়-অক্ষুণ্ণই রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যদি হন উচ্চ-মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার, শরৎচন্দ্র তাহলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের মরমী কথক। যেন, দু-জনে মিলেই সম্পূর্ণ করেছেন একটি বৃত্ত—অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ধারার, দুটি সমান্তরাল সমাজের। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যময় কল্পজীবনের পরিবর্তে শরৎচন্দ্র যখন সাধারণ মানুষের বিবর্ণ জীবনের মহত্ত্বের কথা লিখলেন, তখন পাঠক সহজেই তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেন, যা আজও অনেকাংশিক অমলিন। শরৎচন্দ্রকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' আখ্যা দেওয়ার তাৎপর্য এখনও কিছুটা বোঝা যায়।

শরৎচন্দ্র যে-সময় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি লিখছেন, তখন পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে গিয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯০৫), রুশ বিপ্লব (১৯১৭)। বাংলা সাহিত্যে সে-সময়

কোনও-কোনও লেখকের রচনায় ওই দুই যুগান্তকারী ঘটনার ছাপ দেখা গেলেও শরৎচন্দ্রের রচনায় তা দুর্লক্ষ। শরৎচন্দ্রের রচনা আপাতভাবে বাস্তবধর্মী মনে হলেও তা-ও আসলে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতো রোমান্টিক-ধর্মী। বুর্জোয়া-সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের বীতরাগ থাকলেও, সামাজিক-সংস্কার-তথা-সমস্যা নিয়ে তিনি নানা লেখা লিখলেও, তাঁর উপন্যাসের সমস্যাগুলিকে কোনওক্রমেই দুই-বিশ্বযুদ্ধের-মধ্যবর্তী সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যায় না। শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসে বিচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকলেও, সরাসরি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে বিবেচিত হয় কেবল *পথের দাবি*-ই।

সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি (*স্বদেশ ও সাহিত্য* : ১৯০৮) নামে একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-দর্শনটি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। শরৎচন্দ্র লিখছেন :

> *আর্ট-এর জন্যই আর্ট, এ-কথা আমি পূর্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।...*
>
> ...
>
> *কিন্তু তাই বলে আমরা সমাজ-সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই। কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি অবিনয় মনে করে আপনারা অপরাধ নেবেন না। 'পল্লী-সমাজ' বলে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ বাঁচনের কথা বলা চলে না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও তো আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই।*
>
> ...
>
> *সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহু দিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে।*

আলোচ্য বিষয়ের বাইরে এই শরৎ-অবলোকনের কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। প্রথমত, আমরা দেখছি, শরৎচন্দ্র 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বটি সমর্থন করেন না বলে জানিয়ে দিয়ে অন্তত এই প্রচ্ছন্ন দাবিটুকু তিনি করেন যে, সমাজ-সংস্কারক না-হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সমাজের অসঙ্গতির বিষয়ে আলোকপাত করারই পক্ষপাতি। সে-ক্ষেত্রে সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত নারীর প্রতি তাঁর একটি স্বাভাবিক টান থেকেই গিয়েছে। সর্বোপরি, তিনি

ভালবাসার অশেষ শক্তি এবং মাধুর্যে বিশ্বাসী। কেবল বিচ্ছিন্ন নারী-পুরুষের ভালবাসা নয়—মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ভালবাসার জন্যও যে তিনি কাতর ছিলেন, তা আমরা লক্ষ করি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে।

কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর অভিমত যে রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্যদের চেয়ে একেবারেই আলাদা, তা আমরা লক্ষ করি *হিন্দু-সংঘ* পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯ আশ্বিন ১৩৩৩) *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা* নামে একটি প্রবন্ধে। এ-ছাড়া *সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা* নামে (১৫ এবং ৩০ জুলাই, ১৯৩৬ সালে যথাক্রমে টাউন হলে ও অ্যালবার্ট হলে) তিনি যে-দুটি বক্তৃতা করেন, তা-ও 'হিন্দুঘেঁষা' বলেই চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু, তিনিও যে দুই সম্প্রদায়ের মিলন-প্রত্যাশী ছিলেন না, তা নয়। বিশেষত, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ* নামে একটি প্রবন্ধে (*বিচিত্রা*, ভাদ্র, ১৩৪৩) এবং কথাসাহিত্যের কোনও-কোনও অংশে তা সবিশেষ পরিস্ফুট হয়। আমরা শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের আলোচনায় যাওয়ার আগে তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির আংশিক পাঠ গ্রহণ করতে পারি।

বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখছেন :

> *বছর-কয়েক পূর্বে মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এদেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাই-ই। চাই শুধু কেবল জিনিসটা ভাল বলিয়া নয়, চাই-ই এইজন্য যে, এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি এ কথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন কিন্তু লেখায় বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে, এক পাগল ছাড়া আর এত বড় পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।*
>
> *তার পরে এই মিলন-ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার ত হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ-আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এতবড় দুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায় ; কারণ, কল্যাণের হউক, অকল্যাণের হউক, সময়-মত একটা ছাড়রফা করিয়া কাউন্সিল-ঘরে বাঙলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ-আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়ত একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য*

আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই—এ কোন্ কথা? যে-দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে-দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ পরাধীন ভারতীয় মুসলমান-সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া, কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভুষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘর-দোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই-সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিবে না।

কিন্তু, কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশী তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কাল্‌চার হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না। হিন্দুনারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে,

তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার ত মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু আপত্তি করব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।

মিলন হয় সমানে সমানে। শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি ত করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না। এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় ত সে এখন থাক। মানুষের অন্য কাজ আছে। খিলাফৎ করিয়া, প্যাক্ট করিয়া, ডান ও বাঁ—দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজযুদ্ধে নামান যাইতে পারিবে, এ দুরাশা দুই-একজনার হয়ত ছিল, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না। তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন—দুঃখ-দুর্দশার মত শিক্ষক ত আর নাই, বিদেশী বুরোক্রেসির কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়ত তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়ত হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজরথ ঠেলা দিতে সম্মত হইবে।...

...

অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে ; হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে-কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা—হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি তাহা অনেকের কানেই হয়ত তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে, এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপুত হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে, এ জিনিস যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাতত চোখে না পড়ে ত এ লইয়া অহরহ আর্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর না হইলেই যে সর্বনাশ হইয়া গেল, এ মনোভাবেরই কোনও সার্থকতা নাই।

অন্যত্র *সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা* শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন শরৎচন্দ্র। সেখানেও তিনি প্রায় একইরকম ভাবনা প্রকাশ করেছেন :

বাঙলার হিন্দু জনগণের আজকের এই সম্মিলনী যাঁরা আহ্বান করেছেন, আমি তাঁদের একজন। এই বিশাল সভা কেবলমাত্র এই নগরের নাগরিকগণের নয়। আজ যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা বাঙলার বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। সকলের বর্ণ হয়ত এক নয়, কিন্তু ভাষা এক, সাহিত্য এক, ধর্ম এক, জীবনযাত্রার গোড়ার

কথাটা এক—যে বিশ্বাস যে নিষ্ঠা আমাদের ইহলোক পরলোক নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানেও আমরা কেউ কারও পর নয়। পর করে দেবার নানা উপায়, নানা কৌশল সত্ত্বেও বলব, আমরা আজও এক। যুগ-যুগান্ত থেকে যে বন্ধন আমাদের এক করে রেখেছে, সত্যিই আজও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়াল সকলের বড়? আর মানুষ হলো ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয়নি, এই দুর্ভাগা দেশে তাই কি হলো Special and peculiar circumstances? আর সে কেউ বোঝে না—নাবালকের trustee-রা ছাড়া?

কিন্তু এ হলো politics, এ আলোচনা করবার ভার নেই আমার উপর। এ বিষয়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরাই এ তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবার যোগ্য পাত্র। আমি না।

নূতন শাসনব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাঙলায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাঁদের ছোট করা হ'লো চিরদিনের মত। তথাপি এ কথা সত্য যে, দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ-পনেরটা স্থান বেশী পেয়েছেন বলে তাঁদের বলতে চাই,—অন্যায়, অবিচার—একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না।

ীয় প্রবন্ধটিতে শরৎচন্দ্র লিখছেন :

নূতন শাসনতন্ত্রে সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগের, বিশেষতঃ বাঙলাদেশের হিন্দুদিগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে—এত বড় অবিচার আর কিছুতে হতে পারে না। অনেকে হয়ত এই মনে করবেন যে, এই অবিচারের প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই এবং এই মনে করেই তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকবেন, প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু তা সত্য নয় ; যদি এই অন্যায়কে রোধ করবার ক্ষমতা কারও থাকে, সে আমাদেরই আছে।

বাংলা-সাহিত্যকে বিকৃত করবার একটি হীন প্রচেষ্টা চলেছে। কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি 'আরবী' কথা ব্যবহার কর ; কেউ বলছেন, এতগুলি 'পারসী' কথা ব্যবহার কর ; আবার কেউ বা বলছেন, এতগুলি 'উর্দু' কথা ব্যবহার কর। এটা একেবারে অকারণ—যেমন ছোট ছেলে হাতে ছুরি পেলে বাড়ির সমস্ত জিনিস কেটে বেড়ায়, এ-ও সেইরূপ।

তারপর এতবড় অবিচার যে আমাদের—হিন্দুদের উপর হ'লো এ তাঁরা জেনেও নীরব হয়ে রইলেন—এইটাই সকলের চেয়ে দুঃখের কথা। এটা কি তাঁরা বোঝেন না যে, এই যে বিষ, এই যে ক্ষোভ হিন্দুদের মধ্যে জমা হয়ে রইল — একদিন না একদিন তা রূপ পাবেই ; তার যে একটি প্রতিক্রিয়া আছে, এও কি তাঁরা ভাবেন না? এরকম করে ত আর একটা দেশ চলতে পারে না, একটা জাতি বাঁচতে পারে

না—এটাও ত তাঁদের জন্মভূমি। দেখুন, কেবল দিলেই হয় না—গ্রহণ করার শক্তিও একটা শক্তি। আজ যদি তাঁরা মনে করেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাঁদের পাওয়া হলো—-একদিন টের পাবেন, এত বড় ভুল আর নেই।

আমি আমার মুসলমান ভায়েদের বলছি, তোমরা সংস্কৃতির উপর নজর রেখো, সাহিত্যের উপর নজর রেখো ; আর ছোট ছেলের মত ধারালো ছুরি হাতে পেয়েছ বলে সব কেটে ফেলো না।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে শরৎচন্দ্রের এই বিস্তৃত আলোচনাকে আমরা তাঁর সংশ্লিষ্ট-বিষয়ী কথাসাহিত্যের ভূমিকালেখ হিসাবে গ্রহণ করি।

পল্লী-সমাজ-এর (১৯১৬) রমেশকে শরৎচন্দ্র সঠিক অর্থে রাজনৈতিক তাৎপর্য না-দিলেও (দেওয়ার কথাও নয়। কেননা, শরৎচন্দ্র যে-সময়কালীন পল্লিসমাজের কথা লিখেছেন, সে-সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারণাটিই দানা বাঁধেনি। যদিও, ওই উপন্যাস-রচনার সময়, সে-ধারণা প্রবল বলবৎ হয়ে গিয়েছে, গড়ে উঠেছে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলন।), তিনি তাকে শেষপর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবেই রূপায়িত করেন।

হিন্দু-রমার মুসলমান-লাঠিয়াল আকবরকে খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সুস্পষ্ট এঁকেছেন শরৎচন্দ্র। সে তার মুসলমানত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ও অহঙ্কারী হয়েও হিন্দু-রমার জন্য জান কবুল করতে যেমন দ্বিধা করে না, তেমনই হিন্দু-রমেশের লাঠির আঘাত শিরে ধারণ করেও তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়, তার বিরুদ্ধে থানায় নালিশ জানাতে নিজের অপারগতা খোলাখুলিই ব্যক্ত করে। শরৎচন্দ্র একাদশ পরিচ্ছেদে লিখছেন :

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিদিঠাক্‌রান, তিন বাপ ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেটতেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সম্‌ঝে দেখ্‌রে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে।

মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে ক' সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্ কোদাল মারচে, ওদের মুণ্ডু ক'টা ফাঁক করে দিয়ে যাই!

বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই কহিল, বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্ছে—

তাহারা তিন বাপ-ব্যাটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়বাবু বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।

বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোকে মেরেচে!

আকবর জিভ কাটিয়া বলিল, তোবা তোবা দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?

এই অংশে আমরা শরৎচন্দ্রের মুসলমান-মনস্কতার যেমন প্রমাণ পাই, তেমনই হিন্দু-মুসলমানের সঙ্কীর্ণ বিচারের উর্ধ্বে স্থান পায় তাঁর মানবিকতা। মুসলমানের স্বাজাত্য-বোধকে শরৎচন্দ্র এখানে সবিশেষ গুরুত্ব দেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্র লেখেন :

খালের ওপারে পিরপুর গ্রাম তাহাদেরই জমিদারি। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া রমেশের কাছে উপস্থিত হইল : এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে, যদিচ তাহারা তাঁহাদেরই প্রজা, অথচ তাহাদের ছেলেপিলেকে মুসলমান বলিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্তি হইতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে, মাস্টারমশাইরা কোনমতেই তাহাদের ছেলেদের গ্রহণ করেন না। রমেশ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এমন অন্যায় অত্যাচার ত কখনও শুনিনি। তোমাদের ছেলেদের আজই নিয়ে এস, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভর্তি করে দেব।

তাহারা জানাইল, যদিচ তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু খাজনা দিয়াই জমি ভোগ করে। সেজন্য হিঁদুর মতো জমিদারকে তাহারা ভয় করে না ; কিন্তু এক্ষেত্রে বিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ, ইহাতে বিবাদই হইবে, যথার্থ উপকার কিছুই হইবে না। বরঞ্চ তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা ছোট রকমের স্কুল করিতে ইচ্ছা করে এবং ছোটবাবু একটু সাহায্য করিলেই হয়। কলহ-বিবাদে রমেশ নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়াইয়া না তুলিয়া ইহাদের পরামর্শ সুযুক্তি বিবেচনা করিয়া সায় দিল এবং তখন হইতে এই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হইল।

. ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজেকে সুস্থবোধ করিল, তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলক্ষয় হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল, কুঁয়াপুরের হিন্দুপ্রতিবেশীর মত ইহারা প্রতিকথায় বিবাদ করে না ; করিলেও তাহারা প্রতি-হাত এক নম্বর রুজ্জু করিয়া দিবার জন্য সদরে ছুটিয়া যায় না।...বিশেষত বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে রমেশ ভদ্র-অভদ্র কোন হিন্দু গ্রামবাসীকেই দেখে নাই।

একে ত জাতিভেদের উপর রমেশের কোন দিনই আস্থা ছিল না, তাহাতে এই দুই গ্রামের অবস্থা পাশাপাশি তুলনা করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া

গেল। সে স্থির করিল, হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক অসমতাই এই হিংসা-দ্বেষের কারণ। অথচ মুসলমানমাত্রই ধর্ম সম্বন্ধে পরস্পর সমান, তাই একতার বন্ধন ইহাদের মত হিন্দুদের নাই এবং হইতেই পারে না। আজ জাতিভেদ নিবারণ করিবার কোন উপায় যখন নাই, এমনকি, ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও যখন পল্লীগ্রামে একরূপ অসম্ভব, তখন কলহ-বিবাদের লাঘব করিয়া সখ্য ও প্রীতি সংস্থাপনে প্রযত্ন করাও পণ্ডশ্রম। সুতরাং এই কয়টা বৎসর ধরিয়া সে নিজের গ্রামের জন্য যে বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছিল, সেজন্য তাহার অত্যন্ত অনুশোচনা বোধ হইতে লাগিল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল, ইহারা এমনি খাওয়াখেয়ি করিয়াই চিরদিন কাটাইয়াছে এবং এমনি করিয়াই চিরদিন কাটাইতে বাধ্য। ইহাদের ভাল কোনদিন কোনমতেই হইতে পারে না। কিন্তু কথাটা পাকা করিয়া লওয়া ত চাই!

এখানে আমরা দেখি, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে যে-মতপোষণ করেন, তা থেকে সরে আসেন। মুসলমান-সম্প্রদায়কে হিন্দু-সম্প্রদায়ের তুলনায় বড় করে দেখেন, দেখান। তর্কের খাতিরে প্রবন্ধে যা বলেন, এখানে অভিজ্ঞতার আলোয় তা বিপরীত দীপ্তি পায়।

এই উপন্যাসে প্রবীণা বিশ্বেশ্বরী চরিত্রটিও শরৎচন্দ্র এঁকেছেন খুবই মনস্ক অবলোকনে। হিন্দু-পরিবারের প্রবীণা বিধবা যে-ভাবে সংস্কারহীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রকৃতই তুলনাহীন। মুসলমান-সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার যে-বিবরণ শরৎচন্দ্র দিয়েছেন, তা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর নতুন আলো ফেলে।

ক্লেদাক্ত কুঁয়াগ্রামের হিন্দু-মুসলমান-প্রজাদের একাত্ম করে তুলতে সক্ষম হয় রমেশ তার আদর্শ, সততা আর বিশ্বাসযোগ্যতায়। যার ফলে শেষপর্যন্ত :

আদালতের বিচার উপেক্ষা করিয়া কৈলাস নাপিত এবং সেখ মতিলাল সাক্ষীসাবুদ লইয়া রমেশের শরণাপন্ন হইল। রমেশ অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, আমার বিচার তোমরা মানবে কেন বাপু?

বাদী-প্রতিবাদী উভয়েই জবাব দিল, মানব না কেন বাবু, হাকিমের চেয়ে আপনার বিদ্যাবুদ্ধিই কোন্ কম?...

কথা শুনিয়া রমেশের বুক গর্বে আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল।

পল্লী-সমাজ সঠিক অর্থে রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। এর কাহিনিসূত্রে ইউটোপিয়া রয়েছে। উপন্যাসের রমেশ, এমনকী, *ঘরে বাইরে*-র সন্দীপও নয়। কিন্তু পল্লিসমাজে সে একটি নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পেরেছে তার শুভ সামন্ততান্ত্রিক চারিত্র্যের জন্য। প্রজারা তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। মুসলমান-সমাজকে সে আলাদা করে রাখেনি। মুসলমান-সম্প্রদায় উদারমনস্ক হিন্দু-প্রভু পেয়ে তাকে আশ্রয় করেছে। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে দুই সম্প্রদায়কে একীভূত করতে পেরেছে রমেশ, পেরেছেন শরৎচন্দ্র। এই ইউটোপিয়ার মূল্যও কম নয়।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সমকালেই অভিযোগ উঠেছিল যে তিনি মুসলমান-সমাজের কথা লেখেন না। শরৎচন্দ্র উত্তরে জানিয়েছিলেন, "*সাহিত্য-সাধনা যদি সত্যি হয়, সেই সত্যের মধ্য দিয়েই ঐক্য একদিন আসবেই। কারণ সাহিত্য সেবকরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, কৃশ্চান হোক, তবু পর নয়—আপনার জন।*" তাঁর এই আত্মপক্ষ-সমর্থনে আমাদের দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে পড়তে হয়। কেননা পূর্বোদ্ধৃত শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধাংশগুলির সঙ্গে আমরা তাঁর কথাসাহিত্যকে মেলাতে পারি না। এই অসুবিধার কারণ বোধ হয় এই যে, শরৎচন্দ্র আদর্শগতভাবে ছিলেন চরম রক্ষণশীল। তিনি নানাভাবে সেই চিহ্ন ভেঙেছেন বলে মনে হলেও মনে রাখতে হবে, তাঁর সেই চেষ্টা খুবই আপাত। নায়ক-নায়িকা বা কল্পিত সমাজকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ততটাই এগোতে দিয়েছেন, যতখানি সমাজ তাদের বা তাকে এগোতে দ্যায়। রক্ষণশীল, সামন্ততান্ত্রিক পল্লিসমাজটিকে আমূল পাল্টে দিতে পারেন না শরৎচন্দ্র। ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে পারেন না তিনি। অন্যত্র, *শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, চরিত্রহীন* সব ক্ষেত্রেই, আমরা এমন দেখেছি—সেখানে নরনারীর প্রেম হয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ অশরীরী, নায়িকা অন্ধকারে নায়কের মশারি গুঁজে দিয়ে যায়, নায়ক-নায়িকা কেউ কারও আঙুলও ছোঁয় না! একইভাবে সামাজিক ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র মৌলিক কোনও পরিবর্তনের কথা বলেন না, বলতে পারেন না।

পল্লী-সমাজ উপন্যাসের নায়ক রমেশ রুড়কি কলেজ থেকে বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কুঁয়াপুড় গ্রামে এলে উপন্যাস শুরু হয়। পল্লিসমাজে রমেশের আবির্ভাব একটি তরঙ্গ তোলে। শহুরে-শিক্ষায়-শিক্ষিত রমেশ একই সঙ্গে যেমন পারিবারিক ও সামন্ততান্ত্রিক জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে, তেমনই নায়িকা রমার সঙ্গে প্রেম হয় তার। প্রজাদের স্বার্থে সে বাঁধ-কাটার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দ্যায়। প্রজারা, বিশেষত মুসলমান-প্রজারা, তাকে তাদের উদ্ধারকর্তা ভেবে নেয়। রমা রমেশকে ভালবেসেও সামন্ততন্ত্রের চাপ এড়াতে পারে না। ওই পল্লিসমাজে রমা-রমেশের মিলন সম্ভব নয় বলেই সম্ভব হয় না। তবু, রমেশ, তার ঔদার্যের বশে, রমাকে ক্ষমা করে। রমার বিকল্পে কাছে টেনে নেয় সেই কূপমণ্ডিত পল্লিসমাজকে। যেন বৃহত্তর কোনও লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয় সে।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়টি *পল্লী-সমাজ* উপন্যাসে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। বিশ্বেশ্বরী চরিত্রটি এখানে এই সম্পর্কে নানাভাবে আলো ফেলেছে। রমেশ ও বিশ্বেশ্বরীর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে :

> *জ্যাঠাইমা কহিলেন, হাঁ রে রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস?*
>
> ...
>
> *রমেশ হাসিয়া কহিল, ঐ দ্যাখ জ্যাঠাইমা, এর মধ্যেই তোমার কানে উঠেচে। এখনো খাইনি বটে, কিন্তু খেতে ত আমি কোন দোষ দেখিনি। আমি তোমাদের জাতিভেদ মানিনে।*

জ্যাঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, মানিস নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না জাতিভেদ নেই যে তুই মানবি নে?

বমেশ কহিল, ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম জ্যাঠাইমা। জাতিভেদ আছে তা মানি, কিন্তু একে ভাল বলে মানিনে।

কেন?

রমেশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন সে তোমাকে বলতে হবে? এর থেকেই যত মনোমালিন্য, যত বাদাবাদি, এ কি তোমার জানা নেই? সমাজে যাকে ছোটজাত করে রাখা হয়েচে, সে যে বড়কে হিংসা করবে, এই ছোট হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কববে, এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে—সে ত খুব স্বাভাবিক। হিন্দুরা সংগ্রহ করতে চায় না, জানে না—জানে শুধু অপচয় করতে। নিজেকে এবং নিজের জাতকে রক্ষা করবার এবং বাড়িয়ে তোলবার যে একটা সাংসারিক নিয়ম আছে, আমরা তাকেই স্বীকার করি না বলেই প্রতিদিন ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছি। এই যে মানুষ গণনা করার একটা নিয়ম আছে, তার ফলাফলটা যদি পড়ে দেখতে জ্যাঠাইমা, তা হলে ভয় পেয়ে যেতে। মানুষকে ছোট করে অপমান করবার ফল হাতে হাতে টের পেতে। দেখতে পেতে কেমন করে হিন্দুরা প্রতিদিন কমে আসচে এবং মুসলমানেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠেচে। তবু ত হিন্দুর হুঁশ হয় না!

বিশ্বেশ্ববী হাসিয়া বলিলেন, তোর এত কথা শুনে এখনো ত আমার হুঁশ হচ্ছে না রমেশ! যারা তোদের মানুষ গুণে বেড়ায়, তারা যদি গুণে বলতে পারে, এতগুলো ছোট-জাত শুধুমাত্র ছোট থাকবার ভয়েই জাত দিয়েচে, তা হলে হয়ত আমার হুঁশ হতেও পারে। হিন্দু যে কমে আসচে সে কথা মানি; কিন্তু তার অন্য কাবণ আছে। সেটাও সমাজের ত্রুটি নিশ্চয়; কিন্তু ছোটজাতের জাত দেওযা-দেওয়ি তার কারণ নয়। শুধু ছোট বলে কোন হিন্দুই কোনদিন জাত দেয় না।

বমেশ সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাই ত অনুমান করেন জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, অনুমানের বিরুদ্ধে ত তর্ক চলে না বাবা। কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে, অমুক গাঁয়ের এতগুলো ছোটজাত এই জন্যেই এ বৎসর জাত দিয়েচে, তা হলেও না হয় পণ্ডিতের কথায় কান দিতে পারি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, এ সংবাদ কেউ দিতে পারবে না।

রমেশ তথাপি তর্ক করিয়া কহিল, কিন্তু যারা ছোটজাত তারা যে অন্যান্য বড় জাতকে হিংসা করে চল্‌বে, এ ত আমার কাছে ঠিক কথা বলেই মনে হয় জ্যাঠাইমা!

রমেশের তীব্র উত্তেজনায় বিশ্বেশ্বরী আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ঠিক কথা নয় বাবা, একটুকুও ঠিক কথা নয়। এ তোদের শহর নয়। পাড়াগাঁয়ে জাত

ছোট কি বড়, সে জন্যে কারো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। ছোটভাই যেমন ছোট বলে বড়ভাইকে হিংসা করে না, দু-একবছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি। এখানে কায়েত বামুন হয়নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্তও কায়েতের সমান হবার জন্য একটুও চেষ্টা করে না। বড়ভাইকে একটা প্রণাম করতে ছোটভাইয়ের যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমন কায়েতও বামুনের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদ-টেদ হিংসে-বিদ্বেষের হেতুই নয়। অন্ততঃ বাঙ্গালীর যা মেরুদণ্ড—সেই পল্লীগ্রামে নয়।

রমেশ মনে মনে আশ্চর্য হইয়া কহিল, তবে কেন এমন হয় জ্যাঠাইমা? ও-গাঁয়ে ত এত ঘর মুসলমান আছে, তাদের মধ্যে ত এমন বিবাদ নেই। একজন আর একজনকে বিপদের দিনে এমন করে ত চেপে ধরে না। সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে কেউ তার মৃতদেহটাকে ছুঁতে পর্যন্ত যায়নি, সে ত তুমি জান!

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু জাতিভেদ তার কারণ নয়। কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকার একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই। যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ হতাশভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, আছে বৈ কি বাবা! প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েচিস শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে কেবলি বলি, তুই তোর এই জন্মভূমিকে কিছুতে ছেড়ে যাসনে?

প্রত্যুত্তরে রমেশ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন, তুই বলবি মুসলমানদের মধ্যেও ত অজ্ঞান অত্যন্ত বেশি। কিন্তু তাদের সজীব ধর্মই তাদের সব দিকে শুধরে রেখেচে। একটা কথা বলি রমেশ, পিরপুরে খবর নিলে শুনতে পাবি, জাফর বলে একটা বড়লোককে তারা সবাই একঘরে করে রেখেছে। সে তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয় না বলে। কিন্তু আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সেদিন তার বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা করে দিলে, কিন্তু সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে। এ সব অপরাধ আমাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্য ; এর সাজা ভগবান ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, কিন্তু পল্লী-সমাজ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না!

এই নূতন তথ্য শুনিয়া একদিকে রমেশ যেমন অবাক হইয়া গেল, অন্যদিকে তাহার মন ইহাকেই স্থির-সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরী তাহা যেন বুঝিয়াই বলিলেন, ফলটাকেও উপায় বলে ভুল করিস নে বাবা! যে জন্যে, তোর মন থেকে সংশয় ঘুচতে চাইচে না, সেই জাতের ছোট-বড় নিয়ে মারামারি করাটা উন্নতির একটা লক্ষণ, কারণ নয় রমেশ। সেটা সকলের আগে না হলেই নয়, মনে করে যদি তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে যাস, এদিক-ওদিক দুদিন নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা সত্যি কি না যদি যাচাই করতে চাস রমেশ, শহরের কাছাকাছি দু-চারখানা গ্রাম ঘুরে এসে তাদের সঙ্গে তোর এই কুঁয়াপুরকে মিলিয়ে দেখিস—আপনি টের পাবি।

কলিকাতার অতি নিকটবর্তী দু-একখানা গ্রামের সহিত রমেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহারই মোটামুটি চেহারাটা সে মনে মনে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা কালো পর্দা উঠিয়া গেল এবং গভীর সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া সে বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তিনি কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্বানুবৃত্তিরূপে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাই ত তোকে বার বাব বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ করে যাসনে। তোব মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেচে, তারা যদি তোর মতই গ্রামে ফিবে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হতে পারত না। তারা কখনই গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না।

রমেশের মুসলমান-প্রিয়তায় গ্রামের স্বার্থন্বেষী হিন্দুরাও স্বভাবতই বিরূপ হয়েছে। রমেশের শিক্ষায এবং প্রেবণায় মুসলমান-সম্প্রদায় যখন গ্রামের হিন্দু-জমিদাবেব অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন কায়েমি-স্বার্থ স্বভাবতই রমেশকে দোষারোপ না-কবে, তার প্রতি বিরূপ না-হযে পারে না। কেবল নিম্নবর্গেবই নয়, আর্থিক উচ্চবর্গীয় ধনী-মুসলমানও যখন রমেশের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, তখন হিন্দু-মুসলমান সার্বিক ঐক্যের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে হিন্দু-কায়েমি-স্বার্থ। তাদের এক প্রতিভূ সনাতন তখন সরবে রমেশকে সরাসরি অভিযুক্ত করে :

> *মোচলমানদের রাগটাই সবচেয়ে বেশী। তারা ছোটবাবুকে হিন্দুদের পয়গম্বর মনে করে। তার সাক্ষী দেখুন আপনারা—জাফর আলি, আঙুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের দিন তাদের স্কুলের জন্য একটি হাজার টাকা দান করেচে। শুনি মসজিদে তাঁর নাম করে নাকি নেমাজ পড়া পর্যন্ত হয়।...তারা হিন্দু-মুসলমান ভাই সম্পর্ক পাতিয়েচে—এক মন, এক প্রাণ।*

এখানেই থামেন না শরৎচন্দ্র, তিনি জানিয়ে দেন যে, এই তথ্য জেনে *'রমার শুষ্ক ম্লান মুখ অব্যক্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল'।*

রমার এই উদ্ভাসনই পল্লিসমাজের উদ্ভাসন—শরৎচন্দ্রের ইউটোপীয় ভাবনার. স্বপ্নের সীমান্ত। সেই সীমান্ত আজও আমাদের কাছে অধরাই রয়ে গিয়েছে—যেমন সম্ভব হয়নি

হিন্দু-মুসলমানের কাঙ্ক্ষিত, অভিপ্রেত মিলন, তেমনই মুক্তি ঘটেনি রমার মতো সংস্কার-সমাজবন্দি মেয়েদের। গান্ধীজিও পারেননি, তবু সুস্থ চেতনার মানুষের মনে সেই আকাঙ্ক্ষাটি থেকে গিয়েছে। আর সে-জন্যই এখনও *পল্লী-সমাজ* পড়লে সেই আকাঙ্ক্ষাটি তীব্র হয়ে ওঠে, অচরিতার্থতার বেদনা গভীর হয়।

১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের *দেনা-পাওনা* উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তাৎপর্য আমাদের বিশেষভাবে চোখে পড়ে। *পল্লী-সমাজ*-এর মতো এখানেও শরৎচন্দ্র সামন্ততন্ত্রের মধ্যে প্রজা-কল্যাণের ধারণাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানেও প্রজা বলতে তিনি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষের কথাই বলেছেন। অন্য দিকে, প্রজা-কল্যাণের ধারণার সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন একটি ধর্মীয় মাতৃত্বের ধারণা, যা বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*-এর বন্দেমাতরম-ধারণার কথা মনে করালেও এর প্রকৃতি একেবারেই আলাদা। হিন্দু-পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে এই পবিকল্পনার কোনও সাদৃশ্য নেই। এই ভৈরবী-মাতৃধারণা বাস্তবের সঙ্গে, ভূমির সঙ্গে, চাষির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

দেনা-পাওনা উপন্যাসের একদিকে যেমন রয়েছে জীবানন্দ-এককড়ি-জনার্দন-শিরোমণি প্রমুখ স্বার্থান্বেষী হিন্দু-চরিত্র, যারা ধর্মকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থপূরণ করে; অন্যদিকে তেমন রয়েছেন বিরোধী শক্তি-রূপে গ্রামের সীমান্তবর্তী চণ্ডীমন্দিরের ভৈরবী। এই চরিত্রটির প্রতিবাদী সত্তা হয়ে ওঠার মধ্যে থাকে এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য। গ্রামের অন্ত্যজ মানুষদের নেতৃত্বদানে তিনি হয়ে ওঠেন মহীয়সী। গ্রামের কায়েমি-স্বার্থবাদীরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, তখন হরিহর বা সাগরের মতো হতদরিদ্র ব্রাত্যজনেরা ভৈরবীর পাশে জোটবদ্ধ হয়। তৈরি হয় একটি অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ। মানবতাই এখানে ধর্মের নামান্তর হয়ে ওঠে।

কেবল তা-ই নয়, এই ষোড়শী-ভৈরবীর পাশে রয়েছেন এক মুসলমান-ফকির। দরিদ্র নিপীড়িত প্রজাদের সঙ্গে ভৈরবীর সম্পর্ক-স্থাপন হয় এই ফকিরেরই মাধ্যমে। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "*এই-সকল ভূমিই সে ভূমিহীন ভূমিজ প্রজাদিগকে বছর ছয়-সাত পূর্বে ফকির সাহেবের নির্দেশমতে নির্দিষ্টহার বন্দোবস্ত করে দেয়।*" ষোড়শীর নানা সংকটে ফকির হয়েছেন তার নিঃস্বার্থ অবলম্বন। চরিত্রটিকে কিছুটা নাটকীয় এবং ভিত্তিহীন মনে হলেও শবৎচন্দ্র তাঁকে দিয়ে উপন্যাসেব স্বার্থসিদ্ধি করার অনেক প্রয়াস পেয়েছেন।

স্বভাবতই স্বার্থান্বেষী হিন্দুরা ফকিরকে মেনে নিতে পারেনি। জনার্দন রায়ের সংলাপে শরৎচন্দ্র আমাদের শুনিয়েছেন সেই অনিবার্য ধর্ম-অজুহাত। ফকিরকে জনার্দন বলেছে, "*আপনি মুসলমান, বিদেশী, আপনার ত হিন্দুধর্মের মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থ হবার দরকার নেই।*" এ হল মানবিকতা-বিরোধী ধর্ম। শরৎচন্দ্র ফকির-ভৈরবীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেন প্রকৃত ধর্মের বাতাবরণ যা বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িক নয়, মানবিক। তখন, উপন্যাসের স্বতোৎসারিত প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেয় শরৎচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত প্রাবন্ধিক সাম্প্রদায়িকতা।

অথচ, তাঁর অন্যতম প্রধান এবং একমাত্র তথাকথিত রাজনৈতিক উপন্যাস *পথের দাবি* (১৯২৬) মুসলমান-সমাজকে পাশে সরিয়ে রাখে। সব্যসাচীর স্বাধীনতাযুদ্ধে তাদের কোনও ভূমিকা থাকে না। সব্যসাচী যে-বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবনপণ করেছে, সে-বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই মুসলমান-ধর্মাবলম্বী ও দেশের গরিষ্ঠ অভাজন, অথচ সব্যসাচীর যুদ্ধে তারা শরিক নয়। আসলে, এ-ও এক ঐতিহাসিক ট্রাজেডি। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি কিংবা জাতীয় কংগ্রেস কেউই স্বাধীনতাযুদ্ধে মুসলমান-সম্প্রদায়কে সংশ্লিষ্ট করার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

আমরা আগেই লক্ষ করেছি, শরৎচন্দ্র এ-সময় ঘটনাচক্রে কিছুটা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিলেন। এ-সময় *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা* নামে একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, *"মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটা কয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনোদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে।"* সম্ভবত শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত সাম্প্রদায়িক বোধ থেকেই সব্যসাচীকে এ-রকম মুসলমান-সহযোদ্ধাহীন করে এঁকেছিলেন। এ ছিল তাঁর সীমায়ন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজেকে অতিক্রম করে গিয়েছেন চারখণ্ড-বিস্তৃত *শ্রীকান্ত* (১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩) উপন্যাসের অন্তত দুটি চরিত্রায়ণে। দুটি চরিত্রের প্রথমটি শাহজি (প্রথম খণ্ড) এবং দ্বিতীয়টি গহর (চতুর্থ খণ্ড)। এই দুটি বিচিত্র চরিত্রের দ্যোতনা এবং বিড়ম্বনা তাঁকে অনেকটাই চিনতে সাহায্য করে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট তৃতীয় আরও-একটি মুসলমান-চরিত্র রয়েছে, গফুর মিঞা (*মহেশ* গল্পে)। তার কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসটি ১৩২২ সালের মাঘ মাস থেকে *ভারতবর্ষ* মাসিক পত্রিকার প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় রচনাটি ভ্রমণকাহিনি-রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল, শিরোনাম ছিল *শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী*। শরৎচন্দ্র 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা' ছদ্মনামে উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন। একটানা ১৩২৩ সালের মাঘ-মাস পর্যন্ত লিখে শরৎচন্দ্র প্রথম খণ্ড শেষ করেন। পত্রিকা-রচনা বই-আকারে বের হয় ওই মাসেই (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭)।

উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রথম শাহজির দেখা পাই আমরা। তরুণ শ্রীকান্তকে নিয়ে ইন্দ্রনাথ এসেছে তাঁর দিদির কাছে, দিদি অন্নপূর্ণার স্বামী এই শাহজি। শরৎচন্দ্র লিখছেন :

> *...সেই পর্ণকুটীরের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলা-গোছের লোক প্রবল কাসির পর হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোটবড় মালা। গায়ের জামা এবং পরনের কাপড় অত্যন্ত মলিন এবং এক প্রকার হলুদে রঙে ছোপানো।*

তাহার লম্বা দাড়ি বস্ত্রখণ্ড' দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই ; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্বে তাহাকে প্রায় সর্বত্র দেখিতাম। আমাদের বাটীতেও তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহজী সম্বোধন করিল এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া, আদেশ পালন করিতে লাগিয়া গেল এবং প্রস্তুত হইলে শাহ্জী সেই কাসির উপর ঠিক যেন 'মরি-বাঁচি' পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নাকেমুখে বাম করতল চাপা দিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, পিয়ো।

এই শাহ্জিকে শরৎচন্দ্র অদ্ভুত দক্ষতায়, খুবই স্বল্প পরিসরে একটি পূর্ণাবয়ব চিত্রের মতোই ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা জেনেছি, আদতে সে হিন্দু-ব্রাহ্মণ হলেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলমান হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী অন্নদা হিন্দু-রমণী। তিনি শাঁখা-সিঁদুর-শোভিত। প্রেমকে পাথেয় করে অন্নপূর্ণা খুনি শাহ্জির জন্য কুল ছেড়েছিলেন যুবতী-বয়সে, যার পরিণতিতে তার জীবনে নেমে আসে ঘনঘোর ট্র্যাজেডি, অবমাননা, অত্যাচার, দারিদ্র্য, বৈধব্য।

শাহ্জির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র একই চরিত্রে দুটি ধর্ম আরোপ করেছেন। আমরা লক্ষ করি, মুসলমানে ধর্মান্তরিত হওয়া তার কাছে কোনওরূপ বর্ণ-শোষণ, ধর্মীয় আবেগ বা প্রণোদনায় নয়, নিজের অপরাধ ও ধর্মহীনতার কারণে। আশ্চর্যের বিষয়, আখ্যানের শেষাংশে আমরা জানতে পারি, শাহ্জি যতই নির্মম-প্রকৃতির হোক, স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে সে নিজের মতো ধর্মাচরণ করতে কোনও বাধা দেয়নি। শরৎচন্দ্র চিরকালই হিন্দু-বাঙালি নারীকে রেখেছেন পূজার আসনে (নামটি লক্ষণীয়), ফলে এখানেও অন্নপূর্ণা নির্জন বনের আড়ালায়িত কুটিরে বাস করেও সন্তর্পণে নিজের ধর্ম রক্ষা করতে পেরেছিল। আমরা লক্ষ করি, শাহ্জি আত্মগোপনেব জন্য কেবল ধর্মই ছাড়েনি, ভাষাও ছেড়েছিল। অথচ, প্রেমহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন একটি মানুষ কেন স্ত্রীকে ছাড়তে পারেনি, তা এখানে স্পষ্ট নয়। শরৎচন্দ্র যেমন সাধারণত সাদার পাশে-কালো চরিত্র আঁকেন, শাহ্জিকেও অনুরূপ উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করেছেন।

পাশাপাশি ইন্দ্রনাথ এবং শ্রীকান্তর মতো দুটি নিষ্পাপ অভিযান-প্রিয় কিশোরের মধ্যেও আরোপ করেছেন সাম্প্রদায়িকতার সংস্কার। শাহ্জির অরণ্যাশ্রিত কুটিরে শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছে, '*তোমার দিদিকে টাকা দিতে যাবে না?*' শ্রীকান্ত বলেছে, '*দিদির জন্যই তো বসে আছি। এই তো তার বাড়ি।*' শ্রীকান্তর কৌতূহল, '*এই তোমার দিদির বাড়ি। এরা তো সাপুড়ে, মুসলমান!*' পরে ইন্দ্রনাথ অন্নদাকে অনুমান আর সংস্কারে বলেছে, '*তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।*' দিদি বললেন, '*...তিনি যখন* (জাত) *দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বৈ ত নয়। নইলে*

আমি নিজে হ'তে জাতও দিইনি—কোন দিন কোন অনাচারও করিনি।' সমাজে দুটি ভ্রূক্ষেপহীন কিশোরের মনেও ধর্ম-সংস্কার যে কত প্রবল, তা এ-ভাবে জানান শরৎচন্দ্র।

কিন্তু, এই উপন্যাসেই আমরা দেখেছি, ধর্মসংস্কার কোনও বাধা হয়নি গহর গোঁসাইয়ের কাছে। ধর্মীয় সংস্কারের কাছে এই চরিত্রটি কখনও যেমন মাথা নত করেনি, অনায়াসেই বৈষ্ণব ভাবাদর্শে প্রাণিত হতে পেরেছে, তেমনই বৈষ্ণবী কমললতাও তাকে কেবল আখড়ায় গান গাইতেই দেয়নি, হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করেছে তার অবিনশ্বর, দু-কূল-প্লাবী নিঃস্বার্থ প্রেম। কিন্তু সমাজ? সে অচলায়তনই থেকে গিয়েছে। মুসলমান গহরের মৃত্যুশয্যায় তাকে শুশ্রূষা করার 'অপরাধে' কমললতাকে বৈষ্ণব-আখড়া থেকে বিতাড়িত হতে হয়। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্বের পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখেছেন :

> *গহরের খোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুশি হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারী রুক্ষ ; বলিল, দেখুন গে ঐ বোষ্টমী বেটীদের আড্ডায়। কাল থেকে তো ঘরে আসাই হয়নি।*
>
> *সে কি কথা নবীন! বোষ্টমী এলো আবার কোথা থেকে? কোথা থাকে তারা?*
>
> *ঐ ত মুরারিপুরেব আখড়ায়। এই বলিয়া নবীন হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হায় বাবু, আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মথুরাদাস বাবাজী ম'লো তার জায়গায় এসে জুটল এক ছোকরা বৈরিগী, তার গণ্ডা চারেক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরিগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব, সেখানেই ত প্রায় থাকেন।*
>
> *আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমার বাবু ত মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈরাগীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাকতে দেবে কেন?*
>
> *নবীন রাগ করিয়া কহিল, ঐসব আউলে-বাউলেগুলোর ধম্মাধম্ম জ্ঞান আছে নাকি? ওরা জাত-জন্ম কিছুই মানে না, যে-কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাচ-বিচার করে না।*
>
> *জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ-সাত দিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলেনি?*
>
> *নবীন বলিল, বললে যে কমলিলতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়ত। সে-কয়দিন বাবু আখড়ার কাছেও যায়নি। আর যেই আপনি চলে গেলেন, বাবুও অমনি খাতা-কাগজ-কলম নিয়ে আখড়ায় গিয়ে ঢুকলেন।*
>
> *প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিলাম দ্বারিক বাউল গান বাঁধিতে, ছড়া রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায়, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী—এই*

আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়। বৈষ্ণব সেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রাচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে করিয়াছে।

পরে নবীন তার প্রভু সম্পর্কে জানাতে গিয়ে শ্রীকান্তকে বলেছে, "(গহরের) *বাপ বহুত রেখে গেছে মানি, কিন্তু বিলোলে ক'দিন বাবু? একদিন বললে কি জানেন? বললে, আমরা ফকিরের বংশ, ফকিরি আমার ত কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না? শুনুন কথা।*" খুবই স্বল্পায়তনে শরৎচন্দ্র যে-ভাবে ধর্মচিহ্নহীন এই গহর-চরিত্রটি আঁকেন, তাতে তিনি উপন্যাসের শ্রীকান্তের মতো (শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের আত্মজৈবনিক উপন্যাস, মনে করেন সাহিত্য-বিশেষজ্ঞরা) দাবি করতেই পারেন (সভা-সমিতির ভাষণে যা-ই বলুন তিনি তর্কের খাতিরে) যে :

যদিচ ধর্মাচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদেরও বিঘ্ন ঘটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি, ঐ গুরুতর বিষয়ের কোন অন্ধিসন্ধি আমি কোনকালে খুঁজিয়া পাইব না। তথাপি ধামকদের আমি ভক্তি করি। বিখ্যাত স্বামীজী ও স্বখ্যাত সাধুজী—কাহাকেও ছোট-বড় করি না, উভয়ের বাণীই আমার কর্ণে সমান মধুবর্ষণ করে।

—প্রাগুক্ত

আমরা জানি, এই মধুবর্ষণের কাজটিই তিনি করে গিয়েছেন তাঁর সাহিত্যসমগ্রে।

কাজী নজরুল ইসলাম : হিন্দু না মুসলিম

সাহিত্যের সঙ্গে নদীর তুলনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্য বারবার নদীর মতোই বাঁক পরিবর্তন করেছে। বিষয়ে-বিন্যাসে সে নিরন্তর পাল্টেছে তার গতিপথ—উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর বিভঙ্গে, কল্লোলে সে বয়ে গিয়েছে মহাকালের দিকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে যেমন সঠিক কারণেই 'বঙ্কিমপর্ব' বলে চিহ্নিত করা হয়, তেমনই বিশ শতকের প্রথমাংশ (১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির পর) আচ্ছন্ন হয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বর্ণচ্ছটায়। কিন্তু, ১৯৩০ সালের পর রবীন্দ্রনাথের মায়াপাশ ছিন্ন হতে থাকে তরুণ লেখকগোষ্ঠীর নতুনতর জীবনবোধ, বিদ্রোহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুর্দম প্রাবল্যে। এর আগে শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য আমাদের বাস্তবতার কঠোর ছবি দেখিয়েছিল, কিন্তু তিনের দশকের লেখকরা সাহিত্যের মুখচ্ছবিটি, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে একেবারে সরে এসে, সম্পূর্ণ নতুন করে আঁকলেন। সামাজিক ভাঙচুর, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মূল্যবোধের দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্ব এইসব নতুন প্রজন্মের কথাসাহিত্যিকদের (কবিতায়ও লেগেছিল তার ছোঁয়া) রচনাকে করে তুলছিল দুর্বিষহ, প্রবল, পরুষ। *কল্লোল* (১৯২৩), *কালিকলম* (১৯২৩), *প্রগতি* (১৯২৭) ইত্যাদি পত্রিকাগুলিকে নির্ভর করে উঠে আসছিলেন বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রজন্মের লেখককুল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ লেগেছিল তাঁদের গায়ে। ফলে তাঁরা আর রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ভাবধারায় আবিষ্ট থাকতে পারেননি। বিদেশি দর্শন, সমাজ-বাস্তবতা তাঁদের প্রাণিত করেছিল নতুনতর সৃষ্টিসুখের উল্লাসে। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এবং কার্ল মার্কসের দর্শন তাঁদের যুগপৎ প্রণোদিত করছিল। কল্লোলীয় তরুণরা রবীন্দ্রনাথকে কোনও বিরূপ চোখে দেখেননি—যেমন দেখেছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ লেখকরা। *কল্লোল*-এর লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেও তাঁকে অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে পুরাণচারী হিন্দুধর্মের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল যোগেশচন্দ্র বসুর *বঙ্গবাসী* (১৮৮১), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের *হিতবাদী* (১৮৯১), সুরেশচন্দ্র সমাজপতির *সাহিত্য* (১৮৯০)। এইসব পত্রিকায় হিন্দুধর্মের নানা রক্ষণশীলতাকে আলোকিত করা হল। অন্যদিকে, *সঞ্জীবনী* (১৮৮৩) পত্রিকা আঘাতে জর্জরিত করা শুরু করল হিন্দুধর্মের যাবতীয় সংস্কারকে। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিন্দুত্ববাদ সাহিত্যের অবলম্বন হিসাবে অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারীরা স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের গুণগ্রাহী ছিলেন না। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ বারবার আচ্ছন্ন হয়েছেন নিন্দার কালো মেঘে। এমনকী, পরে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে অবাস্তবতার প্রাবল্য লক্ষ করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের

পাশাপাশি একধরনের সাহিত্য-বাস্তবতা নির্মাণ করতে পারলেও, অন্যরা সে-ক্ষেত্রে সমালোচনা করেই রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের সূক্ষ্ম বাস্তবতা অনুধাবন করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রানুসরণকে যেমন মেনে নেননি শরৎচন্দ্র, তেমনই কবিতার মতো কথাসাহিত্যেও স্বাতন্ত্র্য দেখাতে পেরেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬)। কথাসাহিত্যের আলোচনায় নজরুলের অবদান বিশেষ-আলোচিত নয়। কিন্তু তিনিই বাংলা আধুনিক কথাসাহিত্যে মুসলমান-চরিত্র ও মুসলমান-সমাজের অন্যতম রূপকার। মির মোশারফ হোসেনের রচনায় (*বিষাদসিন্ধু*) আমরা আগে মুসলমান-জনজীবনের ছবি দেখেছি ঠিকই, কিন্তু তা পুরাণাশ্রিত। নজরুলই সহজ-সাধারণ মুসলমান-প্রেক্ষিত রচনা করে বাংলা কথাসাহিত্যকে এক নতুন মাত্রা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন এক সাম্প্রদায়িক বাতাবরণে। কিন্তু তাঁর জীবনযাপন ও রচনায় যে-অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, তা খুবই দুর্লভ। ধর্মের সঙ্গে যুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি ধর্মকে সমন্বয়বাদী ও অসাম্প্রদায়িক করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খানকে একটি চিঠিতে নজরুল লিখেছিলেন :

> *হিন্দু-মুসলমানে পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে।*
>
> —*নজরুল রচনা সম্ভার (সং আবদুল কাদির)*

নজরুল নিজের জীবনযাপনে অনুসরণ করেছেন এই অসাম্প্রদায়িক পথ। তিনি হিন্দু-রমণী আশালতা সেনগুপ্তকে বিয়ে করেছেন। তাঁকে ধর্মান্তরিত করেননি। প্রমীলা নজরুল নামে পরে পরিচিত হয়েছিলেন আশালতা। পুত্রদের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ, অরিন্দম খালেদ, কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ। অবশ্য তাঁর এই 'হিন্দুয়ানি'-র জন্য তিনি গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী বা কট্টর মুসলিম মৌলবাদীদের কাছে প্রবল সমালোচিত হয়েছেন। সে-প্রসঙ্গে নজরুল লিখেছেন :

> *আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনোদিন অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ে না।...হিন্দুরা লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহ যে নিবিড় প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না।...আজিকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ...আমি যত বেশী অসাম্প্রদাযিক হই না কেন।*
>
> — প্রাগুক্ত

নজরুলের গান ও কবিতার মতো তাঁর কথাসাহিত্যেও এই চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল।

মোট তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন নজরুল—*বাঁধনহারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০) এবং *কুহেলিকা* (১৯৩১)। তিনটি উপন্যাসেই তিনি মুসলিম-জনজীবনকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু, সেখানেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও আধুনিকতা আমরা লক্ষ করেছি। মুসলমান-সমাজের নানা অন্ধকারে তিনি যেমন আধুনিকতার আলো জ্বেলেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন, তেমনই খ্রিস্টান বা হিন্দু-চরিত্রের উদ্ভাবন করে জনজীবনকে পূর্ণতার মাত্রা দিতে চেয়েছিলেন। মুসলমান-সমাজের নানা অন্ধ সংস্কারকে উপন্যাসে তিনি যেমন সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন, তেমনই হিন্দু বা খ্রিস্টান-চরিত্র ও সংস্কৃতিকে পাশাপাশি রেখে তিনি দেখাতে চেয়েছেন জীবনের তুলনায় ধর্ম কখনও বড় হয়ে উঠতে পারে না।

বাঁধনহারা উপন্যাসে তিনি যেমন আয়েসা বা রোকেয়ার মতো মুসলমান-নারীর পাশে এক ব্রাহ্মণ-শিক্ষয়িত্রীর চরিত্র এঁকেছেন, তেমনই *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে নজরুল খিদের জন্য ধর্মান্তরিত রোমান-ক্যাথলিক মধু ঘরামি ও তার কন্যা কুর্শিকে স্থাপন করেছেন মুসলমান অন্ত্যজ সমাজের পটভূমিকায়। প্যাঁকালে মুসলমান হয়েও ইসলামি বিধান-অনুযায়ী ভ্রাতৃবধূকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি মানবিক সংস্কারের বশে। অন্যদিকে ধর্মান্তরিত কুর্শির প্রেমে পড়ে সে যেমন ধর্মান্তরিত হতেও দ্বিধা করেনি, আবার কলমা পড়ে মুসলমান হতেও আটকায়নি তার। নজরুল এইসব অসহায় চরিত্রগুলির প্রতি স্বতই সহানুভূতিশীল, অন্যদিকে মৌলবি বা পাদ্রিদের তিনি সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন—তারা যে-ভাবে দরিদ্র, সাধারণ মানুষের অসহায়তার সুযোগে ধর্মের ব্যবসা করে, তা নজরুলের লেখনী-রোষ থেকে রেহাই পায়নি।

বাঁধনহারা উপন্যাসের নায়িকার নাম 'সাহসিকা'। নজরুল তাঁর কণ্ঠে যেন নিজেই কথা বলেছেন। সাহসিকা তার বান্ধবীকে চিঠিতে লিখেছে :

> *ধর্ম সম্পর্কে আমার আর একটু বলবার আছে। আমি তো পূর্বেই বলেছি যে, সব ধর্মেরই ভিত্তি চিরন্তন সত্যের পর—যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনও রয়েছে এবং অনন্তেও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা ফেলতে পারিস। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম। আমি তো কোনো ধর্মের বাইরের (সাময়িক সত্যরূপ) খোলসটা ধরে নেই। গোঁড়া ধার্মিকদের ভুল তো ওইখানেই। ধর্মের আদতে সত্যটা না ধরে এঁরা ধরে আছেন যত সব নৈমিত্তিক বিধি-বিধান। এঁরা নিজের ধর্মের উপর এমনই অন্ধ অনুরক্ত যে, কেউ এতটুকু নাড়াচাড়া করতে গেলেও ফোঁস করে ছোবল মারতে ছোটেন। কিন্তু এটুকু বোঝেন না তাঁরা যে তাঁদের 'ইমান' বা বিশ্বাস, তাঁদের ধর্ম কত ছোটো কত নীচ কত হীন যে, তা একটা সামান্য লোকের এতটুকু আঁচড়ের ঘা সইতে পারে না। ধর্ম কি কাচের ঠুনকো গ্লাস যে, একটুতেই ভেঙে যাবে?*

ধর্ম যে ধর্মেরই মতন সহ্যশীল, কিন্তু এ সব বিড়াল-তপস্বীদের কাণ্ড দেখে তা কিছুতেই মনে করতে পারিনে।...এই সব কারণেই, ভাই, আমি এই রকম ভণ্ড আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বেশি ভক্ত, বেশি পক্ষপাতী।

কুহেলিকা উপন্যাসটির অবলম্বন রাজনীতি। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ইংরেজের সুচতুর রাজনীতি এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। সাহিত্য-আলোচক লায়েক আলি খান লিখেছেন :

'কুহেলিকা' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রাজনীতি। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাসে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে চিন্তিত নজরুল নিতান্ত সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজদের রাজনৈতিক মনোভূমির পরিমাপ করেছেন। উপন্যাসের এটাই বাস্তব দিক। এবং বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসধারায় 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি নতুন দিগন্ত নির্ণায়কও বটে।

কুহেলিকা উপন্যাসটিতে স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কে মুসলমান-সমাজের যে-দ্বিধাদীর্ণ মনোভাব, তা ঐতিহাসিক সত্য। নজরুলের আগে বা পরে মুসলমান-সমাজকে অন্য-কোনও লেখক এ-রকম গভীরভাবে দেখতে পারেননি।

সামাজিকভাবে অগ্রগণ্য হিন্দুদের পাশে পশ্চাদবর্তী মুসলমান-সম্প্রদায় অন্যান্য বিষয়ের মতো স্বাধীনতা-আন্দোলন নিয়েও হীনম্মন্যতায় ভুগেছে। হিন্দু যেমন মুসলমান প্রতিবেশীকে কখনও সমকক্ষ করে তোলার প্রয়াস পায়নি, উপরন্তু তাকে ঘৃণা করেছে, তেমনই মুসলমানও ধর্মীয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকে হিন্দুব প্রতি অনুভব করেছে ঈর্ষা ও বিভেদ। আর, দুই সম্প্রদায়ের এই টানাপোড়েনকে কাজে লাগিয়েছে সুচতুর ইংরেজ। ভেদাভেদের, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিকে স্বাধীনতা-আন্দোলনের কাঁটা হিসাবে ব্যবহার করেছে। নজরুল *কুহেলিকা* উপন্যাসে এই বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন খুবই বিশ্লেষণী মনস্কতায। নজরুল দেখিয়েছেন, মুসলমানরা মনে করছে দেশের স্বাধীনতার অর্থ হিন্দু-শাসনের প্রতিষ্ঠা, তাতে আখেরে মুসলমানের কোনও লাভ নেই। অন্য দিকে হিন্দু-নেতৃত্বও মুসলমানকে সঠিক দেশপ্রেমিক বলে ভাবতে পারেনি। নজরুল তাঁর উপন্যাসের হিন্দু-চরিত্র প্রমত্তর মাধ্যমে এইসব সমস্যাগুলিকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনই তার সমাধানের পথ খুঁজেছেন।

কুহেলিকা উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গিরকে এক অস্থির-মনস্ক মানুষ হিসাবে এঁকেছেন নজরুল। কলকাতার এক বিখ্যাত বাইজি ফিরদৌস বেগমের গর্ভে তাঁর জন্ম। সেই নারী জাহাঙ্গিরের পিতার রক্ষিতা, বিবাহিতা-স্ত্রী নন। জন্মের এই লাঞ্ছনা নিয়ে জাহাঙ্গির মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। কিন্তু সেখানেও সে স্ফূর্ত হতে পারেনি। হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য জাহাঙ্গিরকে স্বাধীনতাব্রতে বিকশিত হতে দেয়নি। মুসলমানের দেশপ্রেমে সংশয় জেগেছে সতীর্থ হিন্দুদের। অন্যদিকে দেশকে 'জননী' ভাবার মন্ত্রেও সে দীক্ষিত হতে পারেনি অন্তর্গত মানসিক

বাধায়। প্রেমিকা চম্পার সঙ্গে তার মানসিক দ্বন্দ্ব ও রিরংসার নিয়ন্ত্রকও সেই অপার সামাজিক-তথা-ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার বোধ।

এখানে উদারমনস্ক প্রমত্ত জাহাঙ্গিরকে সান্ত্বনা ও সান্নিধ্য দিয়ে দুই সম্প্রদায়ের বিভেদকে মুছে দিতে চেয়েছে। তাকে মানসিক সুস্থতার দিকে পৌঁছে দিতে চেয়েছে। আমরা লক্ষ করি, এই উপন্যাসের মাধ্যমে নজরুলই প্রথম হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে যুগপৎ রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে দেখেছিলেন। কবিতা ও গানেও তাঁর এই প্রণোদনা আমরা লক্ষ করেছি। দেশকে মাতৃরূপে গ্রহণ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যই স্বাধীনতার সর্বোত্তম বিঘ্ন, তা তিনি সম্যক অনুভব করেছিলেন। তিনি লিখতে পেরেছিলেন : *'হিন্দু না মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!'*

বলা অতিরিক্ত, এই সম্প্রীতিই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞান।

তারাশঙ্কর : পঞ্চগ্রামের পাঁচালি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) উপন্যাসে রাঢ় বাংলার গ্রামীণ জীবন খুব সাবলীল বিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ, সামন্ততন্ত্র, প্রকৃতির সামগ্রিকতায় তা অনেকক্ষেত্রেই মহাকাব্যিক গভীরতাকে স্পর্শ করে। বিশেষত তাঁর *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯), *কালিন্দী* (১৯৪০), *গণদেবতা* (১৯৪২) ও *পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৪) উপন্যাসগুলির বিস্তার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এর আগে শরৎচন্দ্র পল্লিসমাজ নিয়ে উপন্যাস লিখলেও তারাশঙ্করের রচনা তা থেকে আলাদা। তারাশঙ্করের একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ছিল, শরৎচন্দ্রের তা ছিল না। অন্যদিকে, তারাশঙ্করের এই উপন্যাসগুলিতে প্রধানত রাঢ়বঙ্গের জীবনযাত্রার এক ক্রম-পরিণতি লক্ষ করা যায়। *ধাত্রীদেবতা* বা *কালিন্দী*-তে মধ্যযুগীয়-জীবনবোধে-লালিত জমিদারতন্ত্রের উপর আধুনিকতার প্রভাব ও দ্বন্দ্ব এবং *গণদেবতা* ও *পঞ্চগ্রাম*-এ রাঢ়ের এক জনপদের অধিবাসীদের জটিল জীবনযাত্রার পরিচয় খুব স্পষ্ট।

গণদেবতা ও *পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসদুটি আসলে একে অন্যের পরিপূরক। দুটি উপন্যাস মিলে একটিই উপন্যাস। উপন্যাসদুটির পটভূমি ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত পাঁচটি গ্রাম এবং সেইসব গ্রামের সরল ও জটিল জনজীবন। অতীত ও বর্তমানের সময়সীমায় এই উপন্যাস একটি বিশেষ জনজীবনকে অবলম্বন করলেও তা শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে এই সুবিস্তৃত দেশেরই এক সীমাহীন ইতিহাস—ঐতিহ্য এই উপন্যাসের এক কেন্দ্রীয় শিকড় হয়ে ওঠে। প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গৌরব আর ভাঙন এই উপন্যাসে খুবই সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে। পঞ্চায়েতের ভাঙনের পাশাপাশি মানুষের মূল্যবোধের ভাঙনের ছবি তারাশঙ্কর এই দুটি উপন্যাসে যে-ভাবে এঁকেছেন, তাতে তিনি এক মহান সামাজিক ঐতিহাসিক বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হন। বস্তুত, শরৎচন্দ্র *পল্লী-সমাজ*, *দেনাপাওনা*, *পণ্ডিতমশাই*, *বামুনের মেয়ে* ইত্যাদি উপন্যাসে যে-কাজটি শুরু করেছিলেন, তা সার্থকভাবে শেষ করেছেন তারাশঙ্কর—এমনকী, কখনও তিনি পূর্বজকে অতিক্রমও করে গিয়েছেন সাফল্যের নিরিখে।

তারাশঙ্করের বিশেষত্ব এখানে যে, তিনি এই উপন্যাসে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটি সম্পর্ক-অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি, তিনি কখনও অতীত নিয়ে নিছক কল্পনা ও রোমান্টিকতায় গা ভাসাননি, তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্য-নির্ভরতার যুগপৎ সমারোহে উপন্যাসটির বিস্তার ঘটিয়েছেন।

উপন্যাসের শুরুতে আমরা পড়ি :

> *চণ্ডীমণ্ডপটিও বহুকালের এবং এককোণ ভাঙা হইয়া আছে ; মধ্যে নাটমন্দির। তার চাল কাঠামো হাতীশুঁড়-বড়দল-তীরসাঙা প্রভৃতি হরেক রকমের কাঠ দিয়া যেন অক্ষয় অমর করিবার উদ্দেশ্যে গড়া হইয়াছিল। নিচের মেঝেও সনাতন*

পদ্ধতিতে মাটির।...এই চণ্ডীমণ্ডপটি একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, সমস্ত জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থল। পূজাপার্বণ, আনন্দ, উৎসব, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সব অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। অন্যায়-অবিচার-উৎপীড়ন, বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার-পাপ গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে, এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিত পঞ্চায়েৎ। এই আসরে বসিয়া বিচার চলিত, শাসন করিয়া সে সমস্ত দূর করা হইত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে হাঁক দিলে গ্রামের সমস্ত ঘর হইতে সে ডাক শোনা যায়,—সে ডাক উপেক্ষা করিবার কাহারো সামর্থ্য ছিল না।

এইরকম নানা সুবিস্তৃত বর্ণনায় লেখক চণ্ডীমণ্ডপকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু ও অমোঘ প্রতীক করে তুলেছেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে আমরা তা লক্ষ করি। চণ্ডীমণ্ডপের প্রতীকে লেখক গ্রামের পরিবর্তনের, ব্যক্তি ও সমাজের বিবর্তনের রূপটি তুলে ধরেছেন একেবারে অব্যর্থ প্রক্রিয়ার বর্ণনায় :

তখন গ্রামে ব্যক্তিগত বৈঠকখানা বা বাহিরের ঘর কাহারও ছিল না।...তারপর ক্রমে ক্রমে অনেকের বাড়ীতেই একটি করিয়া বাহিরের ঘরের পত্তন হইল। সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া এখন অনেকগুলি ছোট ছোট মজলিস বসে। কেহ কেহ বা একাই একটি আলো জ্বালিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

বস্তুত, এই সামাজিক ভাঙন এবং তার নানা অভিঘাতই এই উপন্যাসের পরতে-পরতে জড়িয়ে রয়েছে। আমরা এই ভাঙনের আরও বিস্তার ও বীভৎসতা লক্ষ করি *গণদেবতা*-র দ্বিতীয় খণ্ড *পঞ্চগ্রাম*-এ। সেখানে গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশীর টানাপোড়েন ক্রমশই খুব জ্বলন্ত হয়ে ওঠে। কাহিনি তখন শিবকালীপুর গ্রাম থেকে ছড়িয়ে পড়ে পঞ্চগ্রামে। *গণদেবতা* ও *পঞ্চগ্রাম*-এ তারাশঙ্কর সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। তাবাশঙ্কর যে-সময়ে লিখছেন, তখন দেশে সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অনেকটাই থিতিয়ে এসেছে, অন্যদিকে শুরু হয়েছে গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলন। তারাশঙ্কর এর আগেই প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় দশবছর যুক্ত ছিলেন কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে। *ধাত্রীদেবতা* উপন্যাসে আমরা তাঁর এই রাজনীতি-মনস্কতা লক্ষ করেছি। এই উপন্যাসে আমরা কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবনাথের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ-ঊর্ধ্ব গণ-আন্দোলনের বিকাশ দেখেছি। পরে *গণদেবতা* ও *পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসে এই গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়েছে। তবে, তারাশঙ্কর যে এইসব সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক উপন্যাসের সুপরিণতি ঘটাতে পেরেছেন, তা নয়।

দুটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবু ঘোষ প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-ব্যবস্থার প্রতিনিধি। সে স্বভাবতই ধর্মীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন। প্রাথমিকভাবে তার আশা, কোনও অলীক দেবতা এসে যাবতীয় সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবিধান করবে। ঘটনা-পরম্পরায়

জেলে গিয়ে সে রাজনৈতিক বন্দিদের সান্নিধ্যে আসে। তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে থাকে। সে কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সহযোগী হিসাবে পায় মানবতাবাদী ও রাজনীতি-সচেতন ইরসাদকে। *গণদেবতা*-র এই আখ্যান জটিল ও বিস্তারিত হয় *পঞ্চগ্রাম*-এ। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই উপন্যাস দেবু ঘোষের-তথা-পঞ্চগ্রামের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরণের ছবিটি স্পষ্ট করে দেয়। তিন বছরের কারাদণ্ডের পর গ্রামে ফিরে এসে সে দেখল *'পঞ্চগ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে'।* সে তখন বৃহত্তর গণ-আন্দোলন, ধর্মঘটের ডাক দেয়।

ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর উপন্যাসে লিখেছেন হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল আখ্যান। আমরা দেখেছি, জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে যে-অনিবার্য শ্রেণি-বিন্যাস, শ্রেণি-ঐক্য গড়ে উঠছে, তা এই উপন্যাসের এক নিয়ন্ত্রণশক্তি হয়ে উঠছে। আসন্ন ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে জমিদারশ্রেণি যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, প্রজাশ্রেণি তেমন হতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তাদের ঐক্যের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে-ক্ষেত্রে স্বভাবতই ইন্ধন জুগিয়েছে জমিদারশ্রেণি। আমরা দেখছি, চাষিদের শ্রেণিচেতনা প্রতিহত হচ্ছে মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে। তারাশঙ্কর সামাজিক ইতিহাসের সত্যতাকে এখানে অবিকল পরিস্ফুট করেছেন। ধর্মীয় ভেদাভেদ কীভাবে শ্রেণিস্বার্থের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে, লেখক এখানে তা দেখিয়েছেন রহমের ঘটনায়। হিন্দু-জমিদারের লাঠিয়ালরা যখন রহমকে খেত থেকে অপহরণ করে কাছারিবাড়িতে বন্দি করে রাখে, তখন কেবল মুসলমান-চাষিরাই তাকে মুক্ত করার জন্য দলবদ্ধ হয়ে জমিদারবাড়িতে চড়াও হয়। অন্যদিকে, জমিদার ও প্রজাদের সংঘর্ষ বাধার মুখে দেবু ঘোষই তাকে মুক্ত করে। কিন্তু ওই মুসলমান-প্রজারাই দেবুর বিরুদ্ধে হিন্দু-জমিদারের কুৎসা-প্রচার বিশ্বাস করে। দৌলত শেখ পরিস্থিতির সুযোগে মুসলমান-প্রজাদের দাঙ্গায় প্ররোচিত করে। দাঙ্গা শেষপর্যন্ত ঠেকানো গেলেও সম্মিলিত চাষিদের ধর্মঘট ভেস্তে যায়। জমিদারের স্বার্থসিদ্ধি হয়। দৌলত শেখ সমর্থ হয় মুসলমান-প্রজাদের সঙ্গে দেবু ঘোষের সুসম্পর্ক ভেঙে দিতে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তারাশঙ্কর একদিকে যেমন মুসলমান-জনজীবনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করেছেন, তেমনই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের টানাপোড়েনও অব্যক্ত রাখেননি। তিনি লিখেছেন:

> *মুসলমানদের সাহস জিনিসটা অনেকাংশে সম্প্রদায়গত সাধনারও জিনিস। তাহার উপর অজ্ঞতা-অসামর্থ্য-দারিদ্র্য-নিপীড়িত জীবনের বিক্ষোভ, যাহা শাসনেপেষণে লুপ্ত হয় না—সুপ্ত হইয়া থাকে অন্তরে অন্তরে, সেই বিক্ষোভ তাহাদিগকে স্বতঃই সম্মিলিত করে একই সমবেদনার ক্ষেত্রে। ইহাদের সদ্যজাগ্রত বিক্ষোভ কিছুদিন হইতে জমিদারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের মুক্তি-পথে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল—আগ্নেয়গিরির গহ্বরমুখ-মুক্ত অগ্নিধূমের মত।*

এবং সেই অগ্নিধূম যখন প্রতিবাদী মুসলমান-প্রজাদের অনিবার্যভাবে দাঙ্গার মুখে ঠেলে দেয়, তখনই :

একটা 'মার মার' শব্দ সবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ধ্বনিটা উঠিবার প্রারম্ভ-মুহূর্তেই পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—না ভাই সব, দাঙ্গা করতে আমরা আসি নাই। আমরা আমাদের রহম চাচাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। এস রহম চাচা, উঠে এস।

বিভেদের পাশে যে সম্মিলনের উদাহরণ থাকেই, তা এইভাবে বিবৃত করেছেন তারাশঙ্কর। এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা লিখেই নিবৃত্ত হননি তিনি। আরও বৃহত্তর মিলনের কথা বলেছেন :

...চারিপাশের গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রজা ধর্মঘটের আয়োজনটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। খাজনা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রজা-ধর্মঘটের আয়োজনটা এই আকস্মিক ঘটনার সংঘাতে অভাবনীয় রকমে শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

কিন্তু, সেই শক্তি সদর্থক পথে চালিত না-হয়ে দাঙ্গার ফাঁদে পা দিয়ে বসল :

দৌলতের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সে হাজী, হজ্ করিয়া আসিয়াছে। মুসলমান সমাজে তাহার একটা সম্মান প্রাপ্য আছে। রহম-ইরসাদই এতদিন তাহাকে অমান্য করিত ; বলিত—টাকা থাকলেই জাহাজের টিকিট কেটে মক্কা শরীফ যাওয়া যায়। হজ্ করে এসেও যে সুদ খায়, লোকের সম্পত্তি ঠকিয়ে নেয়—হজের পুণ্যি তার বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তাকে মানি না। তাহাদের সেই অবজ্ঞা সমস্ত লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। সে সঞ্চরণ তাহাকে কোন্ স্তরে টানিয়া নামাইতে চাহিতেছে, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল সে। চাকলার হিঁদুরা সমেত তাহাকে উপহাস করে, অশ্রদ্ধা করে।

তারাশঙ্কর লিখেছেন :

ইরসাদ বলিল—কি চাচা, গরিবানদের সাথে কথাই বলেন না যি গো।

দৌলত বলিল—কি বুলব ইরসাদ, বুলতে শরম লাগছে আমার।

জগন বলিয়া উঠিল—আরে বাপরে! শেখজীর শরম লাগছে যখন—তখন না-জানি সে কি কথা।

দৌলত বলিল—তুমার সাথে আমার কোন বাত নাই ডাক্তার। আমি বলছি রহমকে আর ইরসাদকে—আমার জাতভাইদিগে। আমাদিগের বড়ো সর্বনাশ। এখানে কি সাধে দৌড়াইছি? শুন হে রহম, তুমিও শুন ইরসাদ, আজ মুখুয্যেবাবু আমাকে বুললে—তুমি বলিয়ো দৌলত, তুমাদের জাতভাইদিগে—হাঙ্গাম সহজে মিটিয়ে না নিলে, তামাম কুসুমপুর আমি ছারখার করে দিব।

'গ্রামের লোকে'র পরিবর্তে 'জাতভাই' এবং 'যাহারা হাঙ্গামা করবে' তাহাদের পরিবর্তে 'তামাম কুসুমপুর' বলিয়া দৌলত নিজেও রহম-ইরসাদের আত্মীয় হইবার চেষ্টা করিল।

রহম গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক—সে সঙ্গে সঙ্গে বলিল—তামাম কুসুমপুর ছারখার করে দিবে?

ইরসাদ হাসিয়া বলিল—আপনি তো মিয়া মোকাদ্দিম লোক, বাবুদের সঙ্গে দহরম-মহরম—তামাম কুসুমপুর গেলেও আপনি থাকবেন। আপনার ভয় কি?

—না। আমিও থাকব না। আমারেও বাদ দিবে না রে। আমি বুললাম —আমি বুড়া হলাম কর্তা, আমার আর কয়টা দিন? মুসলমান হয়ে মুসলমানের সর্বনাশ আমি দেখতে পারব না।...বাবু বুললে—তবে তুমিও থাকবা না, দৌলত, কুসুমপুরে আমি হিঁদুর গাঁ বসাব। ওই জগন ডাক্তারই তখুনই গাঁয়ে এসে ভিটে তুলবে। দেবু ঘোষও আসবে। দেখুড়ার তিনুও আসবে।—ব্যাপারটা বুঝেছ?

সঙ্গে সঙ্গে ভেল্কী খেলিয়া গেল।

সঙ্ঘবদ্ধ জনতা দুই ভাগ হইয়া পরস্পরের দিকে প্রথমটা চাহিল বেদনাতুর দৃষ্টিতে, তারপর চাহিল সন্দেহপূর্ণ নেত্রে।

জগন প্রতিবাদ করিয়া একবার কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শুধু—'কক্ষণও না'—এই কথাটি ছাড়া আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না।

রহম উঠিয়া দাঁড়াইল। দেহে তার প্রচণ্ড শক্তি, উদ্ধত কোপন স্বভাব—তাহার উপর রমজানের রোজার উপবাসে মস্তিষ্ক উষ্ণ ও স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া আছে—সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। চীৎকার করিয়া সদম্ভে বলিল—তাহলে চাকলার হিঁদুর গাঁগুলানও আমরা ছারখার করে দিব।

দারুণ হট্টগোলের মধ্যে মিটিং ভাঙ্গিয়া গেল।

রমজানের পবিত্র মাস। 'রমজে'র অর্থ জ্বলিয়া যাওয়া। রমজানের মাসে রোজার উপবাসের কৃচ্ছ্রসাধনের বহ্নিতে মানুষের পাপ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। আগুনে পুড়িয়া লোহার যেমন জংমরিচার কলঙ্ক নষ্ট হয়—তেমনিভাবেই ক্ষুধার আগুনে পুড়িয়া মানুষ খাঁটি হইবে—এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই সময়টিতে উপবাসক্লিষ্ট মুসলমানদের মনে দৌলতের ওই কথাটা বারুদখানার অগ্নিসংযোগের কাজ করিল।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও উত্তেজনা নেহাৎ অল্প হইল না। গ্রামে-গ্রামে লোক জটলা পাকাইতে আরম্ভ করিল।

ইহার উপর দিন দিন নূতন নূতন গুজব রটিতে লাগিল—ভীষণ আশঙ্কাজনক গুজব। কোথা হইতে ইহার উদ্ভব—তাহার সন্ধান কেহ করিল না; সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিয়া দেখিল না। উত্তেজনার উপর উত্তেজনায়—দুই সম্প্রদায়ই মাতিয়া উঠিল।

থানায় ক্রমাগত ডায়রি হইতেছে। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যাইতেছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে, কমিশনারের কাছে, মুসলিম লীগের অফিসে, হিন্দু-

মহাসভায়। বাবুদের মোটরগাড়ীটা এই বর্ষার দিনেও কাদাজল ঠেলিয়া গ্রামের পর গ্রাম ছুটিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ীতে ঘুরিতেছে—বাবুদের নায়েব ও বাবুদের উকীল। সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায় বিপন্ন। প্রকাণ্ড এক মিটিং হইবে বাবুদের নাট-মন্দিরে। কুসুমপুরের মসজিদে মুসলমানেরা মজলিশ করিতেছে। আশপাশের গ্রামে যেখানে মুসলমান আছে—খবর পাঠানো হইয়াছে। দৌলত শেখ রহমকে পাশে লইয়া বসিয়াছে।

একা ইরসাদ কেবল ক্রমশ যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। সে কথাবার্তা বিশেষ বলে না। নীরবে বসিয়া শুধু দেখে আর শোনে। অবসর সময়ে আপনার বাড়ীতে বসিয়া ভাবে। ইরসাদ সংসারে একা মানুষ। তাহার স্ত্রী স্বামীর ঘরে আসে না। ইরসাদের বিবাহ হইয়াছে কয়েক মাইল দূরবর্তী গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান পরিবারে। শ্যালকেরা কেহ উকীল, কেহ মোক্তার। তাহাদের ঘরের মেয়ে আসিয়া ইরসাদের দরিদ্র সংসারে থাকিতে পারে না।...ইরসাদও যায় না। তালাক দিতেও তাহার আপত্তি নাই। তবে সে বলে তালাকের দরখাস্ত সে করিবে না, করিতে হয় তাহার স্ত্রী করিতে পারে। আপনার ঘরে একা বসিয়া সে সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে। রহম চাচা আজও বুঝিতে পারিতেছে না—কি হইতে কি ঘটিয়া গেল! সমস্ত গ্রামটা গিয়া পড়িয়াছে দৌলত শেখের মুঠার মধ্যে।

এইসব চক্রান্তের জালে শেষ পর্যন্ত চাষিদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট ভেঙে যায়। ময়ূরাক্ষী দিয়ে অনেক জল গড়ায়। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের উপান্তে কালো মেঘ কেটে সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত দেন তারাশঙ্কর। তা অনেকটা আরোপিত মনে হলেও আমরা বুঝি, তারাশঙ্কর, যে-কোনও মহান লেখকের মতোই, এই এপিক উপন্যাসে দুই সম্প্রদায়ের আপাত-বিভেদকে বড় করে দেখেননি, দেখাননি। অস্বাভাবিক এই বিভেদের প্রেক্ষিতটি যে কায়েমি স্বার্থ-সর্বস্ব, তা লিখেছেন তারাশঙ্কর। সে-জন্যই দেবু যখন গ্রাম থেকে বিদায় নিচ্ছে, তখন সজল হয়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে অনেকেরই চোখ। তারাশঙ্কর লিখছেন :

ইরসাদ আসিয়াছিল। সেও চোখের জল ফেলিয়া বলিয়া গেল—দেবু-ভাই, এবাদরের কাজে বাধা দিতে নাই। বারণ করব না— খোদাতালা তোমার ভালই করবেন। কিন্তু আমার দোস্ত কেউ রইল না।

রহম আসে নাই। কিন্তু সে-ও নাকি কাঁদিয়াছে। ইরসাদই বলিয়াছে—রহম-চাচার চোখ দিয়ে পানি পড়ল ঝর ঝর করে। বললে—ইরসাদ বাপ, তুমি বারণ করিয়ো। সব্বস্বান্ত হয়েছি—এ মুখ দেখাতে বড় সরম হয়।...

ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতা নয়, মানুষ সতত মিলনের অভিপ্রায়ী। সাহিত্য চিরকাল সেই মিলনকেই শেষ সত্য বলে জেনেছে। তারাশঙ্করও লিখেছেন সেই সহিতত্ত্বের কথা। তাঁর রচনায় শেষপর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে মিলন-অভিপ্রায়ী মানুষের অসহায় কান্না।

সতীনাথ ও মানিকের সম্প্রদায়হীনতা

বাংলা উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) *ঢোঁড়াই চরিত মানস* (১৯৪৯ ও ১৯৫১) একটি অনবদ্য সৃষ্টি। প্রচলিত সাহিত্য-ঘরানার সমান্তরালে তিনি যেমন সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন একটি অনাস্বাদিত ভাষা, তেমনই বিষয়-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি সমূহ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ওই উপন্যাসে। সাধারণভাবে অন্ত্যজ সমাজের বিবরণ এই উপন্যাসের উপজীব্য হলেও, বিহারের গ্রামীণ জীবনে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কিছু বিচ্ছিন্ন চিত্রও তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এই উপন্যাসের পৃষ্ঠায়। সমকালীন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কমিউনিস্ট-রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না পূর্নিয়া-বাসী সতীনাথ। ববং, তাবাশঙ্কবেব মতো তিনি ছিলেন সক্রিয় কংগ্রেস-সদস্য। স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তিনি *জাগরী* (১৯৪৫) উপন্যাসটি লিখেছিলেন সম্পূর্ণ গান্ধীবাদী দৃষ্টিতে। তা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু, *ঢোঁড়াই চরিত মানস* উপন্যাসটি অন্ত্যজ জীবনের যে-অনুপুঙ্খ চিত্র আঁকে, তা কমিউনিস্ট মানিকের উপন্যাসে দুর্লক্ষ। জাতপাতের পটভূমিতে সতীনাথ খুব স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান-সমাজেব কথা এনেছেন উপন্যাসে। 'মুসলমান' শব্দটি সেখানে একেবাবেই নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত—হিন্দু-সমাজে অংশত যে-ভাবে সম্প্রদায়টি গৃহীত, সে-ভাবেই সতীনাথ বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বা আচরণে তা বিবৃত করেছেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে। যেমন থানাব হিন্দু-দারোগা মুনেসোওয়াব সিং-এব সংলাপ :

> *..সব কটাকে জেলে পাঠাব, সব কটার উপর 'চারশ ছত্তিস দফা' চালাব। সমস্ত গাঁটাকে পিষে একেবারে ছাতু ছাতু করে দেব, মুনেসোওয়ার সিং দারোগাকে চেনো না তাই। হিঁদু হয়ে থানের ইজ্জত রাখো না। মুসলমান হলেও না হয় কথা ছিল। তারা সব করতে পারে...*

অন্যত্র বাবুলালের ভাবনার বিবরণ .

> *বাবুলাল যে সেদিন দারোগাসাহেবের কাছে চামড়াগুদামের কথাটা তুলেছিল সেটার মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়াও অন্য কথা ছিল। এমনিই তো সবাই ছিল 'চামড়াবালা মুসলমান'টার উপর চটা। তার উপর কিছুদিন থেকে সে জিরানিয়ার একজন মেথরানীকে বাড়িতে এনে রেখেছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে, তাকে মুসলমান করে বিয়ে করবে।*
>
> *কী যে পছন্দ ও জাতটার বুঝি না। একটা বৌ থাকতে আবার ঐ মেথরানীকে বিয়ে করতে ইচ্ছেও হয়। বলিহারি প্রবৃত্তির! গা দিয়ে সেটার ভক ভক করে নিশ্চয় দুর্গন্ধ বেরোয়। এনে রেখেছিলি তাও না হয় বুঝেছিলাম ; কিন্তু তাকে মুসলমান করে নিয়ে বিয়ে? কভ্‌ভী নহী।—হেঁপো রুগী ভেতর পর্যন্ত তাল ঠুকে বলে।*

মেথরানীটাকে মুসলমান করে বিয়ে করা জিনিসটা, ধাঙররাও পছন্দ করে না। তারা নিজেরা হিঁদু কি না, এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামানো দরকার মনে করেনি, তবে তারা যে মুসলমান নয় এ কথা তারা জানত। এই মেথরানীর বিয়ের ব্যাপারটাতে তাদের হিঁদু জাতের উপর জুলুম করা হচ্ছে। মেথরানীকে তারা ছোঁয় না ঠিক ; তা হলেও সে তাদের মেয়ে। সেই মেয়েকে নিয়ে যাবে গরুখোরে? ছেলে হলেও না হয় অন্য কথা ছিল ; এ মেয়ের ব্যাপার ; বিলকুল বেইজ্জতির কথা।...

...

ঢোঁড়াইরা মুসলমানটাকে একটু জব্দ করুক বাওয়াও তাই চায়।...গানহী বাওয়া মেথর মেথরানীদের খুব ভালবাসেন। তিনি এখানে এলে তাঁকেই বলা যাবে—এই জুলুম আর বেইজ্জতির একটা কিছু বিহিত করতে।

আমরা এইসব উদ্ধৃতাংশে লক্ষ করি, যে-অন্ত্যজ হিন্দু-সম্প্রদায় বর্ণহিন্দুদের নানা অবহেলা আর ঘৃণার শিকার, তারাও নিজেদের তথকথিত হিন্দুজন্মের ঠুনকো অহংকারে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ঘৃণায় বিদ্ধ করেছে। সমাজের এই অসাড় ধর্মীয় সংস্কার সতীনাথ এই উপন্যাসে খুবই পুঙ্খানুভাবে বিবৃত করেছেন। অন্ত্যজ সমাজে মুসলমানদের অবস্থান কিংবা তাদের সম্পর্কে ওই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সতীনাথ যে-ভাবে বিবৃত করেছেন, তাতে তাঁর সাহিত্যিক কুশলতাই নয়, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসে মহরমের মিছিলের চিত্র এঁকে সতীনাথ তাঁর সেই পরিচয় আরও গভীর করে তুলেছেন। মহরমের উৎসব এই উপন্যাসে দুই সম্প্রদায়ের মিলনের এক অসামান্য প্রতীক হয়ে উঠেছে। সতীনাথ লিখেছেন :

তৎমাটুলির ছেলেরা মহরমের দলে লাঠি খেলে শুনে, রামিয়া চোখ কপালে তুলে বলে, এখনও পুরুবের হিঁদুরা ঐ গরুখোরদের পরবে লাঠি খেলে নাকি? আমাদের পাচ্ছিমে তো চার 'সাল' থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কী বন্ধ হয়েছে? লাঠি খেলা?

হাঁ হিঁদুর লাঠি খেলা, মহরমে।

সত্যই তৎমারা এ খবর শোনেনি এর আগে। ফুদী সিংয়ের দল লাঠি খেলা বন্ধ করবে, এ কথা তারা ভাবতেও পারে না।...রবিয়ার বৌ একটু ভয়ে ভয়েই তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের দেশে কি দুলদুল ঘোড়ার মেলাতে যাওয়াও বারণ নাকি?

যাক, তবু নিশ্চিন্দি যে তোমাদের দেশে দুলদুল ঘোড়ার মেলা হয় না, মহরমের পরদিন। দুলদুল ঘোড়া কী জানো না, আর এই পচ্চিমের এত বড়াই।

দুলদুল ঘোড়ার মিছিল এসে পড়েছে। মেলার ছত্রভঙ্গ ভিড় জমে চাপ বেঁধে

যায় মুহূর্তের মধ্যে, বুড়ো নবাব সাহেব নিজে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে দুলদুল ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে আসছেন। সাদা রঙের ঘোড়াটা। চোখ দুটো ঠুলি দিয়ে ঢাকা। সোনার ঝালর দেওয়া জিন ঘোড়ার পিঠে। মেহেদিপাতা দিয়ে রাঙানো নবাব সাহেবের দাড়ি। মখমলে ঢাকা আস্তাবলে বন্ধ করে রাখা হয় দুলদুল ঘোড়াটাকে সারাবছর। 'হাসসান হোস্‌সান্‌!' 'হাস্‌সান হোস্‌সান!' লাঠি আর বুক চাপড়ানোর শব্দে দম বন্ধ হয়ে আসে। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার হয়ে ওঠে। 'হায়রে হায়!' 'জুলুস' ঢুকছে 'কবরগা'র মাঠে, 'কারবালা' করতে। মেলাসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়ে 'কবরগা'র মাঠের দেওয়ালের চারিদিকে। ফুলঝরিয়া নিজের জায়গা থেকে নড়তে পারেনি।

সতীনাথ এই বর্ণনার মাধ্যমে দেখান, লোকজীবনে আরোপিত সাম্প্রদায়িকতা যতই প্রভাববিস্তার করুক—হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক আনন্দ ও বেদনা এই মহরমের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে একইভাবে প্রকাশিত হয়। জাতপাত, ধর্মকে অগ্রাহ্য করে অঞ্চল-বিশেষে ধর্মনিরপেক্ষ মেলবন্ধনের এই চিত্র আমরা এখনও প্রত্যক্ষ করি। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর এই মহাকাব্যিক উপন্যাসে তারই এক খণ্ডচিত্র উপহার দিয়েছেন আমাদের।

বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) একটি একক, স্বরাট দ্বীপের বাসিন্দা, যে-দ্বীপটি তিনি নিজেই গড়ে নিয়েছেন নিজের জন্য। বাংলা সাহিত্যের কোনও উত্তরাধিকার তিনি বহন করেননি। শরৎচন্দ্রের সমকালে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও তিনি অচিরেই তাঁর প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। শরৎচন্দ্র রূঢ় বাস্তবতাকে অবলম্বন করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন রক্ষণশীল। কিন্তু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমাবধিই তাঁর সতীর্থ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায় বা প্রেমেন্দ্র মিত্রদের থেকেও স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে ফ্রয়েডীয় দর্শন, অন্যদিকে মার্কসবাদ তাঁর কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র করেছে, সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র-পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর নাম সমোচ্চার্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬)। আগের বছরই তিনি লিখেছিলেন *দিবারাত্রির কাব্য*। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দুটি উপন্যাসের বিষয় ও বিন্যাস এতটাই বিপরীতধর্মী যে লেখকের প্রতিভায় আমাদের অভিভূত হতে হয়। *পদ্মানদীর মাঝি* যেখানে বিবৃত করে ব্রাত্য জীবনের কথকতা, *দিবারাত্রির কাব্য* সেখানে আমাদের নিয়ে যায় নাগরিক জীবনের জটিলতার মুখোমুখি। বস্তুত, মানিক দুই ক্ষেত্রেই সফল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবৎকাল মাত্রই ৪৮-বছর। ১৯০৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের বিপ্লব। আমরা লক্ষ করি, এইসব ঘটনার ঢেউ মানিকের সাহিত্যে অন্তঃসলিলা হয়েছে। বিশেষত,

সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের কাহিনি মানিকের সাহিত্যে যে-ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে, তাতে মার্কসীয় দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। মানিক এখানেই তাঁর মহান পূর্ব-পুরুষদের চেয়ে আলাদা। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনায় আমরা বাংলার কৃষকশ্রেণি বা মুসলমান-সম্প্রদায়কে ততটা বাস্তবোচিত প্রেক্ষিতে পাইনি। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার কৃষককে দেখেছেন সামন্ত-জমিদারের দৃষ্টিতে, রবীন্দ্রনাথ কেবল আবদুল মাঝির ছুঁচলো দাড়ির কথা বলেছেন, শরৎচন্দ্র গোফুরের কথা লিখলেও তা বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়নি। আসলে, এইসব মনীষী লেখকদের গভীরতর জীবনদর্শনের সঙ্গে খাপ খায়নি শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী সর্বজনীনতা।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার সমাজজীবনে জমিদার, মধ্যবিত্ত এবং কৃষিমজুরের শ্রেণি-বিন্যাস চূড়ান্ত রূপ পেল। আমরা জানি, জমিদার-শ্রেণির আবির্ভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল সাম্প্রদায়িকতার বীজ এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইংরেজ-প্রভুর বশ্যতা-স্বীকারের পূর্বাভাস—যার অন্তরালে সুপ্ত ছিল দুই সম্প্রদায়ের নিজস্ব স্বার্থ-চরিতার্থের অদম্য স্পৃহা।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পিছনে যে কেবল ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদেরই প্রভাব ছিল, তা নয়। সুচতুর ইংরেজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর প্রক্রিয়ার দেশীয় সামন্তদের অবাধ অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিল। বাংলার ক্ষেত্রে এর ফল হল বিষময়। কেননা পূর্ব-ভারতের রায়তেরা ছিল অধিকাংশই মুসলমান, আর জমিদাররা হিন্দু। ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক শোষণের ফলে তীব্র হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িকতা, তেমনই সর্বভারতীয় অর্থনীতি-তথা-রাজনীতিতে বাংলার নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠল মাড়োয়ারি ও গুজরাতি সম্প্রদায়। তারা বাংলার কৃষকের কাছ থেকে সস্তায় পাট কিনে তা বিদেশের বাজারে চড়া দরে রফতানি করা শুরু করল। এই বাণিজ্যে সায় ছিল ইংরেজেরও, কেননা তাতে তাদের দু-ভাবে স্বার্থরক্ষা হচ্ছিল। একদিকে ব্রিটেনের বাজারে পাটের চাহিদার যোগান যেমন সহজসাধ্য হয়েছিল, অন্যদিকে দেশীয় পুঁজিপতিদের সহায়তায় দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক আধিপত্য-বিস্তারও সহজতর হচ্ছিল। এই প্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃহত্তর জনজীবনের সুখদুঃখ, দাবিদাওয়াকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পুঁজিবাদের স্বার্থে যে-আন্দোলন শুরু করল, তার পুরোধা ছিলেন গান্ধীজি। কংগ্রেস পুঁজি ও শিল্পের বিকাশের জন্যই সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য আঞ্চলিক বৈষম্যগুলি জিইয়ে রাখার সুচতুর চক্রান্তের কখনও বিরোধিতা করেনি। স্বাধীনতার পর জওহরলাল নেহরুও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে একই পথের পথিক হলেন। এ-ক্ষেত্রে প্রাক্ বা পরবর্তী স্বাধীনতা-যুগে কমিউনিস্ট পার্টির যে-ভূমিকা গ্রহণ স্বাভাবিক ছিল, দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে তারাও সে-ভূমিকা থেকে ক্রমশই সরে গিয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন ১৯৪৪ সালে। অবশ্য এর আগেই তাঁর মানসিক প্রস্তুতিপর্বটি শুরু হয়েছিল। কমিউনিস্ট-আদর্শে-প্রাণিত মানিক

অনুভব করেছিলেন যে, সাহিত্য কোনও উচ্চকোটির বিলাস নয়। ফলে, সাহিত্যে তিনি সর্বজনীনতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন প্রথমাবধিই। সম্ভবত সে-কারণেই, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়, শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কালে, নজরুলের প্রভাব ও তারাশঙ্করের প্রতিষ্ঠার সময়ে কলম ধরেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে এক সুগভীর স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র (১৯৩৬) কুসুম ও *পদ্মানদীর মাঝি*-র হোসেন মিয়ার মতো দুটি অসামান্য চরিত্র সৃষ্টি করে মানিক যেন দুই শোষিত শ্রেণি—নারী ও মুসলমানের প্রতীক করে তুললেন তাদের।

পদ্মানদীর মাঝি লিখবার আগে মানিক একটি রচনায় প্রশ্ন তুলেছিলেন :

> *ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর মাঝি-মাল্লা হাড়ি-বাগদীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা...সাহিত্যে স্থান পায় না?*

এই আত্মবোধ থেকেই মানিক লিখেছিলেন পদ্মানদীর-পাড়ে-বিস্তৃত অন্ত্যজ জীবনের কথা, যেখানে *"জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। ...জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায় কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়"* বিদ্ধ হয়।

মানিক উপন্যাসে জেলেপাড়ার বর্ণনায় লিখেছেন :

> *পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই, কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ ক্ষুধা তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তাহারই ফলে জেলেপাড়াটি জমজমাট।*

এই প্রেক্ষিতে, উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দুর পাশাপাশি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মূলত হোসেন মিয়ার চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটি সমান্তরাল পরিচয়ও রচনা করেছেন। যদিও মানিক এখানে শ্রেণি-সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছেন, তবু পাশাপাশি-বহমান দুটি জীবনধারার পার্থক্য এবং সম্মিলনের ইঙ্গিত আমাদের চোখ এড়ায় না। যেমন :

> *কুবের লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইল, এই আমিনুদ্দি, আজ একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া*

উঠিয়াছে। হোসেন মিয়ার দিকে সে চাহিয়া নাই, সে চাহিয়া দেখিতেছে আমিনুদ্দিকে। আমিনুদ্দির অস্বস্তির ভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জহরের মধ্যস্থতায় অনেক বিবাদ মিটিলেও মনে মনে আমিনুদ্দির উপর কুবেরের রাগ ছিল। চোখে চোখ মিলিতে সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

কেহ কথা কহে না। কী ভাবিয়া হোসেন মিয়া হঠাৎ কুবেরকেই বিলম্বিত সম্ভাষণ জানাইয়া বসিল :

পিছে বইল্যা ক্যান কুবের বাই? আগাইয়া বও। খানাপিনা হয় নাই?

কুবের হঠাৎ বড় উল্লাস বোধ করিল। আগাইয়া সকলের সামনে গিয়া বসিয়া বলিল, খাইছি মিয়া বাই।

বাঁ হাতে নিজের লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া হোসেন মিয়া বলিল, গণেশেরে দেহি না? গেছে কই?

অন্যত্র :

কুবেরের সহসা মনে পড়িয়া যায়। ভাবে, সিধুর কাছ হইতে যে মাংসের ব্যঞ্জন পাওয়া গিয়াছে তাই দিয়া আতিথ্য করিলে মন্দ হয় না। মুসলমান মানুষ মাংস বেশি পছন্দ করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই এ বিষয়ে কুবেরের উৎসাহ কমিয়া যায়। এমন একদিন ছিল হোসেন মিয়া যখন খাসির ব্যঞ্জন পাইলে ধন্য হইয়া যাইত, আজ যার তার রান্না ওসব কি আর সে খাইবে? শুধু না-খাওয়া নয়, খাইতে বলিলে হয়তো সে লাজ অপমানই বোধ করিয়া বসিবে।

হোসেন মিয়া সম্পর্কে লেখক দুটি বাক্যে আমাদের জানিয়েছেন, *'একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া'* এবং *'বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের'*। আসলে, মানিক এই চরিত্রটিকে ওই 'রহস্যময়' শব্দের আধারেই বিন্যস্ত করেছেন। তার চরিত্রে আলো আর অন্ধকার সমানভাবে মিশিয়েছেন তিনি। সে ময়না দ্বীপ কিনেছে নিলামে। সেখানে এক স্বপ্নের উপনিবেশ স্থাপনের জন্য জীবনের সবকিছু, এমনকী প্রচলিত মূল্যবোধও, অগ্রাহ্য করতে পেরেছে সে। কুবেরের চোখ দিয়ে লেখক হোসেনের চরিত্রের এই রহস্যময় দিকটি বর্ণনা করেছেন :

কুবের সবিস্ময়ে হোসেনের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। কী প্রতিজ্ঞা লোকটার, কী মনের জোর ; যেখানে যত মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া জোড়াতালি দিয়া নিজের দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে—প্রজা বৃদ্ধি ব্যবস্থার দিকে তাহার সহজ দৃষ্টি। হোসেনের উদ্দেশ্যই হয়তো তাই, আমিনুদ্দির মত জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হতাশ ও নিরুৎসাহ মানুষগুলিকে আসলে তাহার প্রয়োজন নাই, ওরা দ্বীপটি যে নবীন নরনারীতে ভরিয়া দিবে, সে তাহার প্রতীক্ষায় আছে।

হোসেনের সেই স্বপ্নদ্বীপটি কীরকম? নদীর-বুকে-জেগে-ওঠা চড়ার মধ্যে অনাবাদি জমিতে নতুনতর নর-নারীর এক ভিন্নতর উপনিবেশ তৈরির লক্ষ্যেই হোসেন মিয়া এই

দ্বীপের পত্তন করেছে। প্রবাহিত, প্রচলিত সমাজের সমান্তরালে সে এই উপনিবেশ তৈরি করতে চায়। সেই দ্বীপের প্রকৃতি সম্পর্কে সে আমিনুদ্দিকে জানিয়েছে :

> *...ময়নাদ্বীপি মোল্লা পামু কই। রাজবাড়ির আজিজ ছাব কন, ময়নাদ্বীপি শওজানা মানুষ হলি আর মসজিদ দিলি আর হিঁদুরে জমিন না দিলি গিয়া থাকতি পারেন। তা পারুম না মিয়া। হিঁদু না নিলি মানুষ পামু কই? হিঁদু নিলি মসজিদ দিমু না। ক্যামনে দিমু কও? মুসলমান মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুর ঘর—না মিয়া, আমার দ্বীপির মদ্যি ও কাম চলব না।*

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপের এই পরিকল্পনার মাধ্যমে অস্পষ্টভাবে একটি শ্রেণিহীন, ধর্মবিভেদহীন নতুন সমাজের কথা ভেবেছিলেন। এই উপন্যাস লেখার সময় মানিক রাজনৈতিক আদর্শবোধে ততখানি উদ্বুদ্ধ ও প্রাণিত হননি। মানিকের এই স্বপ্নদীপ হয়তো একটি অবাস্তব ইউটোপিয়া হয়েই থেকে গিয়েছে। কিন্তু, তিনিই যে ধর্মপীড়া ও শ্রেণিপীড়নের মুখবন্ধটি বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম লিখে দিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

পরবর্তিকালে, ১৯৫১ সালে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিতে যখন *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসটি লিখলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রাজনৈতিক চেতনার পরিণতি অনেক স্পষ্ট ও সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠল। এখানে মানিক রাজনৈতিক দলগুলির বিভ্রান্তিকর ভূমিকার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মনোভঙ্গিরও পরিচয় লিখলেন। লেখক এখানে মার্কসবাদী প্রণব চরিত্রটির মাধ্যমে সরাসরি এই মৌলিক চিন্তাটি পরিস্ফুট করেছেন যে, সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয়, তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা চায় না। মানিকের ভাষায়, *'সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে নামানো হয়, তাদের দিয়ে দাঙ্গা করানো হয়।'* মানিক এখানে ঐতিহাসিক সত্য মেনেই স্বাধীনতার পাশে দাঙ্গা, আর বাস্তববোধেই দাঙ্গার পাশে তথাকথিত ধর্মকে আলোচ্য করেছেন। লিখেছেন :

> *নমাজ পড়ে পুজো দিয়ে তো মানুষ বাঁচে না, বাঁচে বলেই নমাজ পড়ে, পুজো হয়। ভেদ যা আছে সব ওপর থেকে চাপানো। কত জন্ম ধরে পায়ের তলায় পিষে মারছে, পেটের ধাক্কায় কাবু, তার ওপর হাজারটা কুসংস্কারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা, এদের ভুল বোঝানো কি কঠিন? তবু, একটা চেতনা এলেই আর ভেদ চাপানো যায় না। চোখের সামনে প্রমাণ আছে, দ্যাখো। মজুররা মারামারি করছে না। এখনো যে এই শহরে ট্রামে চেপে বেড়াও, হিন্দু-মুসলমান মিলে-মিশে ওই ট্রাম চালাচ্ছে।*

উপন্যাসটি ঘনীভূত হয়ে ওঠে দাঙ্গার ষড়যন্ত্রে। প্রণব ও গিরিনের বক্তব্যই আমরা শুনি মুসলমান মজুরের কণ্ঠে। নাজিমের বৃদ্ধা মাকে ষড়যন্ত্র করে মারে দাঙ্গা-প্ররোচকরা। উন্মাদ-প্রায় নাজিম দুর্গাকে বলে :

> *জগতে হিন্দুও নেই মুসলমানও নেই, আছে শুধু বড়লোক আর গরীব লোক।*

জগতে আছে শুধু গুণ্ডা আর তাদের শিকার লাখ লাখ কুলি-মজুর, ব্যস খতম। ঈশ্বর আল্লা তাদের নয়, স্রেফ ধনী আর গুণ্ডাদের ঈশ্বর আল্লা।

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসভায় এইসব কথাই বলে নাজিম। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি যে নিজেদের স্বার্থেই দাঙ্গা-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়, তা বিভিন্ন আলোচনাসূত্রে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা এক হিন্দু বৃদ্ধের মুখে শুনি দাঙ্গাকারীরা দাঙ্গায়-মৃত তাঁর ছেলের শব দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার জন্য অর্থের বিনিময়ে কিনতে চেয়েছে। আমরা শুনি, সেই শান্তিসভায় এক অবাঙালি মুসলমান-শ্রমিক স্পষ্ট করেই বলে :

মজুরের কাছে হিন্দু-মজুর, মুসলিম-মজুর নেই, এদেশী মজুর, ওদেশী মজুর নেই, দুনিয়ার মজুর একজাত।

বস্তুতপক্ষে, মানিক বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে এইসব তাত্ত্বিক বিষয়ের অবতারণা করলেও, আমরা দেখি, তা উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে সম্পূর্ণ লগ্ন হয়ে রয়েছে, বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক, আরোপিত, অনৈতিহাসিক বা অসত্য হয়ে ওঠেনি। মানিক তত্ত্বকে উপন্যাসের চরিত্র এবং ঘটনাবিন্যাসের পরম্পরায় উপস্থাপিত করেছেন বলেই, তা বাস্তব ও সাহিত্যের সত্য হয়ে উঠেছে।

লক্ষ করার যে, *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসটি মানিক উৎসর্গ করেছেন, 'জনসাধারণ'-কে। অর্থাৎ, পরিকল্পিতভাবেই তিনি একটি সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বার্তা সাধারণজনের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এক মধ্যবিত্ত গৃহবধূ মণিমালা এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার অভিজ্ঞতা, চিন্তান্তর, বাস্তববোধ উপন্যাসটিকে একটু-একটু করে উন্মোচিত করেছে।

মানিক এই উপন্যাসে যুগপৎ দুটি বিষয় নিয়ে কাহিনি-বিস্তার করেছেন। একদিকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অন্যদিকে স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে এই উপন্যাসে। ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার জন্য মানিক সরাসরি দায়ী করেছেন ইংরেজ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগকে। মানিক লিখেছেন, *"দুশো বছরের গদি আপসে ছেড়ে দিতে না চেয়ে ইংরেজের সাধ্য ছিল না এ রকম দাঙ্গা বাধায়।"* মানিক জানিয়েছেন, যে-দেশে রাজনৈতিক লড়াই আর ধর্মের দাঙ্গা একাকার হয়ে যায়, সে-দেশে দাঙ্গার বীভৎসতা অনিবার্যই।

এই উপন্যাসের একটি চরিত্র প্রণব বলেছে, *"হিন্দু বা মুসলমান বলে কোন শ্রেণী নেই কি না, তাই মিছিমিছি শ্রেণীর কথা বাড়াইনি।"* মানিক এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষ সতত অসাম্প্রদায়িক। রাজনৈতিক নেতারা তাদের দিয়ে দাঙ্গা বাধায়—বাধিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। উপন্যাসে প্রণব মণিমালাকে বোঝায়, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ দাঙ্গায় নেমেছে ভাত-কাপড়ের প্রলোভনে। রাজনৈতিক নেতারা তাদের সেই প্রলোভন দেখিয়েছে। মার্কসবাদী প্রণবের আশা, একদিন তারা সঠিক বুঝে নেবে হিন্দু বা মুসলমান কেউ কারও শত্রু নয়—শ্রমজীবীর শত্রু হল পরশ্রমজীবী।

অন্যদিকে সাংবাদিক গিরিন মণিমালাকে বোঝায়, ক্ষমতালোভী রাজনীতির স্বরূপ :

সাধারণ লোকের কাছে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সত্যই বেখাপ্পা, উদ্ভট, অর্থহীন। জগতের সেরা পাকা খেলোয়াড় কোন চোখ রাখে কংগ্রেস আর লীগের দিকে, কার দিকে কোন হাত বাড়ায়, কি খেলা খেলে, কি চাল চালে—এ জটিল ব্যাপার বোঝা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ শুধু জানে যে কংগ্রেস আমার বা লীগ আমার—এ জগতে কে একান্তভাবে কার জানা যেন এতই সহজ।...ইংরেজ এ দেশে বিপক্ষ গড়তে দিয়েছে, কখনো শত্রুতা বরদাস্ত করেনি, শত্রুকে ফাঁসি দিয়েছে—দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্রু হয়ে উঠেছে, এখন বিপক্ষরাই ইংরেজের ভরসা।

উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দাঙ্গা-বিরোধী মিছিলের ছবি এঁকেছেন মানিক। এই একটি মিছিলেই সাধারণ মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িক বিষ যেন কর্পূরের মতো উবে গেল। দুই সম্প্রদায়ই বুঝতে শিখল তাদের প্রকৃত শত্রু কারা। মানিক এখানে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ভাবধারার প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে জীবন ও শিল্পের বাস্তবতা থেকে অনেকাংশে সরে গিয়েছেন। আশ্রয় নিয়েছেন আকস্মিকতার। উপন্যাসটি শেষাংশে পৌঁছে সে-কারণে কিছুটা মতাদর্শের বাহক হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও মানিকের সামাজিক ও ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার অভিজ্ঞান হিসাবে উপন্যাসটির মূল্য কম নয়।

বিজড়িত সম্পর্কের ধারাবাহিকতা

আমরা জানি, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে একেবারে প্রথমাবধি। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল টানাপোড়েন, দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে বিশ শতকের চারের দশকের উপন্যাস। সাহিত্যবিদ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> *মনে হয় যেন যুগের সমগ্র মানবিক আবেগ ও চরিত্রপরিচয় এই রাজনীতির খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ যে রাজনৈতিক জীব (political animal) এই নূতন সংজ্ঞা অন্তত বাংলা উপন্যাসে অঙ্কিত চরিত্রাবলীর পক্ষে নিখুঁতভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যে জাতির চিত্তে যে ক্ষণিক অপরিমিত ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পায়িত আবেগ সঞ্চিত হইয়াছিল, বাংলা উপন্যাস গত বার বৎসর ধরিয়া যেন তাহারই মুক্তি-নিষ্ক্রমণের পথ রচনা করিতেছে। এই সংগ্রামবিক্ষুব্ধ, মুক্তির নেশায় পাগল, একলক্ষ্যাভিমুখী মানব-প্রকৃতির যে আগ্নেয় বিস্ফোরণ, মতবাদের ঘূর্ণিতে আবর্তিত, উদ্‌ভ্রান্ত, যে জীবনরসবিমুখ কৃচ্ছ্রসাধনের ছবি আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উপন্যাসে তাহারই কল্পনাস্ফীত, মাত্রাতিসারী আবেগে অতিরঞ্জিত প্রতিরূপ পাই। এই মুক্তিসংগ্রামের কতটা সাহিত্যিক মূল্য আছে, পঞ্চাশ বৎসর পরে ইহার প্রতিধ্বনি আমাদের অনুভূতিতে কোন সাড়া জাগাইবে কিনা, ও বিপ্লবের বাঁধা বুলি ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার মধ্যে মানুষের সত্য পরিচয় কি পরিমাণে নিহিত আছে এই সমস্ত প্রশ্ন অনুচ্চারিত ও অমীমাংসিত থাকিয়াই যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চার অধ্যায়'-এ ব্যক্তিক স্বাধীন ভাবজীবন ও বিপ্লবীর বহিঃশক্তিনিরূপিত কক্ষপথের যান্ত্রিক অনুবর্তন — এই দুয়ের মধ্যে মর্মান্তিক পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এই সতর্কবাণী যাহারা আধুনিককালে মানবজীবনের কারবারী তাঁহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা সন্দেহ।*

প্রয়াত আচার্যর এই উদ্ধৃতি তাঁর আকরগ্রন্থ *বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*-র ১৯৮৮ সালের অষ্টম মুদ্রণ থেকে গৃহীত। উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। গ্রন্থ-প্রকাশের পর পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। আচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী এ-ক্ষেত্রে খুব সফল হয়েছে, বলা যায় না। সমকাল, বারবার, ইতিহাস ও সম-সময়কে মেলাতে গিয়ে, ওইসব তথাকথিত 'রাজনৈতিক' উপন্যাসের কাছে ফিরে গিয়েছে। দাঙ্গা, রাজনৈতিক স্বপ্নভঙ্গ, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কটি বুঝতে চেয়ে উল্টে দেখেছে সাহিত্যের পুরনো, উজ্জ্বল পৃষ্ঠাগুলি—সাহিত্যগত তথাকথিত সীমাবদ্ধতার কারণে সেগুলি সম্পর্কে পরাঙ্মুখ হয়নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) *লালমাটি* (১৯৫১) উপন্যাসটি আমরা আজও সে-ভাবেই পড়ে দেখি। এই উপন্যাসে জমিদার ও প্রজার স্বার্থসংঘাত, হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধ এক বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হয়েছে। এখানে যেন সংগ্রামের চিত্রটিকে কেমন অসম্পূর্ণ মনে হয়। সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাস্য কোনও জয়ের পথ এই উপন্যাসে দেখানো হয়নি।

উপন্যাসটি সম্পূর্ণতই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক-অসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে রচিত। প্রজাদের উপর সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার ও অত্যাচারিতদের প্রতিবাদ এই উপন্যাসের উপজীব্য। স্বাভাবিকভাবেই এখানে এসেছে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিও।

জমিদারের অত্যাচারের প্রেক্ষিতে প্রজারা শামিল হয়েছে আন্দোলনে। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের আন্দোলন প্রবাহিত হয়েছে দুটি ভিন্ন খাতে। হিন্দু-প্রজাদের মধ্যবিত্ত নেতা রঞ্জন ও নগেন, পাশাপাশি মুসলমান-সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিচ্ছে আদর্শবাদী শিক্ষক আলিমুদ্দিন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন সম্প্রদায়গত হয়ে পড়ায় আলিমুদ্দিন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সে দরিদ্র মানুষের উন্নতির অভিপ্রায়ী। সে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করে কারাদণ্ডও ভোগ করেছে। কিন্তু নগেন-রঞ্জনের আন্দোলন বা অভিপ্রায়ে আলিমুদ্দিন সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব লক্ষ করে প্রথমত ব্যথিত পরে ক্ষুব্ধ হয়েছে। ক্রমশ সে-ও আঁকড়ে ধরেছে মুসলিম লিগকে। কংগ্রেস সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ হয়েছে। সে মুসলিম লিগে যোগ দিয়ে নিজের সংগ্রামী চেতনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছে, 'আজাদ পাকিস্তান'-এর স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। আলিমুদ্দিন ভেবেছিল আজাদ পাকিস্তান তাঁর অসাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের মনোভূমি হবে। সে বলেছে : *"এই তো আমার আজাদ পাকিস্তান। বড়লোকের নয়। গরীব মুসলমানের—গরীব হিন্দুর।"* সে হিন্দু-যুবতী উত্তমাকে বোন বলে গ্রহণ করেছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে যাওয়ার আগেও তার সেই স্বপ্নের মৃত্যু হয়নি। সে উত্তমাকে বলেছে, *"...তোমার ভাইফোঁটা নেব আজাদ পাকিস্তানে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"*

সাম্প্রদায়িকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সংগ্রামী চেতনার সার্থক সম্মিলন ঘটেছে *লালমাটি* উপন্যাসে। লেখক যে-ভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার সম্মিলন ঘটিয়েছেন, তাতে তাঁর উদারনৈতিক ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক বিভেদ যেখানে আলিমুদ্দিন ও উত্তমাকে মিলতে দেয়নি, সেখানে অনেক রক্তস্রোতের পর সুরেশ-লায়লার প্রেম সামাজিক পরিণতি পেল মনোজ বসুর (১৯০১-১৯৮৭) *রক্তের বদলে রক্ত* (১৯৫৯) উপন্যাসে। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাস এক নৃশংস সাম্প্রদায়িক হত্যালীলার কাহিনি। লাহোরের রক্তস্রোত কোন সুতীব্র প্রতিশোধস্পৃহায় কলকাতায়ও রক্তের নদী বইয়ে দিল, এই উপন্যাসে তা-ই বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার গতি এই উপন্যাসটিকে করে তুলেছে প্রবল রুদ্ধশ্বাসময়। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক

রক্তপাতের প্রেক্ষিতে সুরেশ ও লায়লার প্রেম এক দীপশিখার মতো প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এই চরিত্রদুটিকে নানাভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত করেছেন কুশলী লেখক। লায়লার হিন্দুবিদ্বেষ শেষপর্যন্ত প্রশমিত হয়েছে নবনলিনীর স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে আর মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতার নৃশংসতায় অমলাকে বিধবা হতে দেখে। শেষপর্যন্ত সে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলতে পেরেছে। এই উপন্যাসে মনোজ বসু যুগপৎ সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতা ও সম্প্রীতির আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়েছেন।

সুমথনাথ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮৪) উপন্যাস *পরপূর্বা* (১৯৫৭) দুটি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান পরিবারের সমান্তরাল কাহিনি। ধর্মীয় সংস্কার মানবিক সম্পর্কের উপর কীভাবে গড়ে তোলে এক অচলায়তন, এই আখ্যানে তা-ই আলোচ্য। দুটি পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু সুমিতার টানাপোড়েনের সঙ্গেই *পরপূর্বা*-র কাহিনি এগিয়েছে।

সাবেক পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মুসলমান-দাঙ্গাকারীরা অপহরণ করে সুমিতাকে। সেখানে সে ঘটনাচক্রে ধনী মুসলমান-ব্যবসায়ী গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে বাধ্যত বিবাহিত হয়। সুমিতার স্বামী-তথা-হিন্দুসমাজ তাকে উদ্ধারের চেষ্টা না-করে সুমিতাকে জাতিচ্যুত বলে ঘোষণা করে। গিয়াসুদ্দিনের ঔরসে সুমিতা নবাব ও আনারা নামে দুই পুত্র-কন্যার মাতৃত্ব পায়। কিন্তু, তার মন পড়ে থাকে পূর্ব-বিবাহের একমাত্র পুত্র-সন্তান সুকুমারের প্রতি। সম্পর্কের এই টানাপোড়েনই উপন্যাসে একধরনের মানবিক রস তৈরি করেছে। ধর্মীয় বিভেদ আর সংস্কার মানবিক সম্পর্কের উপর কতটা প্রভাববিস্তারী, লেখক এখানে তা আবেগমথিত করে তুলেছেন। তবে সুমিতা ও সুকুমার ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি লেখকের অনুরূপ জটিলতা ও আবেগ থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত হয়েছে, এ-কথাও অস্বীকারের নয়।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের (১৯১৮) *গড় শ্রীখণ্ড* (১৯৫৭) উপন্যাসে দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে বাংলার এক সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিপন্ন মানুষের আখ্যান বিবৃত হয়েছে। তিনটি স্বতন্ত্র স্তর-পরম্পরায় লেখক এখানে কাহিনি-বয়ন করেছেন। যাযাবর মান্দার-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মুসলমান ও হিন্দু-শ্রমিকশ্রেণির একীভূত জীবনযাপন এই উপন্যাসে একটি গভীর মাত্রা পেয়েছে। সুরো, ফতিমা, রজবালি, ইয়াকুব, ইয়াজ, জয়নাল, সোভান, টেপি, টেপির মা, মাধাই বায়েন এই উপন্যাসে এক অচেনা জগৎ তৈরি করে। সুরো-ইয়াজের মধ্যে রঙিন সম্পর্ক শেষপর্যন্ত বিকশিত না-হলেও তা কাহিনিকে জটিল, শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে কিছুটা রক্ষা করে।

অন্যদিকে, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণদাস, মুঙলা, ছিদাম, পদ্ম, ভানুমতী, চৈতন্য সাহা, আলেখ শেখ, এরশাদ শেখ ইত্যাদি চরিত্রগুলিও গড় শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়গত ভেদাভেদকে বহুমাত্রিক করে তোলে। তুলনায় উপন্যাসের জমিদারশ্রেণি অনেকাংশেই ভিত্তিহীন হয়ে কাহিনির কোনও উপকারে লাগে না।

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২) সাধারণভাবে খুবই অন্তর্মুখী উপন্যাস লেখেন। কিন্তু,

সেইসব ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাসেও আমরা সময় ও সমাজের অনিবার্য ছায়া পড়তে দেখেছি বারবার। প্রসঙ্গত ১৯৫৪-৫৫ সালে লেখা তাঁর অনবদ্য উপন্যাস *লালবাঈ*-এর কথা আমাদের মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে যে-ঐতিহাসিক উপন্যাসধারাটির সূচনা করেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের *রাজর্ষি* ও *বউ-ঠাকুরানীর হাট* উপন্যাসে যেমন ধারাবাহিক হয়েছিল, তেমনই পরবর্তী সময়ে *লালবাঈ* বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস-প্রবাহের সঙ্গে সুলগ্ন হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের উচ্চাঙ্গসংগীতের ইতিহাস আর ভারত-ইতিহাসের মোগল-সন্ধিক্ষণকে রমাপদ চৌধুরী এক আশ্চর্য সম্মিলনে ওতপ্রোত করেছেন এই উপন্যাসে।

হিন্দু-মুসলমান ধর্ম ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে এক অতুলনীয় ইতিহাস-রচনা করেছে। লালবাঈয়ের চরিত্রটি বাংলা উপন্যাসধারায় এক অনন্য সৃষ্টি। রূপের আড়ালে তাঁর ধর্মহীন, ষড়যন্ত্রী চারিত্র্য উপন্যাসে হিরকদ্যুতি বিস্তার করেছে। বিপরীতে চন্দ্রপ্রভার ট্র্যাজেডিতে এই উপন্যাস হয়ে উঠেছে করুণতর। হিন্দু-রাজা আর মুসলমান-সম্রাটের দ্বন্দ্ব ও চক্রান্তের টানাপোড়েনের পাশে বিষ্ণুপুর সংগীতঘরানার জন্মবৃত্তান্তের বর্ণনায় এই উপন্যাস শেষপর্যন্ত প্রেমেরই জয়গাথা লেখে।

বাংলা কথাসাহিত্যের পৃষ্ঠাগুলি এলোমেলোভাবে উল্টে গেলেও আমরা লক্ষ করি এই বিজড়িত সম্পর্কের ধারাবাহিকতা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্য, তার উজ্জ্বল চালচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে, খুঁজে নিতে চেয়েছে নতুনতর প্রসারের অনির্দিষ্ট ভূমি। সেইসব রচনার পাঠ নিতে গিয়ে মুছে যেতে থাকে সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ সীমারেখা, সমূহ রক্তচক্ষু—মানুষে-মানুষে ওতপ্রোত হয়ে যায় সাহিত্যের পৃষ্ঠা। সম্প্রদায়গত বিভেদ তখন খুবই নিরর্থক হয়ে পড়ে।

সপ্তদশ শতকে সৈয়দ আলাওল যেমন সতী ময়নার কাহিনি লিখেছিলেন, তেমনই বিশ শতকেও রচিত হল এক বিপ্রতীপ দৃষ্টান্ত। তথাকথিত হিন্দু-লেখক গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০১) লিখলেন গ্রামীণ মুসলমান-জীবনের এক এপিক আখ্যান *প্রেম নেই* (১৯৮১)। এই উপন্যাসে মুসলমান-জীবনের আলোছায়া আর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে এক বিস্তারিত পটভূমিতে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার নানা কারণাকারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই উপন্যাসে।

আমরা জানি, অবিভক্ত বাংলার গ্রামজীবন হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক সম্পর্কে গ্রথিত ছিল। *প্রেম নেই* উপন্যাসে বিশ্বাস বাড়ির ছোটমেয়ে টগর আর হাজি নিকিরির মেয়ে বিলকিস একে অন্যের সঙ্গে 'গোলাপ ফুল' পাতায়। টগর স্বামীর-দেওয়া সুগন্ধি সাবান নিজের হাতেই ঘষে দেয় বিলকিসের চুলে, নদীর ঘাটে দুই সখির বিশ্রম্ভালাপ চলে। রক্ষণশীল পরিবারে ধর্মীয়-অনুশাসনে-বন্দি বিলকিস টগরের দাম্পত্য-কাহিনি মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ফকির সাহেবের নির্দেশনামার সঙ্গে। লেখক দুই যুবতীর সংলাপের মাধ্যমে সমান্তরাল দুটি সম্প্রদায়ের বিপরীত অবস্থান স্পষ্ট করে দেন।

টগর আর বিলকিস স্বচ্ছ জলে অবগাহন করে একে অন্যের প্রতি অকৃত্রিম আগ্রহ, আন্তরিকতা যতই স্পষ্ট করুক—সমাজ সেই জলপ্রবাহেও অস্পৃশ্যতার গণ্ডি এঁকে দেয়, ধর্মের নামে। টগরকে ঘড়া থেকে ফেলে দিতে হয় পুজোর জল, কেননা সে-জল বিলকিস ছুঁয়েছে। এখান থেকেই তৈরি হয় দুই সম্প্রদায়ের যে-বিভেদ, তা আমরা বারবার দেখেছি। গৌরকিশোর লেখেন :

> *টগর কাঁখ থেকেই ঘড়া উপুড় করে ঘড়ার জল ফেলে দিতে লাগল। অপ্রস্তুত বিলকিস করুণ চোখে দেখতে লাগল টগরের ঘড়ার জল গড়গড় করে গড়িয়ে এসে ওদের দুজনের মাঝখানে কেমন মোটা একটা দাগ কেটে নদীর দিকেই নেমে যাচ্ছে।*

এই অস্পৃশ্যতার চিহ্ন আমরা এই উপন্যাসের অন্যত্রও দেখেছি। মুসলমান-কিশোর ফটিক তারিণী মাস্টারের বাড়িতে পড়তে গিয়ে এই অস্পৃশ্যতার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তারিণী মাস্টারের স্ত্রী তাকে অন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখিও করেছে :

> *ফটিকের মনে হল এই বোধহয় দেবী সরস্বতী। মানুষের এমন চেহারা সে দেখেনি। তিনি হেসে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, "ওঁর কথা তো অ্যাতক্ষণ ধরে খালে বাবা, ইবার নাও আমার হাতের মোয়া।"*

ফটিকের এই প্রাপ্তি খুব সাধারণ ঘটনা নয়, তার এই অভিজ্ঞতা অনেকটাই ব্যতিক্রমী। হয়তো সে-জন্যই *"শরিয়তি মোল্লারা যাই বলুন, তারিণী স্যারকে সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে"।* তবু কর্মজীবনে ফটিককে সেই অস্পৃশ্যতার অভিজ্ঞতা পেতে হয়েছে বারবার। দারেপুর সিভিল স্কুলের পণ্ডিতমশাই রামানন্দ পণ্ডিত হিন্দুত্বের অহঙ্কারে ফটিকের-বসা চেয়ারে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিয়ে নিজে বসেছিলেন, ছাত্রদের জিভ গোবর দিয়ে ধুতে বলেছিলেন, আর ফটিককে সরাসরি বলেছিলেন :

> *তুমি হচ্ছ যবন আর ধনা হচ্ছে চাঁড়াল। তুমরা দুটোই অস্পৃশ্য। তুমরা যতক্ষণ ঘরে ততক্ষণ জলস্পর্শ করি কী করে? গায়ে বামুনের রক্ত আছে যে, ধম্মটা বজায় রাখতি হবে তো?*

অথচ এই রামানন্দ পণ্ডিত, পরবর্তী সময়ে ফটিক যখন বিদ্যালয়ের অস্থায়ী প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব পায়, তখন নিজের স্বার্থ-হাসিলের জন্য ফটিককে তোষামোদ করেন একেবারে বিপরীত ভাষায় :

> *মুসলমান বলে তোমার সামনে জল খালি জাত যাবে! মুসলমান কথাটার মানে জানো? মুশল + ম্যান ইতি মুশলম্যান। ম্যান মানে মানুষ অর্থাৎ কিনা যেসকল মানুষের মুশল হইতে উৎপত্তি তারাই হল মুশলম্যান বা মুসলমান। বুঝিছ? এ হল গিয়ে স্বয়ং ব্যাসদেবের মহাভারতের কথা। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব মুশল প্রসব করিছিল। জান তো? সেই মুশলের থে জন্ম যাদের তারাই হল গে মুশলমান। তুমরা হলে গো আসলে ভগ্ন যাদব। অর্থাৎ কিনা যদুবংশের তিলক সব। তুমরা*

তো আমাগো পর নও বাবা। তুমার সামনে জল খালি জাত যাবে ক্যান।

একদিকে যেমন এই রামানন্দ পণ্ডিত, অন্য দিকে রয়েছেন মৌলানা দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরীর মতো মৌলবিরা। এঁরাই নিজেদের স্বার্থপূরণের তাগিদে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক মিলন-প্রবণতার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছেন বারেবারে। *প্রেম নেই* উপন্যাসে মোল্লা-মৌলবিদের শিক্ষায় প্রভাবিত জমিরুদ্দি বলে :

> *অতশত জানি নে। মৌলানা দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরীর মুখির থে শুনিছে যে, হিঁদুদিগের সঙ্গে মুছলমানদিগের মিশ খাওয়া সম্ভব না। ক্যান? না তার পেরধান কারণ এই যে ইরা দুটো আলাদা জাত। হিন্দুরা পয়দা হইছে হিন্দুস্থানে মুছলমানরা পয়দা হইছে আরবে। আমাদিগের মুছলমানদিগের আসল দেশ হল আরব দেশ।*

এই মোল্লাতন্ত্র আধুনিক-শিক্ষায়-শিক্ষিত যুব-সমাজকে নিজেদের বিপদের কারণ বলে বুঝতে পেরেছে। মৌলবি দৌলতপুরী সে-কারণেই বলে :

> *এরা আরও সাংঘাতিক। এরা কোরান পড়েছে এবং ইংরেজী পড়েছে। এরা তফসীর মানতে চায় না। বলে কি, পুরাতন তফসীর লেখকেরা শত শত গালগল্প, অযৌক্তিক মতবাদ নিজেদের তফসীরে ঢুকিয়ে রেখে গেছেন। এজমা, কিয়াস, ফেকা সম্পর্কে বলে, ওগুলো আল্লাহের বাণী নয়। রসুলেরও কোনও বাণী নয়। ফেকা একজন ইমামের ব্যক্তিগত মত মাত্র আর এজমা কিছু সংখ্যক মোল্লা মৌলবীর সমবেত সিদ্ধান্ত। এজমা কিয়াস ফেকার শাস্ত্র নিয়ে মুসলমানে মুসলমানে মজহবী লড়াই নাকি মোল্লা মৌলবীরাই জিইয়ে রেখেছে।*

এই সামাজিক ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করে রাজনৈতিক শক্তি। একদিকে মুসলিম লিগ মুসলমান-চাষিদের হিন্দু-জমিদারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, অন্যদিকে কংগ্রেস যেমন হিন্দু-জমিদারের পৃষ্ঠপোষক হয়, তেমনই হিন্দু-মুসলিম দরিদ্র চাষির স্বার্থপূরণের পরিবর্তে, তাদের গণআন্দোলনমুখী সংগ্রামের পরিবর্তে ক্ষমতালাভের স্বাধীনতা-আন্দোলনে নিয়োজিত থাকে। মুসলমানের জাতীয়তাবোধকে কোনও গুরুত্বই দেয় না তারা। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগ সচেষ্ট হয় দরিদ্র মুসলমান-কৃষককে তাদের কৃষক-প্রজা পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। মুসলিম লিগের প্রার্থী খান বাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমানের নির্বাচনী জনসভায় মৌলবি দৌলতপুরী দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমানদের দোজখের ভয় দেখায়। এইভাবে ভেঙে যায় সাধারণ চাষির গণ-আন্দোলন। যে-স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র চাষির কোনও স্বার্থ জড়িত নেই, তারাও দু-ভাবে বাধ্য হয় তাতে যোগ দিতে। দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রভাবিত করে তাদের। আখেরে লাভবান হয় বিত্তবান শ্রেণি।

গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর এই ধ্রুপদী উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ধারাবাহিকতার উপর যে-রকম নির্মোহ ঐতিহাসিকের আলো ফেলেছেন, বাংলা কথাসাহিত্যে সে-রকম দৃষ্টান্ত বিরল। এমনকী, ভারতীয় সাহিত্যেও।

বাংলা কথাসাহিত্যে সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) স্থানাঙ্ক-নির্ণয় আজ আর অসাধ্য নয়। প্রথম জীবনে রাজনীতি-নির্ভর রচনায় তিনি যেমন বাংলা কথাসাহিত্যের সমকালীন পৃষ্ঠাগুলিকে অন্যমাত্রিক করে তুলেছিলেন, তেমনই পরবর্তিকালে যৌন মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক-ব্যক্তিক অন্ধকারের ছবি এঁকে পাঠকের নিবিড় মনস্কতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। সর্বোপরি, ভ্রমণকাহিনিমূলক উপন্যাস-রচনায়ও তাঁর সিদ্ধি কালোত্তীর্ণ।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের অবিকল্প বিশ্লেষণাত্মক কাহিনি লিখেছেন তিনি *খণ্ডিতা* (১৯৮৭) উপন্যাসে। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি যেমন বারবার উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন বিষয়ের নানা বর্ণময়তা, এই উপন্যাসেও সমরেশের সেই বিষয়বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। কলকাতা থেকে কুড়ি-কিলোমিটার-দূরবর্তী এক শহরতলির পটভূমিকায় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক চিত্রটি, এবং সময়ে-লগ্ন তিন যুবকের রাজনৈতিক চেতনা, সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মনিরপেক্ষতার সুতীব্র ভাবাবেগ এই উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে নিখুঁত এঁকেছেন সমরেশ।

উপন্যাসটি আসলে ভারত-ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। সতু, বিজু আর গোরা নামের তিন মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত সদ্য-যুবকের চোখে ভারতের খণ্ডিত আত্মার রক্তক্ষরণ কতখানি তীব্র, উপন্যাসে তা-ই দেখিয়েছেন সমরেশ।

র‍্যাডক্লিফের ছুরিতে বাংলাভাগ ও দেশবিভাগের পরিবর্তে মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা আসছে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের বিকেলে এই উপন্যাসের সময়-সূচনা, যার কয়েকঘণ্টা পরে, মধ্যরাতে, ঘোষিত হবে বহু-প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। একদিকে স্বাধীনতার স্ফূর্তি, অন্যদিকে দেশভাগজনিত সংশয় ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ এই উপন্যাসকে করে তোলে সময়ের অমোঘ দলিল। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, প্রফুল্ল ঘোষ, সুরাবর্দি, ফজলুল হক, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরোক্ষ হয়েও উজ্জ্বল চরিত্রের মাত্রা পান এই উপন্যাসে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের বিবরণ লেখেন সমরেশ :

> *"তা বলতে পারিস।" সতু নিজেই মুখ ফিরিয়ে হাসলো, "অবিশ্যি তেতাল্লিশের সেই বন্দীমুক্তি অনেকটাই ছেচল্লিশে ঘটেছিল। সুরাবর্দী তখন চিফ মিনিস্টার। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বন্দীরাও মুক্তি পেয়েছিল। সেই সুবাদেই সুরাবর্দীর সঙ্গে কমিউনিস্টদের একটা আঁতাত। সুরাবর্দী প্রগতিশীল মনের মানুষ। যামিনী রায়ের ছবির একজন ভক্ত আর পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু আমার তো ধারণা, ভদ্রলোকের ধমনীতে তখন ব্রিটিশ কূটনীতির সর্বনেশে ধারা বইছে। তার প্রমাণ, গত বছরের ষোলই আগস্ট। সেটা লোকে ভুলবে কেমন করে? সৎ মুসলিমরাও সেদিন জিন্নাকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁর ডাইরেক্ট্ অ্যাকশনের ডাককে। কারণ, সে-ডাক ছিল, পাকিস্তানের দাবিতে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে। আর নাজিমুদ্দিন কী বললেন কলকাতার মুসলমানদের? 'আমাদের জেহাদ সরকারের বিরুদ্ধে নয়।*

হিন্দুদের বিরুদ্ধে।' প্রগতিশীল মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী ষোলই আগস্ট সমস্ত সরকারী অফিস বন্ধ রাখার হুকুম দিলেন। উদ্দেশ্য? যদি কোনো গোলমাল ঘটে, তা হলে যেন সরকারী কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তারা বাড়ির ভেতরে থাকবে। কিন্তু শুধু তারা কেন? সমস্ত কলকাতাই বন্ধ করে দিতে হবে। এর বিরোধিতা করা মানেই পাকিস্তানের বিরোধিতা করা। সুরাবর্দী আগুন নিয়ে খেলছিলেন না, একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যই, বেশ মাথা ঠাণ্ডা করে এগোচ্ছিলেন। গতবছর ষোলই আগস্টের দাঙ্গায় প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা থাকতেই হবে। যাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার, সিদ্ধ হয়েছিল। দেশের নেতাদের ইচ্ছেয় কিছুই হলো না। সাহেবরা যা চেয়েছিল, আগামীকাল তাই ঘটতে যাচ্ছে।

বঙ্গবিভাগের প্রেক্ষিতে অনিবার্যভাবেই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বিধা-সংশয়-বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েন। তিন সদ্য-যুবা উপন্যাসের শুরুতে ঈশ্বর-দর্শনের আকুতি নিয়ে যেমন নৈহাটি থেকে ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ হয়ে বেলেঘাটায় গিয়েছিল গান্ধী-দর্শনের আশায়, তেমনই খণ্ডিতা বাংলার আত্মানুসন্ধানে তারা পৌঁছে যায় সীমান্তপার পূর্ব-পাকিস্তানে। সেখানে গিয়ে সৈয়দ মনিরুজ্জামান, জব্বারদের সঙ্গে পরিচিত হয়, উপন্যাসে অন্যতর আলো-অন্ধকার ঘনীভূত হয় দেহোপজীবিনী মতিকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ, তত্ত্ব-তথ্য সবই যেন নিরর্থক হয়ে পড়ে মতির আধারে। তাকে এক অসামান্য প্রতীক করে তোলেন সমরেশ, যে নিছক জমি, ভূমি, মৃত্তিকা, মাটি, দেশ, অধিকার, বশীভূত, হিন্দু বা মুসলমান নয়—নারী, গণিকা, খণ্ডিতা :

সতু মোতির কাটা হাতটি আবার ঠোঁটের কাছে টেনে নিল। মোতি উঠে দাঁড়ালো। নগ্ন সুবর্ণ দেবীমূর্তি, চিরযৌবনা। বিশ্বের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ওর অপলক দীর্ঘ আয়ত চোখের পিঙ্গল তারা দুটি সতুর দুই চোখে নিবদ্ধ, "বন্ধু, এই কাটা জমিনে তুমি সালাম কর। একটু ভালবাসবা না?"

সতু মোতির দুই ভুরুর মাঝখানে ঠোঁট ছোঁয়ালো, "তুমি আমার চিরদিনের ভালবাসা। তুমিই সেই মূর্তি। তুমিই সত্যি বলেছো। তোমার জাত নেই, তুমি জমিন। এই কাটা জমিনই আমার ভালবাসা।"

মোতি স্থির অপলক চোখে সতুকে দেখতে লাগলো। সময় বহে যায়। দুজনে নির্বাক, নিশ্চল। তারপর এক সময়ে মৃদু স্বরে বাঁশি বেজে উঠলো, "বন্ধু, আমারে কাপড় জামা পরাও। "

সতু নিজের হাতে মোতিকে ঘাগরা পরিয়ে দিল। জামা পরিয়ে দিল গায়ে। মোতি মাথার চুল থেকে দশ টাকার ভাঁজ করা নোটটা বের করে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সতুকে গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের ওপর আগ্রাসী চুম্বনে, যেন সকল কিছু গ্রহণ ও দান করতে চাইলো। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে

দিয়ে, দরজার দিকে এগিয়ে গেল, "বন্ধু, নটের মাইয়া কান্দে না। নিজের বুকে ছুরি মারে। আর কি কোনোদিন এই কাটা জমিনে আসবা?" ও দরজার কাছে দাঁড়ালো।

"আসবো, চিরকাল আসবো।" সতু মোতির কাছে এগিয়ে গেল, "এই জমিনেই যেন আমি চিরকাল জন্মাই।"

বাংলা কথাসাহিত্য স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বারবার দিক্-বদল করেছে। পাঁচের দশকের লেখকদের পথে হাঁটেননি ছয়ের দশকের লেখকরা। ছয়ের দশকের লেখকরাই এখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠাগুলি বর্ণময় করে রেখেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে এর আগে সৈয়দ মুজতবা আলির মতো লেখক যেমন মুসলমান-জনজীবনের ছবি এঁকে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যকে, তেমনই পরবর্তিকালে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০) অনুরূপ কাজে আরও বিস্তারিত হয়েছেন। সিরাজের সাহিত্যে মুসলমান-জীবনের আলো-অন্ধকার যে-ভাবে পরিব্যপ্ত, তা সমকালীন অন্য লেখকের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত। সিরাজ একই সঙ্গে দুটি সমাজের কথা লিখে যে-ভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, তাঁর সমকালীন 'হিন্দু'-লেখকরা সেই কাজে তত সাফল্য দেখাতে পারেননি, এ-কথা অনস্বীকার্য। বস্তুত, সিরাজের পক্ষে দুটি সম্প্রদায়কে সমানভাবে দেখার যে-সুযোগ হয়েছে, অন্য লেখকদের তা হয়নি। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত থাকা সিরাজের পক্ষে যতটা স্বাভাবিক, সংখ্যালঘু মুসলমান-জনজীবনকে সে-ভাবে দেখা হিন্দু লেখকদের পক্ষে ততটাই অসুবিধার। বস্তুত, সিরাজ তাঁর প্রাপ্তিটি পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। দুটি সমান্তরাল সমাজের জীবনধারাকে তিনি ব্যবহার করেছেন সম্প্রীতির সূত্র হিসেবে। একদিকে সিরাজ যেমন মুসলমান-জনজীবনে ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব নিয়ে ভাবিত হয়েছেন, তেমনই হিন্দু-প্রতিবেশীর সঙ্গে মুসলমান-প্রতিবেশীর সম্পর্কের দ্বিধাদ্বন্দ্বও তাঁর আলোচ্য বিষয় হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *সংশপ্তক* উপন্যাসে ধ্রুব এবং বেবি, দুই হিন্দু-মুসলমান যুবক-যুবতীর প্রেমের স্নিগ্ধতা-জটিলতা যে-ভাবে বর্ণিত হয়, তাতে আমরা লেখকের মুক্ত মানসিকতার পরিচয় পাই। তাঁর *নিষিদ্ধ প্রান্তর* উপন্যাসেও ফিরে আসে প্রতিবেশী দুই হিন্দু-মুসলমান পরিবারের পুত্র-কন্যাদের প্রেমজ সম্পর্কের সামাজিক জটিলতা। অন্যদিকে *রেশমির আত্মচরিত* উপন্যাসে পিতৃবন্ধু হিন্দু-প্রৌঢ়ের প্রতি মুসলমান-যুবতী রেশমির বন্য আকর্ষণ, আত্মক্ষয়ী আকুলতা ধর্মশাসিত সমাজ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভিন্ন মাত্রা পায়।

সিরাজের *অলীক মানুষ* (১৯৮৮) সম-সময়ের এক অসামান্য দর্পণ। মৌলবাদী পিতার সঙ্গে ধর্ম-তথা-জীবনবোধের অনিবার্য দ্বন্দ্বে শফি ক্রমে ঝুঁকে পড়ে এক আত্মনাশী নৈরাজ্যবাদের দিকে। বস্তুত, সে-দ্বন্দ্ব কোনও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা ধর্মের দ্বন্দ্ব নয় আদৌ। তা আসলে নির্দেশ্যবাদ আর অনির্দেশ্যবাদের গভীরতম জীবনযুদ্ধ। সে-যুদ্ধে শফি বারবার

ক্ষতবিক্ষত হয়। নিজেকে, পরিপার্শ্বকে ভাঙতে চায় সে। এমনকী, তার শরীরের অন্তর্গত পূত পিতৃ-রক্ত-প্রবাহকেও চরম আক্রোশে কলঙ্কিত করতে চায় সে উদ্দাম ধর্ষণে, হত্যালীলায়। ধর্ম বিষয়ে তার ঘৃণা দিনলিপিতে লেখে সে :

> *জীনগ্রস্তের মতো একলা, জনহীন কোনো স্থানে থুথু ফেলে মনে মনে বলি, ঘৃণা ধর্মকে—যা মানুষের মধ্যে অসংখ্য অতল খাদ খুঁড়েছে। ঘৃণা, ঘৃণা এবং ঘৃণা।... ধর্ম মানুষকে হিন্দু অথবা মুসলমান করে।...তার চোখে পরিয়ে দেয় ঘানির বলদের মতো ঠুলি।*

এই উপন্যাসে লেখক হিন্দু-মুসলমান ভেদরেখাটি মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নানা সূত্রে। দুই সম্প্রদায়ের বিভেদের দিকটি বড় করে না-দেখিয়ে (যা দেখায় ধর্ম বা রাজনীতির ব্যবসায়ীরা), তাদের বিশ্বাস, যাপন ও সংস্কৃতির সাদৃশ্যই ব্যক্ত করেছেন নানাভাবে। যেমন :

> *বালির চড়ায় পাথরের স্তম্ভগুলোর কাছে গিয়ে বদিউজ্জামান থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। একটা স্তম্ভের গোড়ায় ঝুঁকে একটি মেয়ে কিছু করছিল। সে তাঁকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার ভিজে চুল, পরনের শাড়িও ভিজে। নদীতে স্নান করে এসে পিরের সাঁকোয় মানত করছিল। বদিউজ্জামান ব্যাপারটা দেখামাত্র খাপ্পা হয়েছিলেন। গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, কে তুমি? এখানে এসব কী করছ?*
>
> *মেয়েটি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেছিল, মানত দিচ্ছি।*
>
> *তুমি কোথায় থাকো? কী নাম?*
>
> *ক্যানে? নামে আপনার কী দরকার?*
>
> *তুমি মুসলমান, না হিন্দু?*
>
> *মেয়েটি বেজায় তেজী। বলেছিল, যাই হই, তাতে আপনার কী?*
>
> *বদিউজ্জামান তার স্পর্ধায় অবাক। দেখলেন, সে স্তম্ভের গোড়ায় একটা পিদিম জ্বেলে দিল। কয়েকটা ক্ষুদে মাটির ঘোড়া রাখল। তারপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তার প্রণামের ভঙ্গি দেখে বদিউজ্জামানের মনে হল, মেয়েটি নিশ্চয় হিন্দু। তাই আর তার সঙ্গে কথা বললেন না। অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।*

এই অংশে লেখক ধর্মের একদেশদর্শিতা যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের মিলটিও দেখিয়েছেন। আমরা পরে জেনেছি, হিন্দুর মতো প্রণামের ভঙ্গি যে-মেয়ের, সে মুসলমান আবদুলের স্ত্রী হলেও আদতে হিন্দু-রমণী। ফলে মুসলমানি আচার-পালনে তার মধ্যে যে জন্মগত হিন্দু-মুদ্রা প্রকাশিত হবে, তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। উপন্যাসের পরিণতিতে সে একটি প্রতীকী চরিত্রে পরিণত হয়—হিন্দু-মুসলমান সংস্কারের একাধার হয়ে উপন্যাসের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন করে।

অলীক মানুষ উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান মিলন-সম্পর্কের নানা দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন :

একটু পরে ঘোমটা টেনে এক প্রৌঢ়া হিন্দু মহিলা এলেন। বারি চৌধুরীকে আদাব দিয়ে শফিকে দেখিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, এই বুঝি আপনাদের পির-সাহেবের ছেলে?

প্রফুল্লবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, দেখে কী মনে হচ্ছে বলো?

সিঙ্গিগিন্নি বললেন, চেহারা দেখে মনে হয় বাঙালির ছেলে। মুসলমান বলে চেনাই যায় না।

বারি চৌধুরী একটু হেসে বললেন, আপনাদের খালি ওই কথা। মনে পড়ে আমাকে প্রথমবার দেখে কী বলেছিলেন? আমাকে দেখেও নাকি—

সিঙ্গিগিন্নি ঝটপট কথা কেড়ে এবং বিব্রত মুখে বললেন, না-না। সেভাবে বলিনি। সত্যি তো। মানুষের চেহারায় কি কিছু তফাৎ আছে? তবে যাই বলুন দেওয়ানসাহেব, এই ছেলেটিকে যদি ধুতিশার্ট পরিয়ে দেন, বামুনের ছেলে মনে হবে না? কেমন টকটকে গায়ের রঙ, কেমন নাকমুখের গড়ন!

প্রফুল্লবাবু একটু তফাতে চেয়ার টেনে বসে হতাশ ভঙ্গি করে বললেন নাও শুরু হল। আরে বাবা, পোশাকের ভেতর মানুষ তো একই? সেই দুখানা ঠ্যাং, দুখানা হাত, একটা মুণ্ডু!

বারি চৌধুরী বললেন, তবে বউদির কথায় একেবারে সত্য নেই, তা নয়। পোশাকও বটে, আবার মুখের ভাবাতেও খানিকটা পার্থক্য থেকে গেছে হিন্দু-মুসলমানে। কালচারাল ডিফারেন্স বলা যায়।

অন্যত্র :

শফি এই প্রথম হিন্দুবাড়ির রান্না খাচ্ছিল। অন্য এক স্বাদ—যেন বড়ো-গাজির বাড়ির খাদ্যের চেয়েও সুন্দর একটা আস্বাদ পাচ্ছিল সে। এত ভালো ডালরান্না কখনও সে খায়নি। সামান্য শাকসবজিও যে এমন সুস্বাদু হয়, তার জানা ছিল না। ভাজা মাছের ঝোলটাও খুব তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছিল সে। খাওয়ার দিকে মন থাকায় সে ওঁদের কথাবার্তায় কান করছিল না।

ভাতের শেষে চাটনি এল। তারপর দই আর সন্দেশ। দুপুরের বিরিয়ানি আর হালুয়া আজ রাতে তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। যদিও হরিনাথ ময়রার মতো সিঙ্গিগিন্নি শফির সঙ্গে দূরত্ব রেখে কথা বলছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে স্নেহ ছিল। আর ওই স্নেহের স্বাদও তার খাওয়াটিকে মধুর করে তুলছিল।

সর্বোপরি :

হিন্দু আওরতগণ মরদগণের সহিত মৌলাহাটে
আগমনকরতঃ ঈদগাহে মুছলমানদিগের হস্তে
রেশমীধাগা বাঁধিয়া দেয় তাহার বয়ান।।

"মাঠের ঈদ্‌গাহে সেই বৎসর কাতারে২ মুছল্লিদিগের জমায়েতে খুৎবাপাঠের

কালে এছলামের তরিকা (পন্থা) বুঝাইতেছি, আচানক দূরে বাদশাহী সড়কের দিকে নজর হইল। খামোশ রহিলাম। মুছল্লিগণ মুখ ঘুরাইয়া দেখিতে চাহিল, আমি আল্লাহের কোনও প্রকার নমুদ দেখিতেছি কিনা। একটি মিছিল আসিতেছিল। বিগত কয়েক মাহিনা যাবৎ গুজব রটিতেছিল, হিন্দুগণ মোছলেমদিগের উপর গোস্বা করিয়াছে। বাংলা মুলুক দুই অংশে পৃথক করা হইয়াছে। বড়লাট কারজেন বাহাদুর এবং ঢাকার নবাববাহাদুর ছলিমুল্লাছাহেব পরামর্শকরত এরূপ খণ্ডন করিয়াছেন এবং মোছলেমগণ ইহাতে নাকি অধিক ধনদৌলত লাভ করিবে। হিন্দুদিগের গোস্বা হইতেই পারে। তবে আমি ফতোয়া দিয়াছিলাম, আংরেজশাহী বেমতলবে কিছু করে না। তাই হুঁশিয়ার হওয়ার দরকার আছে। বড় গাজীছাহেব এইং দিদারুলের তবলীগ-উল-এছলাম সমিতির ভিতর ইহা লইয়া কাজিয়ার কথা শুনিয়াছি। কিন্তু আমি ফতোয়া জারি করি জে এই জিলার মোছলেম বেরাদানের কোনও সুফল নাই। ইহারা কমজোর হইয়া পড়িবে। সেই কারণবশত চালাক অংরেজ-শাহীকে মদত না দেওয়ার জরুরত রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন২ গ্রাম এবং গঞ্জ এবং শহরের হানাফিরা আংরেজশাহীকে মদত দিতেছে। ইহাতে হিন্দুরা মোছলেমদিগের দুসমন হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ওই মিছিল আর ঝাণ্ডা দূর হইতে দেখিয়া বুঝিলাম উহারা হিন্দু, দেলে ডর বাজিল। জামাতের সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ কহিল যে কাফেরগণ আমাদিগের সহিত জঙ্গ করিতে আসিতেছে। পলকে জামাত লণ্ডভণ্ড হইল। বিস্তর লোক গ্রামের দিকে ছুটিল। আওয়াজ দিতে থাকিল, নারায়ে তকবির। আল্লাহু আকবর! উহারা ঢালতলোয়ার লাঠিবল্লম আনিতে গেল। সেইসময়ে দেখিলাম, মিছিলে আওরত লোকও রহিয়াছে। হট্টগোল থামাইতে চিৎকার করিয়া কহিলাম, 'খামোশ হও!' উপস্থিত সকলে খামোশ রহিল। তখন কানে আসিল, মিছিল হইতে আওয়াজ আসিতেছে, 'বন্দে মাতরং।' জামাতে গাজীভ্রাতা দুইজনাই হাজের ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, হরিণমারার বাবুদিগের দেখা যাইতেছে। বড় গাজী কহিলেন, ডর নাই। উহারা মোছলেম ভ্রাতাদিগের হস্তে 'রাখী' পরাইতে আসিতেছে। মিছিল ঈদগাহের দিকে ঘুরিল। আনিসুর সর্দ্দারকে হুকুম দিলাম, শীঘ্র২ জাইয়া মোছলেমদিগের নিবৃত্ত করুন। তিনি ছুটিয়া গেলেন। মিছিলের সম্মুখে বালিকাসকল ছিল। তাহাদের হস্তে রেশমী ধাগা ও তকমা ঝিলমিল করিতেছিল। তাহাদিগের মুখে হাসি ছিল। মাশাল্লাহ্। ...

"সেই হিজরী ১২৭৪ সনে আমার আব্বার জওয়ান বয়স এবং আমার বালক বয়সে একবার তামাম হিন্দুস্তানে হিন্দু ও মুসলিম সিপাহী আংরেজশাহীর বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া জঙ্গ লড়িয়াছিল। আমার অজুদ শিহরিত হইল। কাঁপিয়া উঠিলাম। মিম্বার হইতে নামিয়া গেলাম। আমার পেছনে মোছলেমগণ, আমি

সম্মুখে। হিন্দুগণ আওয়াজ দিলেন, 'বন্দেমাতরং'! আল্লাহের কুদরত। একটি বালিকা, মনে হইল বেহেশতের হুরী হইবেক, ছুটিয়া আসিয়া আমার দক্ষিণ হস্তে রেশমী ধাগা ও তকমা বাঁধিয়া শের (মাথা) ঝুঁকাইবামাত্র তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া বুকে টানিলাম। আবেগবশত আমার চক্ষু সিক্ত হইল। কহিলাম, 'বেরাদনে ঔর বহিনে হিন্দুস্তান। আজ পাক খুশির দিবসে পুনরায় আংরেজশাহীর ফেরেববাজির (প্রতারণা/ধূর্তামি) বিরুদ্ধে আমরা মিলিত হইলাম। আল্লাহ আমাকে জে বাড়তি চশম্ (চক্ষু) দিয়াছেন, উহা দ্বারা নজর হইতেছে, আংরেজশাহীর বিরুদ্ধে বহুত বড় জঙ্গের জমানা আসিতেছে। তামাম হিন্দুস্তানে সমুন্দরের আওয়াজ উঠিবেক। আপনারা তৈয়ার থাকুন!'...

"বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা সকল হিন্দু আরও মোছলেমদিগের হস্তে রেশমী ধাগা ও তক্‌মা বাঁধিয়া দিতেছিল। বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরাও সেই কর্মে রত থাকিলেক। তাহার পর উহারা আচানক (গান) গাহিয়া উঠিলেক। দুই কর্ণে অঙ্গুলি গুঁজিব জে হস্ত উঠিল না। বাকরহিত দাঁড়াইয়া রহিলাম। উহারা গাহিতে গাহিতে গ্রাম অভিমুখে গমন করিলেক্। পরে গানটি বড়োগাজী আমাকে লিখিয়া দেন। উহা এইরূপ :

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান...

"সেই দিবস ঈদের পর সড়কে দাঁড়াইয়া বড়গাজি আমাকে কহেন জে ওই গানটি শাইরি করিয়াছেন জনৈক বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিও তৌহিদের প্রচারক। তাঁহারা 'ব্রাহ্ম'। পুছ করিলে বড়গাজি যাহা বলেন, শুনিয়া তাজ্জব হইয়া জাই। ব্রাহ্মগণও 'লাশরিকালাহ' এই মতে বিশ্বাসী। তাঁহারা আল্লাহকে নিরাকার ব্রহ্ম কহেন। বুতপরস্তির (পৌত্তলিকতার) নিন্দা করেন। মাশাল্লাহ্! ওই 'শাইর' বাবুকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। শুনিলাম জে তিনি বীরভূম জিলার বোলপুর সন্নিকটে এবাদতখানা বানাইয়া বাস করেন এবং তিনি ওই এবাদতখানা এলাকায় বুত্-পরস্তি হারাম বলিয়া হুকুম জারি করিয়াছেন। মারহাবা! মারহাবা!"...

এইভাবে *অলীক মানুষ* উপন্যাসটি ছত্রে-ছত্রে যেমন একদিকে হয়ে ওঠে বিশ-শতকের তিনের দশকের একটি মুসলমান-জনপদের আশ্চর্য চিত্র, তেমনই সেই জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির বিবরণ। এই উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমান সব চরিত্রই এত বিশ্বস্ত অঙ্কিত যে, দুই সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলে হয়ে ওঠে এক মহাজীবনের পূর্ণাঙ্গ দলিলচিত্র।

গৌরকিশোর ঘোষের মতোই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ও (১৯৩৩-২০০১) তাঁর সাহিত্য-জীবনের অন্তিম পর্বে পৌঁছে লিখেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসটি—*শাহজাদা দারাশুকো*

(১৯৯১)। দুই লেখকই তাঁদের শেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাসে অবলম্বন করেছিলেন মুসলমান-জীবনের ঐতিহাসিক, সমস্যাসঙ্কুল ঘাত-প্রতিঘাত। 'মুসলমান' লেখকেরা প্রায়শই হিন্দু-জনজীবনের কাহিনি ও চরিত্র তাঁদের রচনার বিষয় করলেও, 'হিন্দু' লেখকরা সে-ভাবে মুসলমান-জীবনী আঁকেননি তাঁদের সাহিত্যে। হয়তো, তথাকথিত সংখ্যালঘু লেখকরা তথাকথিত সংখ্যাগুরু সমাজের আকর্ষণ ও প্রভাবে ওই জাতীয় গল্প-উপন্যাস লিখতে স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহী হন। সংখ্যাগুরু পাঠকের কাছে পৌঁছবার আগ্রহ থাকে তাঁদের। বিপরীতে, 'হিন্দু' লেখকরা সে-ভাবে 'মুসলমান' পাঠকের প্রতি সেই দায় ও আকর্ষণ বোধ করেন না। অভিজ্ঞতারও অভাব থাকে তাঁদের। কিন্তু, গৌরকিশোর ঘোষ (*প্রেম নেই*) ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই সাধারণ প্রচলনের ব্যতিক্রম হয়েছেন। এবং, দু-জনেই এ-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বা আবুল বাশার বিপরীত উদ্যোগে যেমন সফল।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *শাহজাদা দারাশুকো* উপন্যাসটি সেই অর্থে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর আলো না-ফেললেও, মুসলিম রাজতন্ত্রের অন্ধতার উপর জ্যোৎস্নার মতো বিছিয়ে দেয় এক গভীরতর মানবতার আকুতি। মোগল বাদশাহ আকবর 'দিন ইলাহি' প্রচার করে যে-ধর্মীয় সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে খ্যাত হয়েছিলেন, তা গ্রহণ করেননি তাঁর ক্ষমতামদমত্ত সম্রাট-পুত্রেরা। কিন্তু, আকবরের প্রপৌত্র শাহজাদা দারাশুকো পরবর্তিকালে সেই প্রেম ও মানবধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক হয়েছিলেন। যুগপৎ মসজিদ ও মন্দিরে নতজানু হতে কুণ্ঠিত হননি তিনি। বস্তুতপক্ষে, ইসলাম-ভিত্তিক সুফি ধর্মের মানবিক মন্ত্রকেই সমস্ত ধর্মের সারাৎসার-রূপে গ্রহণ করেছিলেন দারাশুকো। ঈশ্বর যে কোনও বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কুক্ষিগত হতে পারে, এমন বিশ্বাস দারার ছিল না। ফলে, তিনি, স্বভাবতই, ধর্মান্ধ সমাজ ও রাজনীতির, এমনকী ইতিহাসেরও চক্ষুশূল হয়েছিলেন। 'ধর্মদ্রোহী' তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছিল তাঁর গায়ে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, তিনি *'প্রেমের ভেতর, যুদ্ধের ভেতর, ষড়যন্ত্রের ভেতর ভাসতে ভাসতেও মানুষের ধর্ম খুঁজে বেড়িয়েছেন।'*

মোগল-ইতিহাসের রণরক্ত-সাফল্যের কথা ইতিহাসে যতটা বর্ণময় করে আঁকা হয়েছে, দারাশুকোর কাহিনি ইতিহাস ততটাই গোপন করেছে। আর, ইতিহাসের সেই উপেক্ষিত পুরুষটিকে সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে রক্তমাংসে এঁকে শ্যামল যেন আমাদের জাতীয় কৃতঘ্নতারই প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। উপন্যাসের ভূমিকায় শ্যামল লিখেছেন :

> *প্রেমিক দারা ধার্মিক দারা হাত ধরাধরি করে চলেছেন। মানবীপ্রেমে তাঁর ঈশ্বরানুভূতি একাকার হয়ে গেছে. কিন্তু চতুর জগতে কুটকৌশলের অভাবে যোদ্ধা দারা সুবিধা করে উঠতে পারেননি। তিনি অলৌকিকে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধতা ছিল না বলে ওমরাহদের সবাইকে চটিয়ে বসেছিলেন। যে রাজপুতদের তিনি একসময় বাঁচিয়েছেন—তাঁরাই তাঁকে প্রবল উৎসাহে তাড়া*

করে আওরঙ্গজেবের হাতে তুলে দিয়েছেন। ধর্মান্ধ ক্ষমতালোভীর ধর্মদ্রোহের মিথ্যা বদনাম দিয়ে তাঁকে ঘাতকের কাছে ঠেলে দিয়েছেন।

হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো খাঁটি মুসলমান হিসেবে ইসলামে বিশ্বাসী হয়েও বারবার বলেছেন, সত্য কোন ধর্মের একচেটিয়া নয়। ঈশ্বরে যাওয়ার রাস্তাও অনেক। মানবধর্মী দারাশুকোই প্রথম নানান ধর্মের তুল্যমূল্য বিচারে নেমে মানুষের ধর্মটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বমনীষার সামনে এসেছে উপনিষদ তাঁরই চেষ্টায়।

—হে মহান দিশারী, শাহজাদা দারাশুকো (প্রথম খণ্ড)

শাহজাদা দারাশুকো উপন্যাসটির মূল সুর ধর্মীয় বিভেদ নয়, সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ছনা, আকুলতা। মানুষের জীবনের চেয়ে, প্রেমের চেয়ে, প্রাণের চেয়ে ধর্ম যে কখনওই বড় হতে পারে না, তা এই উপন্যাসের মূল আখ্যানের পাশে পরম আকুতিতে বিবৃত করেছেন শ্যামল। যেমন, সফি-মীনাক্ষীর টানাপোড়েনের প্রণয়-সম্পর্কে :

কিন্তু আজকের অবস্থা কিছু অন্যরকম।

সফি আর মীনাক্ষীকে ঘিরে মুলতানি চাষীদের ঘেরাওটা অনেক ছোট হয়ে এসেছে। ওদের নাকের ফুটো দাঁতের শ্যাওলা সকালের রোদে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সফি।

শের খাঁ চেঁচিয়ে উঠলো, মরদটা নামাজ পড়ে। তুই তো পড়িস না—তুই কে? হিন্দু?

—আমি ইনসান। ব্যস্—আর এগোলে কাউকে আমি ছাড়বো না।

মীনাক্ষীকে দু'হাতে ধরে সরিয়ে দিতে গেল সফি। সরে যাও বলছি। আমি একাই দেখছি—

মীনাক্ষী সরলো না। সে এবার ঘুরে গিয়ে দু'হাতে সফিকেই জড়িয়ে ধরলো। এমনভাবে মীনাক্ষী কখনোই সফিকে জড়িয়ে ধরেনি। সফিরও এরকম অভ্যেস নেই। কোনো একসময় সে এমন খোয়াব দেখলেও—অনেকদিন আগেই সে তার এই স্বপ্ন থেকে অনেকদূরে সরে এসেছে। নইলে সনাতন ওদের তালাশ করতে মীনাক্ষীর পাগলপারা খোঁজাখুঁজির শরিক হয় সে কী করে?

এক ঝটকায় সফি মীনাক্ষীকে সরিয়ে দিলো। তুমি কেন শুধু শুধু আমার সঙ্গে নিজের নসিবকে জড়াচ্ছো।

মীনাক্ষী পড়ে গিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো। পারলো না। ততক্ষণে শের খাঁ আর দু'জন মিলে সফির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—মীনা বাঈকে রেখে তুই এখন থেকে কেটে পড়—কিছু বলবো না—

সফি ওদের ভেতর থেকে এক ঝটকায় বেরিয়ে এসে পা তুলেছিল। লাথি কষাবে। পারলো না। আস্ত পাখানা ধরে শের খাঁ এমন জোরেই মুচড়ে দিলো

যে—সফি মুখ থুবড়ে চষা জমির ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। পড়ে গোঙাতে লাগলো।

পরবর্তী সময়ে :

একথায় সফির নাচ যেন বেড়ে গেল। লম্বা লম্বা হাত-পা বাজনার তালে এদিক ওদিক চালাচ্ছে। সেই তালে গলাও খুলে দিলো সফি—

হম মনী বর খীজদ্—ইনজী হাম তুয়ী-ই-ই

—এই দ্যাখো। আবার কী গায়। কিচ্ছু বুঝি নে—

নাচ নামিয়ে—বাজনা থামিয়ে সফি চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, সবই এখন 'তুমি' হয়ে গেছো—আমিও 'তুমি' হয়ে গেছি—

—বেশ। হয়েছে। এবারে এসো। বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না। আমি কি ছাই তোমাদের গান বুঝি?

—এ আমাদের গান নয় মীনা বাঈ। এ হলো গিয়ে ফারসি গান—

চুন্য়কী বাশদ্ হমী, ন বাশদ্ দুয়ী।

হম মনী বর্ খাজদ—ইনজা হাম তুয়ী।

—এখন সবই 'তুমি' হয়ে গেছো!—আমিও 'তুমি' হয়ে গেছি।

শুনে মনটা ভরে যাচ্ছিল মীনাক্ষীর। খুশিতে গলায় ঝাঁঝ এসে গেল তার। বেশ গমক দিয়েই বললো, এবারে ঘরে এসো তো। রাত অনেক হয়েছে।

—বলে মীনাক্ষী নিজের ভেতরে ভেতরে নিজেকেই যেন বললো, এত ভালোবাসো তুমি?

—আরেকটা গান শোনো—আমীর খসরুর লেখা—

—আঃ! এই নিশুতি রাতে জ্বালাবে তো দেখছি।

—শোনোই না—বলে গলা ছেড়ে গজল ধরলো সফি—

আশিক এ-ইয়ার অম

মারা বা মুসলমানি দর কার নিস্ত্।

হর রগ এ-মন তার গস্ত্

হাজ্জত এ-জুন্নার নিস্ত

মীনাক্ষী চেঁচিয়ে উঠলো, কিচ্ছু বুঝিনে—

আমি তোমায় ভালোবেসে মুগ্ধ—মুসলমানিতে আমার আর কোনো দরকার নেই। আমার শরীরের সব শিরা তোমার হয়ে গেছে—

—থামো বলছি। থামো—বলে চেঁচিয়ে উঠলো মীনাক্ষী। সারা রাত কোত্থেকে শরাব গিলে আসা হলো?

আন নিশান এ দীদ এ-হিন্দুস্থান বুবদ।

কি জহদ আজ খ্বাব ও দেওয়ানা শবদ ॥

—উঃ। বলছি তো কিচ্ছু বুঝিনে তোমার গান—

—গান নয় মীনা—এ গান নয়। রুমির রুবায়-ই। কেউ হিন্দুস্থানের সিনার ভেতর তার দিলকে যদি দেখে থাকে তো তার পক্ষে আর ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব নয়। সে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠবে। একেবারে দিওয়ানা—আত্মভোলা হয়ে যাবে।—কী আশ্চর্য দেশ এই হিন্দুস্থান। তাই না মীনা? তুমি এখানে থাকো। তাই হিন্দুস্থানকে আমার এত ভালো লাগে—

—একথাও তোমার রুমি লিখেছে নাকি।

—নাঃ। তোমার কথা আমিই যোগ করে নিলাম।

—কোথায় খেলে?

—লাট্টু শাহ দারোগাবাবা চিসতির দরগাহর পেছনে। যমুনার ভাঙা পাড়ে—

—সেখানেও শরাবের ঠেক হয়েছে নাকি?

—শরাবের নয় মীনা বাঈ। কবিতার। রুবায়-ইর। দোহার। চৌপাঈয়ের ঠেক। অনেক বুজুর্গ ইনসান আসেন। হাফেজ রুমি, ফেরদৌসি, তুলসীদাস—সব শোনা যায়। চর্চা হয়। তা গান-গজলের সঙ্গে তো একটু শরাব থাকতেই পারে। কী বলো?

—দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর মুয়াজ্জিনের মতো বাণী দিতে হবে না। ঘরে এসো। সারারাত তো খাওনি কিছুই।

হঠাৎ আবার মীর সফির হাতের আঙুলে রবাবের তার গেয়ে উঠলো। ঠাণ্ডা বাতাসে শেষরাতের সাদা জ্যোৎস্না যেন কেঁপে ফুলে উঠছিল। হেলমন্দের তীরের সা-জোয়ান সফি এবার সত্যি সত্যিই আফগান ঢংয়ে নাচতে লাগলো। হেলে দুলে। বেঁকেচুরে।

নিচে নেমে সফির মুখোমুখি হলো মীনাক্ষী। এসব কী হচ্ছে শুনি?

নাচতে নাচতেই সফি একবার ঝুঁকে বললো, বড় আনন্দ হচ্ছে আজ। কেন জানি না—

—থামবে?

সেরকমই নাচতে নাচতে সফি একবার কাছে এলো মীনাক্ষীর। এসে নাচের তালেই বললো, তুমি আমার ধর্ম নেবে?

—ধর্ম?

নাচতে নাচতেই সফি বললো, হ্যাঁ। আমার ধর্ম। নেবে তুমি?

—কিসের ধর্ম? কী ধর্ম?—সব গুলিয়ে যাচ্ছিল মীনাক্ষীর। সন্ধেরাতে বালহস্তীর পেছন পেছন ছোটা। শেষ রাতে উঠে এই তুমুল নাচ দেখা। কী বলবে বুঝতে পারছিল না মীনাক্ষী।

নাচতে নাচতেই রবাবে আঙুলের ঘা দিয়ে সফি বললো, ভালোবাসার ধর্ম।

ভালোবাসার—

হো হো করে হেসে উঠলো মীনাক্ষী। ধ্যাৎ! সে আবার হয় নাকি? ভালোবাসা দিয়ে ধর্ম হয়? আমার তোমার ভালোবাসা দিয়ে?

সখির নাচ-বাজানো আরও তুমুল হয়ে উঠলো একথায়।

তাই দেখে মীনাক্ষীর ভয় হলো। হাত-পা ভাঙবে দেখছি—

সখি গেয়ে উঠলো—

এক মুঙ্গ-কা দো ফান্দ হৈ
কুন জিয়াদা কুন কাম্।

দীন দরবেশদের এ-গান মীনাক্ষী কনৌজে থাকতেই শুনেছে। গঙ্গার গা ধরে হাটে মাঠে ঘাটে একটু কান পাতলেই এ গান শোনা যায়। মানেটাও জানে। একটি মুগের দানার দুটি খোসা। একটা খোসা অন্য খোসাটার চেয়ে বড়ও নয়—কমও নয়।

এই সহজ-কঠিন প্রাকৃত প্রেমধর্মের পাশে শ্যামল নতুন করে সৃষ্টি করেছেন ভক্তকবি তুলসীদাসের চরিত্রটি, যিনিও ভালবাসা আর সমন্বয়ের পথ খোঁজেন দোঁহার আধারে। পাশাপাশি কোরান আর বেদের ঘনিষ্ঠতা আবিষ্কারে উতল হন দারাশুকো। শ্যামল তুলসীদাস, বেদ, উপনিষদের পাশেই স্থাপন করেন দারাশুকোকে। দারার আত্মকথা লেখেন :

মারা বা-উমুয়াম-ই ইন্ হার দো কোয়াম করে নিস্ত্।

এই ক'টি কথা নিজের সামনের কাগজে নাস্তালিক ফারসিতে লিখলেন শাহজাদা দারাশুকো। লিখে একবার মনে হল—বড় কঠোর হয়ে গেল? তাই না। কিন্তু না লিখেই বা কী করব? দারার মন বলল, ভেবেছিলাম—আমি আল্লাতালার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে যা জেনেছি—সবই আমি হিন্দু, মুসলমান—হিন্দুস্থানের তাবত ইনসানকে দু'হাতে বিলাব।

কিন্তু নেবার লোক নেই। নেবে কি? নেবার বদলে তারা উঠে পড়ে লেগেছে—এই কথাটিই প্রমাণ করতে—শাহজাদা দারাশুকো কতখানি বিধর্মী। উঃ। বিধর্মী? আমি? নিজেকেই নিজে বলতে বলতে দারা তাঁর গায়ের পশমিনাখানি সারা গায়ে পেঁচিয়ে নিলেন। এবার হিন্দুস্থানের সারা উত্তর জুড়ে যেন বেরহম শীত পড়েছে। এ শীতের কোনও দয়ামায়া নেই। আগ্রা-জাহানাবাদের রাস্তায় রাস্তায় বেসাহারা লোকজন মারা যাচ্ছে। রোজ ভোরে দুই রাজধানীর সড়ক থেকে শীতে একদম শেষ মানুষের মুর্দা তুলে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

শাহজাদা ফের লিখলেন : মারা বা-উমুয়াম্-ই-ইন্ হার দো কোয়াম্ করে নিস্ত্। হিন্দু বা মুসলমান—কোনও দিককারই সাধারণ মানুষজনকে নিয়ে আমার কোনও দরকার নেই। আমজনতা মানেই নিন্দা-মন্দের ঝড়। আমি বাছাই মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। এই বাছাই মানুষরাই সমাজে সাম্য আনবে।

দারার কানে এসেছে—জামা মসজিদে শুক্রবারী বড় নমাজের পর দুই কট্টর মোল্লা—শেখ আহমদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিক আর আবদুল হক মুহাদ্দিম দেহলভি সব কিছু উদার কাজকর্মকে ইসলামের দুশমনি বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ফতোয়ায় কারও নাম নেই। কিন্তু লক্ষ্য যে শাহজাদা দারাশুকো তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বলা হচ্ছে—ইসলামকে সুফীয়ানার আড়ালে অবিশ্বাসীদের কাফেরির সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ইসলাম বিপন্ন। কেননা, ইসলামের সত্য ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

শাহজাদা জানেন, সুফীয়ানায় ইসলাম বিপন্ন নয়। বিপন্ন ওই কাঠ-মোল্লারা। কেননা, উদার সুফীয়ানায়—দিলদরিয়া কাদিরী উপাসনার ভেতরকার জোরে মানুষ ঈশ্বরের পথের পথিক হয়ে পড়েছে। তাদের আর মোল্লা, উলেমা, আলেমের দরকার হচ্ছে না। ওরা তাই সাধারণ মানুষের ওপর ভেলকির জাল—মোহ ছড়াতে না পেরে বেকার হয়ে পড়ছে। কেননা, মানুষ বুঝতে পারছে—সত্য কারও একচেটিয়া হতে পারে না। সব ধর্মেরই সত্য আছে। ঈশ্বরে যাওয়ার জন্যে চাই সত্যে আগ্রহ, শুদ্ধ চিত্ত আর মানুষকে সেবা করার ইচ্ছা। এই সরল সিধে পথ নিলে সব ধর্ম থেকেই দালাল, ফড়ের উৎপাত বন্ধ হয়।

আমি মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মুসলমান। তবে আমি সুফী পথের পথিক। সব ধর্মেই মুক্তি আছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—ইসলাম বই অন্য কোনও ধর্মে মুক্তি নেই। শুধু কোরান কেন? বেদও ঈশ্বর থেকেই এসেছে। তাই বেদে কোরানের অনেক কিছুই আছে। একথা বলি—একথা বিশ্বাস করি বলেই কি আমি কাফের হয়ে যাব? কাফেরের মূর্তি উপাসনার পেছনেও বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসই ঈশ্বর।

কোরানের অনেক ব্যাখ্যা বেদে পাওয়া যায়। একথা বললেই কি ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হল? ঈশ্বর থেকে এসেছে এমন অনেক বই ইসলাম বিশ্বাস অনুসারে বাতিল হয়েছে। কিন্তু যিনি ধর্মের গূঢ় জগতে ঢুকতে চান তিনি ওই সব বই পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হতে পাবেন। কাজেই আমি যদি বেদের ভেতর কোরানের কিছু রহস্যের সমাধান পেয়ে থাকি তো দোষের কী? এই সিরহিন্দি মুজাদ্দিক আর মুহাদ্দিম দেহলভির পায়ে পড়তে হবে আমাকে?

কিছুতেই নয়।

হিন্দুস্থানের প্রাচীন গ্রন্থ পড়ে বুঝতে পারছি—দয়ালু ঈশ্বর সৃষ্টির শুরুয়াতে বেদ নামে ঐশ্বরিক গ্রন্থ মানুষের জন্যে পাঠান। তাতে মানুষের ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধে উপদেশ, আদেশ, নিষেধ আছে। হিন্দুদের সব ধারারই বিশ্বাস—ঈশ্বর বা আল্লাহ এক। তিনিই সবার ওপরে। তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। জগৎ ধ্বংস হবে। মানুষ তার সুকাজের পুরস্কার পাবে। কুকাজের শাস্তি পাবে। কোরানে ইহুদি আর খ্রিষ্টান ধর্ম ছাড়া অন্য সব বাতিল হওয়া ধর্মের কোনও নাম করা হয়নি।

কিন্তু দুনিয়ায় বহু ধর্ম আছে। কারণ, কোরানেই আছে—এমন কোনও দেশ জাতি নেই যাদের মধ্যে পয়গম্বর বা অবতার আসেননি। এসব পয়গম্বরের বিবরণ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে আছে। এই বিশ্বাসে কথা বলতে দোষ কোথায়?

এসব ভাবতে ভাবতে শাহজাদার বুকের ভেতর যন্ত্রণা হচ্ছিল। আগ্রা দুর্গের দারা-মহল এখনও আগের মতোই সাজানো। কেননা, শাহজাদা নিজেই জানেন না—কখন কোথায় থাকবেন। দেওয়ান-ই-খাসের দিক থেকে এই সন্ধ্যাতেই বড় করে আলো আসে। খোলা অলিন্দে দাঁড়ালে সে আলোর আভা টের পাওয়া যায়। শাহজাদা খোলা অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালেন। আল্লা নামের চেয়ে মধুর আর কিছু নেই। একথা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দুয়ের কাছেই সত্য। একশো চব্বিশ হাজার পয়গম্বরকে পাঠানো হয়েছে শুধু একটি কথা বলতে : আল্লা বলো। তাঁর নাম করো। আমি খুব নিঃশব্দে আল্লার নাম জপ করি। তখন আমার জিভ নড়ে না। মিঞা মীর আমায় শিখিয়েছিলেন।

শাহজাদা দারার অনেক আগে মনে হত—সবই তুমি—আমি কিছু নই। এখন সেই আমি তুমি একদম ঘুচে গেছে। এখন মনে হয়—আমি সেই আমি। হামহ্ ওয়াজাহ্ সমা হামহ্ আয়ন—তুমিই সব মুখ—সব কান—সব চোখ। এই চোখ দিয়ে জগৎ দেখতে পাই! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখা যায়। উজ্জ্বল বালিকণায় সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি। সমুদ্রের নোনা জলকণায় সমুদ্র দেখছি। ইসলামের বাইরের খোলস খসে পড়েছে। এখন নাস্তিকতা আমার কাছে উদ্ভাসিত।

শাহজাদা দারাশুকো একা একা আগ্রা-দুর্গের অন্ধকার খোলা অলিন্দে বলে উঠলেন : অগর কাফির (আ) জ্ ইসলাম-ই-মাজাজি গস্ত বেজার—কে রা কুফির-ই-হকিকি সুদ পদিদার। যদি কোনও অবিশ্বাসীকে ইসলামের বহিরঙ্গ থেকে বের করা হয়—যিনি অবিশ্বাসের আসল চেহারা জানতে পেরেছেন—তাহলে কেমন হয়?—ভাবতে ভাবতে শাহজাদা ফের বিড়বিড় করে উঠলেন—

দারুণ হার-বাত এ জান ইস্ত পিন্‌হান্
বা-জের-ই কুফার ইমান-ইস পিন্‌হান্।

সাধনায় প্রতিটি মূর্তি সজীব হতে পারে। অবিশ্বাসের নীচেই লুকিয়ে আছে বিশ্বাসের ফল্গু। নিজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা রুবাইটি পাছে ভুলে যান—তাই দারা ছুটে তাঁর অন্দমহলে চলে এলেন। লিখে রাখবেন। মেঝেতে কাগজের সামনে বসবেন বলে নিচু হওয়ার সময় আপন মনেই বললেন, লা ইলাহা ইল আল্লা—আল্লাই একমাত্র পূজ্য—আল্লাই একমাত্র আছেন।

রুবাইটি ঘোরে পাওয়া মানুষের মতো তাড়াতাড়ি লিখে রাখতে রাখতে একই সঙ্গে দারা নিজেকে মনে মনে বলে উঠলেন, কাবা আর সোমনাথ আমার একই লাগে। আমি না হিন্দু—না মুসলমান। তাহলে আমি কী?

দারাশুকোর এই আত্মানুসন্ধানে আজও, এতকাল পরেও, বিন্দুমাত্র আগ্রহী যে হইনি আমরা, তা-ই যেন সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের একমাত্র ট্র্যাজেডি, নিয়তি।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪) অবদানের কথা এখন অবিসম্বাদিত। মূলত-কবি সুনীল যখন প্রথম কথাসাহিত্যে মনোনিবেশ করেন, তখনই সচকিত হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের পাঠক। প্রথমদিকে তিনি ব্যক্তিক সুখ-অসুখের বিবরণ কথাসাহিত্যে লিপিবদ্ধ করলেও পরে তিনি ইতিহাসের পটভূমিতে সময় ও সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাত বিবৃত করেন তাঁর কয়েকটি সুবিস্তৃত উপন্যাসে। *একা এবং কয়েকজন* (১৯৭৪) উপন্যাসটি সেই ধারার প্রথম অভিজ্ঞান।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিকায় *একা এবং কয়েকজন* কয়েকটি মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনি হলেও, তা শেষপর্যন্ত একটি জ্বলন্ত সময়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। স্বভাবতই এই উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্ব, দাঙ্গা এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

সুনীল লিখেছেন :

> *...ব্রজদা, রাজনীতি এখন অন্যদিকে যাচ্ছে। ইংরেজের সবচেয়ে মারাত্মক চালটা আপনারা এখনও ধরতে পারছেন না। মুসলীম লীগের কথা ভুলে যাচ্ছেন? ইংরেজ এখন মুসলীম লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। এখন আর স্বাধীনতা বড় প্রশ্ন নয়—এখন হিন্দুর স্বাধীনতা, মুসলমানের স্বাধীনতা। সারা দেশ জুড়ে এখন চলবে মন-কষাকষি, দর-কষাকষি—আমরা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাবো ক্রমশ।*
>
> ...
>
> *তারিখ সাহেব হাত নেড়ে বললেন, মুসলীম লীগকে অত গুরুত্ব দেবেন না। ও সব জিন্না সাহেবের খেয়াল। নিজের হাতে পাওয়ার রাখার জন্য।*
>
> *—মুসলীম লীগকে গুরুত্ব না দিয়ে আপনারাই ভুল করছেন। কংগ্রেসও এই ভুল করেছে। গোড়া থেকেই জিন্না সাহেবের সঙ্গে আঁতাত করেনি। এখন কংগ্রেস সারা ভারতে একজনের বেশি ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে ভোটে জেতাতে পারলো না। মুসলমানদের মনে বিশ্বাস জেগেছে যে তাঁদের অধিকার আদায় করার জন্য মুসলীম লীগ ছাড়া গতি নেই। কংগ্রেসী স্বাধীনতা এলে হিন্দুদেরই আধিপত্য হবে। আবুল কালাম আজাদ এ বিশ্বাসে একটুও চিড় খাওয়াতে পারলেন না। কংগ্রেস শুধু জোড়াতালি দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছে—গান্ধীজি শুধু কোরান পাঠ করে মুসলমানদের মন জয় করার কথা ভাবছেন।*

উপন্যাসের অন্যত্র প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন সুনীল, যেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমান-রাজনীতির পাশাখেলা :

> *ইংরেজদের সঙ্গে দর-কষাকষির আগে ভারতীয় দলগুলির মধ্যে মতৈক্য আনতেও কেউ সক্ষম হয়নি। জিন্না সাহেবের মুসলীম লীগ ততদিনে কলসী*

থেকে বেরুনো মস্ত বড় দৈত্যে পরিণত হয়েছে—অথচ গান্ধীজি এবং কংগ্রেস তাকে বাস্তব বলে কিছুতেই স্বীকার করছেন না। ১৯৪০-এ লাহোরে পাকিস্তানের দাবি পর্যন্ত উঠে গেছে—কিন্তু কংগ্রেস তা নিয়ে আলোচনা করতেই রাজী নয়। এর আগে, বাংলাদেশে ফজলুল হক যখন লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চেয়েছিলেন—তখন কংগ্রেস ফজলুল হকের সঙ্গে সহযোগিতা না করে এক চরম ভুল করেছিল। এবারও লীগের সঙ্গে আপোসে মীমাংসা না করে কংগ্রেস লীগকে আরও দূরে সরিয়ে দিল—যে লীগ চেয়েছিল শুধু শাসন ক্ষমতার অংশ, এখন তারা চাইলো দেশের অংশ—সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষে এই সময়েই সত্যিকারের সার জল পড়লো। জিন্না সাহেব আরও শক্ত হলেন, পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের যে-কোনো আলোচনা মুসলীম লীগকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। বৃটিশ সরকারের পক্ষে এতে সুবিধে ছাড়া অসুবিধে বিন্দুমাত্র নেই।

একদিকে এই বিভেদের বাজনীতি, অন্যদিকে সংস্কারের বীজ দুটি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মাঝখানে তুলে দিয়েছে বিভেদের পাঁচিল। সুনীল দুই কিশোরের কথোপকথনের মাধ্যমে বিবৃত করেছেন সেই বিভেদের চিত্র :

খালধারে ছিল আমার ইস্কুলের বন্ধু মুর্তজার বাড়ি। মুর্তজার বাবা ইফতিকার সাহেব শহর আদালতে ওকালতি করতেন।...

...পুজোর কয়েকটি দিন আমার মামাবাড়িতে গ্রামসুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ হতো।—হিন্দু মুসলমান কেউ বাদ যেত না। সেইজন্যই আমি মুর্তজাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই অষ্টমীর দিন সারা রাত থাকবি তো? মাঝ রাত্তিরে আরতি হবে, খুব মজা হবে।

মুর্তজা বলেছিল, আমি তো যাবো না। বাবা বলেছেন, হিন্দুদের পুজোয় আমাদের যেতে নেই। আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম, কেন?

—তোরা তো পুতুল পুজো করিস। আমাদের ওসবে যোগ দিতে নেই।

...

...চোখ গোলগোল করে ওকে ভয় দেখিয়ে বললাম, কেষ্টঠাকুরকে কখনো পুতুল বলতে নেই। তাহলে ঠাকুর তোকে পাপ দেবে।

মুর্তজা বলল, তোদের ঠাকুর আমাকে পাপ দিতে পারবে না। আমাদের খোদাতাল্লা আছেন। খোদাতাল্লা অনেক বড়।

...

তারপর আমরা দুই খুদে ফ্যানাটিক ঝগড়া শুরু করে দিলুম।

কিন্তু, ওই বালকোচিত ঝগড়া সত্ত্বেও দুর্গাপুজোয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের ছিল অবারিত দ্বার। সুনীল লিখছেন :

দুই ব্যাচে খাওয়ানো হয়—দাদামশায়ের হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যাচ। মুর্তজা না এলেও অনেক মুসলমানই উৎসবে যোগ দিতে এসেছে।

জন পনেরো লোক পরিবেশন করছে—ঝাকা ঝাকা লুচি আসছে আর উড়ে যাচ্ছে। ও এনাতালি, তোমাকে আর একখানা অমৃতি দিই? ও আইনদ্দি, তুমি গতবার ছ'গণ্ডা রসগোল্লা খেয়েছিলে, এবার মাত্র সাড়ে চার গণ্ডা খেয়েই কাৎ?...

প্রতিবেশী জমিদার ইমানুল্লা দাদামশায়ের পাশে মখমল মোড়া চেয়ারে বসে আছেন, জাঁদরেল ভঙ্গিতে।...

আর তখনই পুলিশ এল। প্রতিমায় ব্রিটিশ-বিরোধিতা রয়েছে, অভিযোগ তাদের।

—এ প্রতিমা পুজো বন্ধ রাখতে হবে। গভর্নমেন্টের হুকুম।

—পুজো আচ্চাও এখন থেকে গভর্নমেন্টের হুকুমে চলবে নাকি?

—এ প্রতিমা এক্ষুনি বিসর্জন দিয়ে দিন। ঘট পুজো করুন।

ইমানুল্লা মাঝখানে এসে বললেন, আপনে কন কি চৌধুরী সাহেব। নিজে হিন্দু হইয়া আপনি হিন্দুর পূজা বন্ধ করতে চান?...

সুনীল এখানে দুই সমান্তরাল সমাজের সম্প্রীতির দিকটি এমন আবেগঘন ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে সেখানে সব আরোপিত বিভেদ মিথ্যা হয়ে যায়।

কিন্তু, ইতিহাসকে উপেক্ষা করতে পারেন না সুনীল, তাঁকে লিখতেই হয় ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সেই ইতিহাসের কথা, যার প্রতিটি পৃষ্ঠায়ই লেগে আছে রক্তের দাগ :

দেশে একটা হাওয়া উঠে গেছে যে, ইংরেজ এবার সত্যিই এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। ১৯৪৮ সালেই তারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছে। এখন স্বাধীনতার প্রশ্ন আর বড় নয়—এখন শুধু ভাগাভাগির প্রশ্ন। আবার এসেছে ক্যাবিনেট মিশন, লর্ড ওয়াভেল গান্ধীর সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠকে বসছেন—আর সব বানচাল করে দিচ্ছেন জিন্না। গান্ধীজী যতই ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম করুন, জিন্না সাহেবের চোখে তিনিই হিন্দুই রয়ে গেলেন এবং কংগ্রেস নিছক হিন্দুর পার্টি। এই কংগ্রেসের হাতে দেশের ভার দিয়ে গেলে মুসলমানদের জীবন বিপন্ন হবে। জিন্না ততদিনে এ দেশের মুসলমানদের প্রায় বুঝিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে পাশাপাশি শান্তিতে থাকা সম্ভব নয়। হিন্দু আর মুসলমানরা এতকাল পরে ঘুম ভেঙে উঠে জানতে পারলো যে তারা দুটো আলাদা জাত, তাদের দেশও আলাদা।

এই পরিস্থিতিতে যা অনিবার্য তাই হয়, দাঙ্গা বাধে। সেই দাঙ্গার বিবরণ লিখেছেন সুনীল তাঁর সাবলীল ভাষায়। দাঙ্গার মাঝখানে অভিমন্যুর মতো স্থাপন করেছেন উপন্যাসের নায়ক সূর্যকে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল বেড়ে যাচ্ছে। সূর্যর মতো একা আর কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটছে না, সব জায়গাতেই আলাদা আলাদা দল। সূর্যর ভেতরকার

প্রচণ্ড রাগী এবং জেদি ব্যক্তিত্বটি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে—কিন্তু এই ধর্মোন্মাদ রক্তপাগল জনতার কাছে প্রকৃতপক্ষে সে অসহায়।

...

তার মুখে দাড়ি থাকার জন্য সে হিন্দুদের দল এড়িয়ে চলে গেল মুসলমানদের দলে। নিজের দাড়ি তো সে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে না। স্রোতের শ্যাওলার মতন তার নিজের বিরুদ্ধে তাকে দৌড়োদৌড়ি করতে হল ওদের সঙ্গে। তার চোখের সামনেই একটা ঘড়ির দোকান লুঠ হলো। যে যা পারলো নিয়ে পালালো, কয়েকজন বিনা কারণে আছড়ে আছড়ে ভাঙতে লাগলো বড় বড় দেয়াল ঘড়িগুলো। বিভিন্ন ঘড়িতে অসময় লেখা আছে।

একটা লোকের পিঠে ছুরি মারা হয়েছে, সে শিরদাঁড়া ভাঙা কুকুরের মতন রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে। তার আততায়ী পাশে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত ছুরি তুলে হাসছে হা-হা আর চেঁচিয়ে বলছে, তিন শালাকো খতম কিয়া।

ওই রক্তাক্ত বিবরণের অন্যত্র :

সূর্য তার পিঠ থেকে দীপ্তির হাতটা সরিয়ে এনে বললো, রাস্তায় একটা দল আমাকে ধরেছিল। তারা আমাকে বিষ্ণুর দশ অবতারের নাম জিজ্ঞেস করলো। আমি বলতে পারিনি। তারপর তারা আমাকে আমাদের সাত পুরুষের নাম বলতে বললো। ...

...তারপর আমি পড়লাম আর একটা দলের হাতে। সেখানে আমি বললাম, আমি মুসলমান। তারা কি একটা বয়েৎ বলে তার পরের লাইনটা বলতে বললো। সেটা আমি কখনো শুনিইনি—তবু আমার মুখে দাড়ি আছে বলে কয়েক ঘা দিয়ে—

—এটা কি ছেলেখেলা? কি শুরু হয়েছে চারদিকে, তুমি খবর রাখো না?

—মানুষ মানুষকে মারছে। আমি যদি মরেও যেতাম, তবু আপনি কি বুঝতে পারতেন আমি আপনার কাছেই আসছিলাম?

সাহিত্যের জয় এখানেই। কেননা, সাহিত্য শেষপর্যন্ত প্রেমের কথা বলে, মিলনের কথা বলে। উপন্যাসের নায়ক সূর্যকে সুনীল দাঙ্গার রক্তাক্ত পথ পার করে তার প্রিয়তম নারী দীপ্তির কাছে পৌঁছে দেন। দীপ্তি তাকে গ্রহণ করে কি না, সূর্যও গুলিবিদ্ধ হয়ে রাতের বাগানে মরে যায় কি না, সে-সব অন্য প্রশ্ন।

দেশ-বিভাগ নিয়ে সমৃদ্ধতর ইতিহাসটি উপন্যাসের আধারে লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দুই খণ্ডে বিধৃত তাঁর *পূর্ব-পশ্চিম* (১৯৮৮/১৯৮৯) উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দুটি পরিবারের কাহিনি এই উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য হলেও এই উপন্যাসের অবলম্বন আসলে অবিভক্ত ও বিভক্ত দুই বাংলা—তার সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা উত্থান-পতন। গত শতকের পাঁচের দশক থেকে আটের দশক পর্যন্ত সুবিস্তৃত এই উপন্যাসের একদিকে জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু,

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রয়াণ, ইন্দিরা গান্ধীর অভ্যুত্থান, অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, নকশালবাড়ি আন্দোলন, অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলনের পরবর্তী সময়, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুব-সমাজের হতাশা, মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ড—এইসব ঘটনাপ্রবাহে বিস্তারিত হয়েছে এই উপন্যাসের আখ্যান। সর্বোপরি, ইউরোপ-আমেরিকার পটভূমিও এই উপন্যাসে এসেছে। বাংলার পূর্ব-পশ্চিম, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম, মানুষের পূর্ব-পশ্চিম এই উপন্যাসে এক গভীরতর ত্রি-মাত্রিক ব্যঞ্জনায় অঙ্কিত হয়েছে।

এই পটভূমিতে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়টিতে সুনীল এক নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক আলো ফেলেছেন। হিন্দু ও মুসলমান চরিত্রগুলি বিস্তারিত হয়েছে এক বিস্তৃত সময়ের প্রভাবে। এসেছে পারস্পরিক প্রেম, ঘৃণা, অনুরাগ, বীতরাগ। বঙ্গভঙ্গের জন্য পশ্চিমবঙ্গে-চলে-আসা মানুষ যেমন পূর্ববঙ্গের মানুষকে দায়ী করেছে, তেমনই পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছেও হিন্দু-প্রতিবেশী একদিন ভার হয়ে উঠেছে। দেশবিভাগের অভিজ্ঞতা যেমন ভোলেনি পশ্চিমবঙ্গে-চলে-আসা হিন্দু-জনসমষ্টি, তেমনই তাঁরাই মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষকে। বাঙালির এই জাতীয় ভাবাবেগ কেবল বাঙালিই বুঝতে পারে, অন্যরা পারে না। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের চিরকালীন সৌহার্দ্যে কাঁটা বিঁধিয়েছেন দুই অবাঙালি হিন্দু ও মুসলমান—গান্ধী ও জিন্না—এই ইতিহাস এখন আর অবিদিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে এই-ই প্রতিপাদ্য করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা এ-ক্ষেত্রে অসংখ্য অনুরূপ পরিস্থিতি থেকে, একটি ঘটনার দু-রকম অভিঘাত দুটি উদ্ধৃতি থেকে বুঝে নেব।

প্রথম খণ্ডের ৬৭-পরিচ্ছেদে বহ্নিশিখা (তুতুল) যখন নিজের প্রেমের কথা জানাচ্ছে দূর প্রবাস থেকে, মাকে, তখন:

> *সুপ্রীতির নাভিমণ্ডল থেকে হাহাকার উঠে এলো। সর্বনাশ হয়েছে! আমি বিষ খাবো। তুতুল মুসলমান বিয়ে করতে চায়।*
>
> *প্রতাপ দ্রুত চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। সুপ্রীতি সত্যিই যেন বিষের জ্বালায় ছটফট করছেন। বেশ কিছুদিন ধরে সুপ্রীতি একেবারে নির্জীব হয়ে গিয়েছিলেন, বাড়িতে তার গলার আওয়াজ শোনাই যেত না। আজ এক প্রচণ্ড আঘাতে যেন তিনি আবার জেগে উঠেছেন। কণ্ঠে ফুটে উঠছে রাগ ও দুঃখের তীব্রতা। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, বিষ দে। ও খোকন, বিষ দে আমাকে। নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ মেয়ে, এত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছি, তোদের কত কষ্ট হয়েছে। এ বাড়িতে কেউ একটু দুধ খায় না, মাছ খায় না, সেই মেয়ে বিলেতে গিয়ে মুসলমান বিয়ে করবে, একথা শোনার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হলো?*
>
> *সুপ্রীতির এতখানি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে প্রতাপ খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন।*

তুতুল ডাক্তারি পাস করে বিদেশে গেছে, সে তো তার নিজস্ব ইচ্ছে অনিচ্ছে অনুসারেই জীবনটা ঠিক করবে। দিদিকে কী করে সান্ত্বনা দেবেন প্রতাপ? চিঠিটা মমতার হাতে দিয়ে তিনি বললেন, দিদি, তুমি মুসলমান বলে এত আপত্তি করছো কেন? তুতুল বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে যাকে পছন্দ করবে, সে নিশ্চয়ই ভালো ছেলেই হবে। সে ছেলে যদি মুসলমানও হয়...

সুপ্রীতি চোটপাট করে বললেন, তার মানে? মুসলমান জামাই আমি মেনে নেবো? কক্ষনো না। ওদের জন্য আমাদের দেশ ছাড়তে হয়নি? আমাদের সর্বস্ব গেছে! দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, কত মানুষকে মেরে ফেলেছে! লক্ষ লক্ষ রিফিউজি এখনো ভিখিরি, সেই রিফিউজিদের হাতে খুন হয়েছে আমার স্বামী, তার জন্যও তো মুসলমানরাই দায়ী! কত লাঞ্ছনা, কত অপমান সহ্য করেছি, সেসব আজ ভুলে যাবো? তুই এত কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছিস, সবই তো ওদেরই জন্য...আমার মেয়ে, সে এ কী করলো খোকন, বংশের মুখে চুনকালি দিল, ওরে, খোকন।

প্রতাপ বললেন, দিদি, আস্তে, আস্তে, পাড়ায় লোকে শুনলে ভাববে আমাদের বাড়িতে বুঝি কেউ...

সুপ্রীতি বললেন, তার থেকে কম কী হয়েছে? ও মেয়ে মরে গেলেও আমি এত কষ্ট পেতাম না রে ওঃ ওঃ, খোকন, আমার বুক ধড়ফড় করছে। এত কষ্ট, নিজের পেটের মেয়ে এত কষ্ট দিতে পারে মাকে...

মমতা বললেন, দিদি, আগেই এত উতলা হচ্ছেন কেন? বিয়ে তো এখনও হয়নি। তুতুল লিখেছে, আলম নামে একটি ছেলেকে তার পছন্দ হয়েছে, ছেলেটি ডাক্তার, খুব ব্রিলিয়ান্ট, ভালো বংশের ছেলে।

—সে মুসলমান!

—হ্যাঁ, আলম নাম যখন, মুসলমান তো হবেই। তবে, বিয়ের তারিখ-টারিখ এখনো কিছু ঠিক হয়নি, তুতুল লিখেছে সে আপনার আশীর্বাদ চায়...

মমতার দিকে কটমট করে তাকিয়ে সুপ্রীতি বললেন, আশীর্বাদ? তাকে লিখে দাও, সে যেন পত্রপাঠ ফিরে আসে। দরকার নেই তার বড় ডাক্তার হওয়ার। ওদেশে ছেলেরা গিয়ে মেম বিয়ে করে, আর আমার মেয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চাইলো...খোকন তুই আরও লিখে দে, সে যদি আসতে না চায়, কোনোদিন সে আর আমার মুখ দেখতে পাবে না...আমার আশীর্বাদ চায়, এত নির্লজ্জ বেহায়া হয়েছে সে! লন্ডন শহরে বিষ পাওয়া যায় না? আমার অভিশাপ, সে বিষ খেয়ে মরুক! মুসলমানের বউ হওয়ার চেয়ে ও মেয়ের মৃত্যুর খবর পেলেও আমি চোখের জল ফেলবো না।

এই প্রসঙ্গটি সুনীল আবার ফিরিয়ে এনেছেন দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩-পরিচ্ছেদে :

—বিয়েটা এখনও হয়নি। তার ফল আরও খারাপ হয়েছে। মেয়ে বিয়েও করে না, দেশেও ফেরে না। কিছুদিন আগে একবার সে কিছু টাকা পাঠিয়েছিল, দিদি রিফিউজ করে দিয়েছেন।

—ঠিক করেছেন। সেইজন্যই কি দিদির সব মুসলমানদের ওপরেই রাগ? দিদির চোখে আমিও কি মুসলমান? তা হতেই পারে না।

—থাক মামুন দিদিকে এখন আর ঘাঁটাবার দরকার নেই। খাওয়ার আগে যদি তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, মঞ্জুরা যদি কিছু শুনে ফেলে—

—দিদি আমাকে দূর দূর ছাই ছাই করলেও আমি কিছু মনে করবো না।

ঘরের দরজা ভেজিয়ে রেখেছিলেন সুপ্রীতি। প্রতাপ ঠেলা দিয়ে সেই দরজা খুললেন, তাঁর মতন মানুষেরও কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। মামুনদের তিনি আজ খাবার নেমন্তন্ন করেছেন, এই সময় দিদি যদি ওদের কোনো রকম অপমান করেন...

প্রতাপ বললেন, দিদি, মামুন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মনে আছে তো মামুনকে?

ঘরটা আবছা অন্ধকার। চৌকির ওপর জোড়াসনে বসে আছেন সুপ্রীতি, সাদা থান পরা, চেহারাটা শীর্ণ শালিকের মতন।

মামুন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই সুপ্রীতি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, থাক থাক ঐখান থেকে কথা বলো! ঐখান থেকে।

মামুন বললেন, দিদি, আপনাকে প্রণাম করবো না?

সুপ্রীতি বললো, না, প্রণামের কী দরকার?

মামুন বললেন, দিদি আপনার মনে আছে, বরানগরে আপনার শ্বশুরবাড়িতে কতদিন গিয়ে আপনার হাতের রান্না খেয়েছি। অসিতদাদা আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

সুপ্রীতি নীরস গলায় বললেন, তোমরা সব সুখে থাকো, ভালো থাকো।

মামুন বললেন, সুখে থাকবো, ভালো থাকবো কী দিদি! আমার বউ আর এক মেয়েকে ওখানে ফেলে আসতে হয়েছে, তাদের জন্য সর্বক্ষণ চিন্তা। আমার সাথে যে-ভাগ্নী এসেছে, তার স্বামী আছে ওখানে, তার কোনো খবর পাই না। আবার কবে দেশে ফিরবো তা জানি না এই অবস্থায় কি ভালো থাকা যায়? আমার মেয়েকে আপনি দেখবেন না? প্রতাপ, হেনা আর মঞ্জুকে একটু ডাকো।

সুপ্রীতি বললেন, থাক থাক এখন ডাকার দরকার নেই। বললাম তো, তোমরা সুখে থাকো, বেঁচে বর্তে থাকো, আমার আর ক'দিন! আমি আছি বা নেই, তাতেই বা কি আসে যায়।

—আপনে এরকম ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবেন? বাইরে আসেন দিদি।

—আমি এখন ঘুমোবো।

প্রতাপ মামুনের হাত ধরে টানলেন। আর দরকার নেই, দিদি যে রাগারাগি করেননি, সেটাই যথেষ্ট! মামুনকে তিনি বাইরে নিয়ে এলেন।

এ বাড়িতে কোনো খাওয়ার ঘর নেই। মঞ্জু-হেনাদের খেতে দেওয়া হয়েছে মুন্নির ঘরে। তাদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রতাপ বললেন, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, মমো আমাদের এই বারান্দাতেই জায়গা করে দাও!

পুরোনো আমলের দুটি পশমের আসন পেতে দেওয়া হলো। আজ তিনি কাঁসার থালা ও গেলাসও বার করেছেন। বারান্দায় জল ছিটিয়ে থালা পাতলেন মমতা। প্রথমে বাটিতে করে মাছ তরকারি সাজিয়ে দিলেন।

আসনে বসে পড়ে মামুন বললেন, পাগলের কাণ্ড, এর কোনো মানে হয়!

তিনরকম মাছ রান্না করা হয়েছে, সেই সঙ্গে মুরগীর মাংস। মোচার তরকারি, দু'রকম ডাল, পটল ভাজা, আলু ভাজা। কলকাতায় মাছের কী আগুন দাম তা মামুন জানেন, বড় চিংড়ি মাছ তো ছোঁয়াই যায় না। প্রতাপ গাদা খানেক টাকা খরচ করেছেন আজ।

মমতা ভাত বেড়ে দিতে এলে মামুন হাত তুলে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, বৌঠান, আপনার হাতের রান্না এরপরেও বহুদিন খেতে হবে। আপনি নেমন্তন্ন না করলেও আসবো। কিন্তু আজ দিদি নিজের হাতে পরিবেশন না করলে আমি খাবো না।

প্রতাপ অনুরোধের চোখে মামুনের দিকে তাকালেন। কেন মামুন সব কিছু কঠিন করে তুলছেন আজ!

তারপর প্রতাপের দিকে ফিরে তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, সত্যিই আমি খাবো না।

প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মমো, তুমি ডেকে বলবে দিদিকে?

মুন্নি বেরিয়ে এসেছে এর মধ্যে। সে বললো, আমি ডাকছি।

ঘরের দরজা খুলেই সে চেঁচিয়ে বললো, ওমা, পিসিমা আবার ফিট হয়ে গেছেন!

মামুন আর প্রতাপ একসঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে এলেন। খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়েছেন সুপ্রীতি, দু'দিকে ছড়ানো হাতদুটো মুঠো করা, পা দুটো ছটফট করছে, মুখ দিয়ে তিনি ই-ই-ই করে একটা শব্দ করছেন।

প্রতাপ বিচলিত হলেন না, তিনি বললেন, মুন্নি স্মেলিং সল্ট নিয়ে আয়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এই টানাপোড়েন সুনীল আবারও উপন্যাসের বিষয় করেছেন, পরবর্তী সময়ে লিখেছেন *ধূলিবসন* (১৯৯০)। ব্রিটিশ-সাংসদের বাঙালি-স্ত্রী

মন্দিরা লণ্ডনের দীর্ঘকালীন অভিজাত জীবনের শিকল ছিঁড়ে নিজের শিকড় খুঁজতে ফিরে এল স্বদেশে। ঘটনাচক্রে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি গরিব গ্রাম ও তার মানুষজনের সঙ্গে জড়াল নিজেকে। মুক্তমনা মন্দিরা লক্ষ করেছে *'এখানকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মোটামুটি একটা সদ্ভাব আছে... তবু কোথাও যেন একটা বিভেদের রেখাও আছে।'* ধর্ম নিয়ে তার মাথাব্যথা না-থাকলেও গ্রামের মানুষদের জীবন বিষয়ে সে অনাগ্রহী নয়। সুতরাং মানুষ ও প্রকৃতির পক্ষে ক্ষতিকর সার-কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হয় তাকে। ঘটনা-পরম্পরায় হঠাৎই এক রাতে ধর্ষিত হয় সে। ঘটনার অন্তর্নিহিত অপমানটাই দগ্ধ করে মন্দিরাকে। তার মনে হয়, *'সাতাশ বছর বাদে আবার এ-দেশের মাটিতে জীবনরস আশা করাই অন্যায় হয়েছিল।'*

শেষপর্যন্ত মন্দিরা জেনে যায়, চরম আক্রোশে-ঘৃণায় তাকে খুন করতেই চেয়েছিল তার ধর্ষক জাভেদ। মুসলমান বলে মন্দিরা তার হাতের জল খায়নি, পুলিশ তাকে মারছে দেখেও বাধা দেয়নি, জিপে উঠে চলে গিয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। মন্দিরা আসলে তাদের কেউ নয়—হিন্দু-প্রতিনিধি মাত্র। এই আক্রোশ ছিল জাভেদের মনে।

এরপর সুনীল লেখেন :

—জাভেদ কোথায়?

—বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি এক জায়গায় আটকে রেখেছি। মোছলমান ছেলেদের এখনো অনেকে আমাকে মানে। ওর পাপের কথা যদি আমি সবাইকে জানিয়ে দিই, ওর দলের লোকরাই ওকে শাস্তি দেবে। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে। আপনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, আপনি দেবীর মতন। ওঃ ওঃ, ভাবলেই আমার বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। দিদি, আপনি আমাকেও শাস্তি দিন! জাভেদের পাপ আমারও পাপ! চলুন যাই, এস ডি ও, ডি এম সবাই রয়েছেন আজ সুখচরে, তাঁদের কাছে সব কথা খুলে বলি।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে মন্দিরা জিজ্ঞেস করলো, আপনার কাছে সিগারেট আছে?

সাজ্জাদ অবাক হয়ে মন্দিরার দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক। সে মন্দিরাকে কখনো সিগারেট খেতে দেখেনি। আস্তে আস্তে সে পকেট থেকে বার করে দিল তার প্যাকেট ও দেশলাই।

এর মধ্যে বেশ কয়েকদিন সত্যিই সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিল মন্দিরা। কিন্তু এখন আর সে পারছে না। লোভীর মতন দ্রুত একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘনঘন দুটো তিনটে টান দিলো। তার শরীর কাঁপছে। জাভেদের নামটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে সে দিশেহারা হয়ে গেছে। সে জাভেদের কোনো ক্ষতি করেনি, হিন্দুদের প্রতিনিধিও সে হতে পারে না, কারণ গ্রামে বসেও সে কখনো কোনোরকম ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করেনি, তবু জাভেদ তার ওপরই যাবতীয়

আক্রোশ ফলাতে এসেছিল?

সাজ্জাদ বললো, বাস চলে গেল, চলুন, আপনি মিটিং-এ গিয়ে ডি এম সাহেবকে বলুন, আমি জাভেদকে নিজে পুলিশের হাতে তুলে দেবো।

মন্দির বললো, সত্যিই জাভেদ?

—হ্যাঁ, সে নিজের মুখ স্বীকার করেছে। সে বলছে, ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

—আমি জাভেদকে একবার দেখতে চাই।

—আপনি নিজের হাতে তাকে শাস্তি দেবেন? সে হারামজাদাটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে আপনার পায়ের সামনে ফেলে দেবো!

—আমি জাভেদকে একবার দেখতে চাই। সেখানে আর কেউ থাকবে না।

সাজ্জাদ মন্দিরার দিকে বিপর্যস্ত ভাবে তাকিয়ে রইলো। যেন মন্দিরার হাতে সে কোনো সাঙঘাতিক অস্ত্র দেখতে পাচ্ছে। এই রমণী যেন হিন্দুদের দেবী দুর্গার মতন, যিনি এখন অসুর দমন করবেন।

সে ফিসফিস করে বললো, আপনি যাবেন? আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, কেউ আপনার আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আপনি জাভেদকে যেমন খুশি শাস্তি দেবেন।

মন্দিরা বললো, আমি আজকের রাতটা থেকে যাবো। অন্য রাস্তা দিয়ে চলুন, মিটিং-এর কেউ যেন আমাদের দেখতে না পায়!

মন্দিরার সুটকেসটা তুলে নিয়ে, ধানখেতের মধ্য দিয়ে আলপথ ধরে ধরে এগিয়ে চললো সাজ্জাদ। এক হাতে সাইকেলটা নিতে তার খুব অসুবিধা হচ্ছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলতে লাগলো, এই ধর্মান্ধতার দেশে মাইনরিটি হয়ে থাকার যে কী কষ্ট, ওপার বাংলায় হিন্দুদের কষ্ট, এদিকে আমাদের কষ্ট...অনেকে ভাবে ওপারের তুলনায় আমরা ভালো আছি, কোনোরকমে খেয়ে পরে আছি ঠিকই, কিন্তু যখন-তখন লোকে অপমান করে।

মন্দিরা এসব কিছুই শুনছে না। ধানখেতে মেঠো ইঁদুর ধরতে সাপ আসে, এই বর্ষায় সব সাপ বেরিয়ে পড়ে গর্ত থেকে, মন্দিরার এখন যেন সাপের ভয়ও নেই। কাদার মধ্যে তার পা পড়ছে, সে সেদিকেও তাকাচ্ছে না।

কানাইবেকির খালের ধার দিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে সাজ্জাদ একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়ালো। মাছ পাহারা দেবার জন্য জলার ধারে এরকম ঘর বাঁধা থাকে। দরজার তালা খুলে জাভেদকে বাইরে নিয়ে এলো সাজ্জাদ। আরও দু'জন লোক সেই ঘরের পেছন দিকটায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল, তারাও এসে দাঁড়ালো পাশে।

মন্দিরাকে দেখেই জাভেদ দড়াম করে পড়ে গেল তার পায়ের কাছে। পাগলের মতন মুখ ঘষতে লাগলো মাটিতে।

মন্দিরা সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে বললো, ওকে উঠতে বলুন।

সাজ্জাদ সঙ্গে সঙ্গে চুলের মুঠি ধরে জাভেদকে টেনে তুলে দুটো চড় কষালো তার গালে। দাঁত কিড়মিড় করে বললো, কার সর্বনাশ করেছিস একবার দ্যাখ ভালো করে। হারামজাদা, নিমকহারাম!

জাভেদ মন্দিরার দিকে তাকাতে পারলো না। দু'হাতে চাপা দিল মুখ।

অন্য লোকেদের মধ্যে একজন একটা ছুরি বার করে বললো, এ শালাকে কাটবো? এটার জন্য আমাদের সর্বনাশ হবে! হিন্দুপাড়ায় যদি সবাই জেনে যায়, আমাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে। পুলিশ এসে যাকে ইচ্ছে খুন করবে।

মন্দিরা এদিক ওদিক তাকালো। আজ বৃষ্টি নেই। সামান্য আবছা আলো আছে আকাশে। খালের সামনের দিকটা ধূ-ধূ করছে। এদিকে আর জনবসতি নেই।

সে বললো, আমি জাভেদের সঙ্গে একলা কথা বলতে চাই। এইদিকে যাবো? কেউ আমাদের পিছু পিছু আসবে না। যতক্ষণ না ফিরে আসি, কেউ খোঁজ করতেও যাবে না।

সাজ্জাদ বললো, শুধু আমি একা সঙ্গে যাই?

মন্দিরা বললো, না। আর কেউ না।

সাজ্জাদ অন্যদের দিকে তাকালো। ছুরি-হাতে ব্যক্তিটি জাভেদকে একটা ঠ্যালা দিয়ে বললো, এই দিদির সঙ্গে যাবি। দিদি যা বলেন সব শুনবি। যা শাস্তি দেয় মাথা পেতে নিবি। যদি জান দিতে হয় তাও দিবি। যদি অন্যরকম কিছু করিস, তুই কিছুতেই প্রাণে বাঁচবি না। এক্ষুনি গিয়ে তোর বাপকে জামিন রাখবো। তুই পালাবার চেষ্টা করলেই আগে তার গলা কাটবো!

মন্দিরা বললো, তুমি আমাকে বোঝনি, আমিও তোমাকে বুঝতে পারিনি। তোমার রাগ তোমাকে পুরোপুরি ঢেকে রেখেছিল। তবু তুমি আমাকে টেনে রেখেছিলে. যদি সে রাত্রে কিছু নাও ঘটতো, আমি এখান থেকে এমনিই চলে যেতাম তাহলেও সারাজীবন মনে রাখতাম তোমাকে। তোমার রাগটা আসলে অভিমান। এত বড় একজন পুরুষ মানুষের এমন অভিমান তো আমি আগে কখনো দেখিনি!

হঠাৎ কান্নার মাঝখানে হেসে উঠলো মন্দিরা। কিশোরীর কৌতুকের সুরে বললো, আমার অনেক বয়েস হয়েছে, কিন্তু এখনো আমি বুড়ি হয়ে যাইনি।

জাভেদের একটা হাত তুলে নিয়ে মন্দিরা নিজের গলায় ছোঁয়ালো। তারপর বুকের ওপর রাখতে যেতেই জাভেদ চমকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। মন্দিরা তবু সেই হাত শক্ত করে নিজের বুকে চেপে রেখে বললো, হ্যাঁ সেই স্পর্শ। ঠিক চিনেছি।

জাভেদের ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে সে বললো, আমার দিকে ভালো করে তাকাও

জাভেদ। তুমি কী চেয়েছিলে আমার কাছে?

আঁচল ফেলে দিয়ে বুকের জামাটাও খুলে ফেললো মন্দিরা।

বাঁ দিকের স্তনে জাভেদের হাতটা ছুঁইয়ে বললো, এখানটায় কামড়ে দিয়ে তুমি কি কিছু আনন্দ পেয়েছিলে? না শুধু রাগ মিটিয়েছিলে। এখানে খুব নরম করে হাত দিতে হয়, কিংবা শিশুর মতন মুখ রাখতে হয়, তাতে দুজনেরই ভালো লাগে।

জাভেদ এবার মন্দিরার দিকে স্পষ্টভাবে তাকালো। জ্বলে উঠেছে তার বিহ্বল দুটি চোখ।

মন্দিরা বললো, আমাকে জড়িয়ে ধরো জাভেদ। তোমার বুকে রাখো। আমি যে খুব চাই। আমি ভালোবাসতে চাই।

শাড়িটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো মন্দিরা। জাভেদকে নিয়ে এলো পাশে। এক হাতে জাভেদের মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সে নিজের মুখটা কাছে আনলো। জাভেদকে সে চুম্বন দিল অনেকক্ষণ ধরে।

বিয়ের পর টম বলেছিল, ইন্ডিয়ান মেয়েদের একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার আছে। ইন্ডিয়াতে কামশাস্ত্র লেখা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই ইন্ডিয়াতেই অনেক বইতে পড়ি, মেয়েরা যৌন ব্যাপারে কোনো অংশই নেয় না। তাবা চুপ করে শুয়ে থাকে, পুরুষরা যা করবার করে। যেন সব দায়িত্বটাই পুরুষদের। এটা কি ব্যাপার, মনি? দুজনে সমানভাবে অংশ না নিলে কি পুরোপুরি আনন্দ পাওয়া যায়? এত লজ্জা কিসের? নিজে থেকে চুমু খেতে জানো না? নিজেই প্রথম আদর শুরু করতে পারো না? শেখো, মনি শেখো!

মন্দিরা অনেক কিছুই শিখেছিল। এখন সে জাভেদকে সেই কামকলায় দীক্ষা দিতে লাগলো।

মন্দিরার এখন জাত-ধর্ম নেই, সে কারুর মা কিংবা স্ত্রী নয়, সে কোনো কিছুর প্রতিবাদও নয়, সে সম্পূর্ণ নগ্ন ও লজ্জাহীনা এক উন্মুখ রমণী।

শেষপর্যন্ত অন্ধকারে আশ্লিষ্ট হয় দু-জনে পরম আবেগে, ভালবাসায়, ক্ষমায়, সৌন্দর্যে—শ্রেণিহীন, ধর্মহীন, এক আকুল বন্ধনে। মন্দিরার তখন জাত নেই, ধর্ম নেই, সে কাবও মা কিংবা স্ত্রী নয়, সে কোনও প্রতিবাদও নয়, সে সম্পূর্ণ নিরাভরণ, লজ্জাহীনা এক উন্মুখ রমণী—যে তার দংশিত, মথিত স্তনে স্বেচ্ছায় স্থাপন করে জাভেদের হাত।

বাস্তবতার প্রশ্ন না-তুলে একটি রূপক কাহিনি-রূপে আমরা যদি *ধূলিবসন*-কে গ্রহণ করি, তাহলে সেখানে দুই আপাত-বিরূপ সম্প্রদায়ের মিলন-উন্মুখতা আমাদের প্রভাবিত করেই।

প্রফুল্ল রায়ের (১৯৩৪) *কেয়াপাতার নৌকো* (১৯৬৯-৭০) এই সময়ের আরেকটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত আবেগ আর ব্যথা-বেদনার চিত্র আঁকা হয়েছে এক অভূতপূর্ব মানবিক রং-তুলিতে। 'আল্লা হো আকবর' আর 'কালী

মাঈকী জয়' ধ্বনি এই উপন্যাসে সম্মিলিত সুরমূর্ছনা তৈরি করেছে প্রায়শই। প্রফুল্ল রায় লিখেছেন :

মোতাহার সাহেব গভীর গলায় বলেন, 'একটা কথাই জানি। তা হল, রাজদিয়ার হেমনাথ মিত্রের কাছে কোনও শুভ কাজের আর্জি নিয়ে গেলে কেউ কখনও বিমুখ হয়ে ফেরে না।'

হেমনাথ বললেন, 'আমাকে তোরা কল্পতরু পেয়েছিস নাকি?'

'পেয়েছিই তো।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে মোতাহার সাহেব বললেন, 'কী?'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'স্কুল বিল্ডিং করে দেবার মতো অত টাকা তো আমার নেই। অবশ্য একটা কাজ করা যেতে পারে—'

'কী কাজ?'

'সবার কাছ থেকে টাকা তোলা। যার যেমন সাধ্য সে তেমন দেবে। মোট কথা, একটা ফান্ড খোলা দরকার।'

'সে আপনি যা ভাল বোঝেন—'

'তুই কবে আমার বাড়ি যাচ্ছিস?'

'কবে যেতে বলেন?'

'যেমন তোর খুশি—'

'পরশু সকালে যাব।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরবতা।

তারপর মোতাহার সাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, 'যাক, আমার দুর্ভাবনা কাটল। স্কুলবাড়ি এবার হয়ে যাবেই।'

হেমনাথ হাসলেন, 'স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমার ভালই লাভ হল দেখছি। তারপর তোর কংগ্রেসের খবর কী?'

নিমেষে হাসি থেমে গেল। কপালে অসংখ্য রেখা ফুটল মোতাহার সাহেবের। গম্ভীর গলায় বললেন, 'খুবই সাঙ্ঘাতিক। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে ছোটবড় সব নেতাই অ্যারেস্টেড। সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেছে।'

'দেখেছি। তোর কী মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয়, ভেতরে ভেতরে ইংরেজরা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভেতরে যত কাবু হচ্ছে, বাইরে অত্যাচার ততই বেড়ে চলেছে।'

'তুই তো এখানকার কংগ্রেসের সেক্রেটারি। তোকে কি অ্যারেস্ট করবে?'

'বুঝতে পারছি না। তবে—'

'কী?'

'গেল সপ্তাহে দু'তিন বার পুলিশ এসেছিল।'

হেমনাথ বললেন, 'এখানে কি সত্যাগ্রহ শুরু করবি?'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'এখনও কিছু ঠিক করিনি। আরও কয়েকদিন দেখি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমনাথ এবার শুধোলেন, 'যুদ্ধের হালচাল কেমন বুঝছিস মোতাহার?'

'খুব খারাপ। মিত্রশক্তি চারদিকেই মার খাচ্ছে। ইউরোপ আফ্রিকার কথা থাক, ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের অবস্থাও ভাল নয়। আমার ধারণা, কলকাতায় যে কোনও দিন বোমা পড়তে পারে। কলকাতায় বোমা পড়া মানে সারা বাংলাদেশ তোলপাড় হওয়া। কী যে হবে!'

'সেদিন কাগজে পড়লাম, কলকাতায় ব্ল্যাক-আউটের মহড়া চলছে। এয়ার-রেডের সবরকম প্রিকশানও নেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মোতাহার সাহেব।

হেমনাথ বললেন, 'তোর কী ধারণা, এ যুদ্ধে ইংরেজরা হারবে?'

'বলা মুশকিল। হারুক জিতুক, আমি একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।'

'কী?'

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা খুব বেশি দূরে নেই।'

'হঠাৎ তোর এ ধারণা হল?'

মোতাহার সাহেব থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'হিটলারের বোমা খেয়ে খেয়ে ইংল্যান্ডের আর কিছু নেই। যতই ওরা গলা ফাটাক 'আমাদের কিচ্ছু হয়নি', লোক তা বিশ্বাস করে না। আমরা তো আর ঘাস খাই না, আসল ব্যাপারখানা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি। যুদ্ধ থেমে গেলে ইংল্যান্ডে রিকনস্ট্রাকশনের প্রশ্ন দেখা দেবে। তখন নতুন করে পোড়া ঘর তুলবে, না এতদূরে ইন্ডিয়ার কলোনি সামলাবে? অবশ্য—'

'কী?'

'এই হচ্ছে সব চাইতে বড় সুযোগ। আমাদের তো হাতছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়। একবার যদি এ সুযোগ আমাদের হাতের বাইরে চলে যেতে দিই, পরে আপসোস করেও কূলকিনারা পাব না।'

হেমনাথ বললেন, 'সুযোগ বলতে?'

মোতাহার সাহেব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন ইংরেজ এখন যুদ্ধ নিয়ে অস্থির হয়ে আছে। ইউরোপে-এশিয়ায়-আফ্রিকায়, যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু বারুদের

গন্ধ। এ সময় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যদি একটা আন্দোলন করা যেত।

হেমনাথ বললেন, 'তোর কি ধারণা, শিগগিরিই কোনও মুভমেন্ট শুরু হবে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। এ সময় যদি মুভমেন্ট না করা যায় তবে আর কবে হবে? দেখা যাক, নেতারা কী করতে বলেন—'

এই বিস্তারিত অংশে আমরা একদিকে যেমন লক্ষ করি মোতাহার-হেমনাথের সম্প্রদায়ভেদহীন সহৃদয় সম্পর্কের উষ্ণতা, তেমনই এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমকালীন রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত আত্মনিয়োগের একাত্মতা।

বঙ্গবিভাগ বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি অভিশাপের মতো নেমে এসেছিল। বাংলা কথাসাহিত্যে স্বভাবতই তার ছাপ পড়েছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩৫) *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (১৯৭১-৭২) সে-রকমই একটি উপন্যাস। এই অনুপম উপন্যাসে লেখক অবিভক্ত বাংলার সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ যে-চিত্র, এঁকেছেন, তা সর্বতোভাবে অনুপম। সম্মিলিত জীবনের প্রাণময় ছবি উপন্যাসটিকে ধ্রুপদী স্তরে নিয়ে যায়। ধনকত্তার ছেলে হওয়ার সংবাদে ঈশম শেখের আনন্দ-গভীরতার তল খুঁজতে গিয়ে নির্জন পাঠক ও সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের যে-দীর্ঘশ্বাসমোচন, পাগল বড়কর্তাকে ফেলে রেখে দেশ ছেড়ে চলে আসার যে-কারুণ্য, হিন্দু-মুসলমান জীবনের আত্মিক টানাপোড়েনের যে-উন্মোচন ঘটেছে এই উপন্যাসে এক মায়াময় ভাষায়, তা জটিল ও কূট রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে। স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকে স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে এই এপিক উপন্যাসটি। আমরা পড়ি :

ফকিরসাব আর নৌকো বাইতে পারেন না। ফকিরসাব ক্রমে লবেজান হয়ে যাচ্ছেন। ফকিরসাব একটা কোড়া পাখি ধরার জন্য বিলের জলে আঁতর পেতে রেখেছিলেন। কোড়া পাখির কলিজা খেলে গায়ে বল ফিরে আসতে পারে। ফিরে এলেই জোটন বাপের ভিটাতে বেড়াতে যাবে ভাবতেই মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। আর মন প্রসন্ন হতেই দেখল, দুটো সাদা পা যেন। হোগলার জঙ্গলে দুটো সাদা পা, কী সুন্দর আর যেন দুর্গাঠাকুরের পা। ওর বুকটা কেঁপে উঠল। পায়ের ওপর সূর্যের আলো চিকচিক করছে। একটা ফড়িং কোত্থেকে উড়ে এসে বার বার পায়ের ওপর বসছে। ওপরে গাছপাতা নড়লে ছায়া পড়ছে পায়ে। ফড়িংটা ভয় পেয়ে তখন উড়ে যাচ্ছে। এই রোদ এবং পাতার ছায়াতে মনে হচ্ছিল, পায়ে মল বাজলে যেমন শব্দ দ্রুত বনের ভিতর হারিয়ে যায়, তেমনি এক শব্দ বুকের ভিতর বাজতে বাজতে কোন অতলে ডুবে যাচ্ছে জোটনের। জোটন দেখল পা-দুটো এখন যথার্থই দুর্গাঠাকুরের হয়ে গেছে। সেই যেন গৌরী, শিবের জন্য বনবাসে এসে হোগলা বনে লুকিয়ে আছে। অথবা চৈত্র মাসে নীল উপোসে গৌরী নাচে, নাচের মুদ্রা পায়ে যেন খেলে বেড়াচ্ছিল। জোটন বড় বড় চোখে এ-সব দেখছে, এখন কী করবে স্থির করতে পারছে না। সে সামনে এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে

না। এক যুবতী কন্যার পা দেখা যাচ্ছে। শুধু পা-দুটো বাকি শরীর হোগলার জঙ্গলে। খুনটুন হবে হয়তো। কিন্তু এই দরগায়, পীরের থানে কার সাহস আছে খুন করে। জোটন কাঁপতে কাঁপতে দু'হাতে হোগলার বন ফাঁক করে দিতেই দেখল, নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিলে, দশ-হাত দুগ্‌গাঠাকুর যেমন চিৎ হয়ে থাকে, তেমনি মালতী হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। যেন অসুরনাশিনী মা জননী তুই অ-মালতী, তুই চিৎপাত হইয়া পইড়া আছস। চুল খাড়া কইরা চোখ ঊর্ধ্বমুখী কইরা পইড়া আছস। তরে নিয়া আইছে কে। সে প্রায় মায়ের মতো শিয়রে বসে মাথাটা কোলে তুলে নিল। বুকে মুখে এবং শরীরের যেখানে যা-কিছু পুষ্ট সব হাতড়ে দেখল, না প্রাণ আছে। শুধু হুঁশ নেই। নাভির নিচটা কারা সারারাত খাবলে খুবলে খেয়ে গেছে। মৃতপ্রায় ভেবে মালতীকে কারা ফেলে চলে গেছে। শরীরের কোথাও কোথাও দাঁতের চিহ্ন। রক্তের দাগ, সে আর দাঁড়াল না। যেন এক অন্ধ ছুটে যায়, বনের ভিতর দিয়ে জোটন ছুটতে থাকল। আর ডাকতে থাকল, ফকিরসাব, অ ফকিরসাব, দ্যাখেন আইসা পীরের থানে কি হইছে। তাড়াতাড়ি করেন ফকিরসাব। হোগলা বনে কারা দুগ্‌গাঠাকুর বিসর্জন দিয়া গ্যাছে।

যেমন দু'লাফে সে ছুটে এসেছিল ফকিরসাবকে খবর দিতে, তেমনি দু'লাফে সে তার ছইয়ের ভিতর থেকে একটা ডুরে শাড়ি বের করে বলল, আপনে আমার পিছনে আসেন।

জোটন একটু দূরে দাঁড়িয়ে, ফকিরসাবকে বলল, কি দ্যাখা যায়?

—দুই পা দ্যাখা যায়।

—কার পায়ের মত।

—দুগ্‌গাঠাকুরের পা য্যান!

মুসলমান জোটনের চোখে এই দুর্গা-প্রতিমার রূপকল্প-বর্ণনায় অতীন আসলে স্পষ্ট করেন অবিভক্ত বাংলার মানসিক মৈত্রী-চিত্রটিই।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাসটি সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছেন :

...অতীনের এই রচনা এ যাবৎকালের নজিরের বাইরে। কারণ, তাঁর ঈশম, ফেলু শেখ, আবেদালি, জোটনরা কোন হিন্দুর চোখে দেখা মুসলমান চরিত্র নয়। জোটন, ফকিরসাহেবের ডিটেলস কিংবা জালালির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা—তার পটভূমির মুসলিম মিথ সমেত জীবনেরই সেই মহিমাকে স্পষ্ট করেছে, যা আমরা একদা গ্রীক ট্র্যাজিডিগুলিতে প্রত্যক্ষ করেছি—যা সম্পূর্ণ মানবিক এবং মানবিক বলেই শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি।

যে-ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে আমরা, হিন্দুত্বের অহংকারে, অবশেষে ভেঙে ফেলি বাবরি মুসজিদ, মুম্বই-গুজরাতে আগুন জ্বালাই, ধর্ষণ করি, হাতে রক্ত মাখি, সেই বীভৎসতার শ্বাসরুদ্ধ বিবরণ লেখেন দেবেশ রায় (১৯৩৬) তাঁর *দাঙ্গার প্রতিবেদন*

(১৯৯৪) উপন্যাসে। টানা একটিই অনুচ্ছেদ-পরিচ্ছেদে-বিধৃত ১০৮-পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি যেন একটি সুবিস্তৃত প্রতিবিম্ব, যেখানে, নিশ্ছিদ্রভাবে, ফুটে ওঠে সময়ের প্রতিরূপ—আমরা যার সামনে দাঁড়ালে বিবশ, বিধ্বস্ত, বিভ্রস্ত, বিবমিষ হয়ে পড়ি :

> *আন্তর্জাতিক সময়রেখা অতিক্রম করে আজ ছয়ই ডিসেম্বর বেলা এগারটা-বারটার ছবি ছুটে যায় পাঁচই ডিসেম্বরের দিকে, ছুটে যায় সাতই ডিসেম্বরের দিকে, গতকাল আজ ও আগামীকাল জুড়ে টিভির পর্দায় বারবার এই শুরু হয় আকাশজোড়া তিন গম্বুজ দিয়ে আর শেষ হয় গম্বুজহীন আকাশের শূন্যতা দিয়ে। টিভির পর্দায় গেরুয়া ঝাণ্ডায় মানুষের মুখ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। 'জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম।' ভিড়টার মধ্যে লোকগুলোকে আলাদা করে করে ক্লোজ-আপে দেখায়। পুলিশবাহিনী নড়ছে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—হাতে বন্দুক-লাঠি-ঢাল। একটা বাড়ির মাথায় আদবানি, যোশী, অশোক সিংঘল, আরও অনেকের ভিড়। দুটো মেয়ে গেরুয়া পরা। ঘরের ভিতর থেকে কে বলে দিল, 'সাধ্বী ঋতম্ভরা, উমা ভারতী।' 'ঋতম্ভরা ত পরে নাচবে।' এক-একটা বাড়ির মাথায় মানুষের অনড় ভিড় আর তলা দিয়ে ছুটন্ত মানুষের ভিড়। করসেবকদের নেড়া মাথা, খালি গা, লাল ফতুয়া, লাল ধুতি, শাদা ধুতিও ধুলোয় লালচে, প্যান্ট আর গোলগলা গেঞ্জি, শুধু নেংটি, খালি গা নেড়া মাথা। মনে হচ্ছে, এরা সামনে কোথাও ঝাঁপাতে যাচ্ছে। একজন পিঠ পেতে দাঁড়াচ্ছে, তার পিঠের ওপর পা দিয়ে আর একজন বাঁশের বেড়া টপকে যাচ্ছে। বাঁশের বেড়ার পরে লোহার বেড়া। লোহার বেড়ার গায়ে মানুষ সেঁটে যাচ্ছে। ঢেউ যেমন এক সারির পর আর এক সারি আসে, তেমনি সারি দিয়ে লোক লোহার বেড়া টপকে যাচ্ছে। বাঁ দিকের গম্বুজের ওপর একটি ছেলে উঠে পড়ে, সে গম্বুজের পাশের চাতালে একটু দাঁড়ায়। নীচে মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে একবার হাত নাড়ায়। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে গম্বুজের ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠে। গম্বুজের মাথায় একটি লোহার ডাণ্ডা পোঁতা ছিল সেটা ধরে ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে। আরও কিছু লোক তলা থেকে মসজিদের দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। একজন দেয়ালে হাত দিয়ে রেখেছে, আর একজন সেই হাতে ভর দিয়ে ওপরে উঠছে। দেয়ালে বাঁশ লাগিয়ে বাঁশ বেয়ে মসজিদের ওপরে উঠছে। মসজিদের গম্বুজ মানুষের মাথা। তারপর বড় বড় হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে চারিদিকের দেয়ালে। হাতুড়ির আঘাত, লোহার রডের আঘাত, লাঠির আঘাত। সে আঘাতে করসেবকরা নিজেরাই দু-একজন আহত হয়। আহত হতে হতেই লাইন ঠিক হয়ে যায়। হাতুড়ি আর শাবলের আর গাঁইতির আঘাতে আঘাতে চুন-বালি-সুরকির আস্তরণ খসে খসে পড়ে। ধুলোয় ধুলোয় মসজিদ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই ধুলোর জমাট আস্তরণ বাতাসে ভেসে ছড়াতে থাকে। এখন আর পুরো জায়গাটার ভিতরের ভাগগুলো আলাদা করে বোঝা যায় না—সমস্ত জায়গাটা কেমন ছোট হয়ে গিয়েছে। মনে হয়, মসজিদটা*

মাঝখানে আর তাকে ঘিরে মানুষ। আসলে ত মসজিদটা একদিকে। মসজিদের ছবির একদিকে। অথচ আসল মসজিদের চারদিকে, পেছনেও করসেবকদের ভিড়। হঠাৎ 'জয় শ্রীরাম' আওয়াজ ওঠে আর বাঁদিকের গম্বুজটা ভেঙে মাটি ধসে পড়ে। গম্বুজের ওপর থেকে বেশ কিছু করসেবক নীচে পড়ে যায়। ঘরের ভিতর থেকে কেউ চাপা স্বরে জানিয়ে দেয়, 'ওরা মারা যায়নি, ওদের চুন-সুরকির তলা থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।' 'দেখাল না ত!' 'নিউজে বলেছে, হাসপাতালে নিয়ে গেছে।' বাঁ দিকের গম্বুজটা ভেঙে পড়ায় যে ক্ষত তৈরি হয় তা টিভিতে বোঝা যায় না। পর্দায় শুধু দেখা যায়, মসজিদটা শূন্য হয়ে গেল, তিন গম্বুজের সুসম মসজিদের একটা ভাঙা অংশ। এখনও দিগন্তে মসজিদের দুটো গম্বুজ জেগে আছে। মসজিদের ডান দিকে গম্বুজে এবার ঘা পড়তে থাকে। আঘাত প্রথম থেকে পড়ছিল। ডানদিকের গম্বুজই প্রথমে ভেঙে পড়তে পারত। এখন বাঁদিকের গম্বুজ যারা ভাঙছিল, তারাও এসে যোগ দেয়। এ এক কৃতসঙ্কল্প ভিড়, এ মসজিদের প্রতিটি ইট এই জনতা মসজিদের গা থেকে খুলে নেবে। এর পাল্টা কোনও সংকল্প নেই। কোনও সমাবেশ নেই। দশ মিনিট পেরয় কি পেরয় না, ক্যামেরা একবার নানা ছাদে মানুষের ভিড়ে ঘুরে আসে কি আসে না, ক্যামেরা একবার অলিগলি ফুঁড়ে ঘোরে কি ঘোরে না, ডানদিকের গম্বুজটা ভেঙে পড়ে। আর হঠাৎ মসজিদটা একটা ধ্বংসের সম্পূর্ণতা পেয়ে যায়। এক গম্বুজওয়ালা এক মসজিদ দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকে। এই একটা গম্বুজের সম্পূর্ণতা খানিকক্ষণ পর্দা জুড়ে থাকে। 'এইটা ভাঙতে একটু সময় লেগেছে।' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন জবাব দেয়, 'আরে মূর্তিটা সরিয়ে নিতে টাইম লেগেছে।' 'দেখিয়েছে?' 'নিউজে বলেছে।' বিবিসি টিভির ছবির একদল প্রত্যক্ষদর্শী ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। তারা মন্তব্য দিয়ে ফাঁকগুলো ভরে দিতে পারছে দ্বিতীয়বার দেখা ফিল্মের মত। ক্যামেরা আবার ঘুরে এসে আবার পাঁচশ বছরের দিগন্তের অবশেষের ওপর তাকায়, দুদিকের গম্বুজ ধ্বসে যাওয়ার পর মাঝের গম্বুজটার শেষ সম্পূর্ণতার ওপর। তখন তার দুদিকের দেয়ালের ওপর সমবেত আঘাত পড়ছে। এবার যেন লোক আরও বেশি, আঘাত আরও সংহত। কোনও এক আকাশের নীচে গেরুয়াবাসিনী নারী উল্লাসে চিৎকার করে নাচছে। 'সাধ্বী ঋতম্ভরা।' আদবানির মুখ। কী একটা কথা বললেন। ধুলো ওড়া আকাশের তলায় মানুষের গায়ের রঙ, চুলের রঙ বদলে যাচ্ছে। বিরাট গম্বুজটা প্রথমে বাঁ হাতে দর্শকদের দিকে, তারপর ডানদিকে ঘুরে নীচে পড়ে গেল। 'জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম'। শেষ গম্বুজের পতনের মধ্যে একটা আভিজাত্য ছিল। পাশের দেয়ালগুলো শাবল, গাঁইতি আর হাতুড়ির আঘাতে হুড়হুড় করে ভেঙে পড়ল। এবার করসেবকরা সেই এক মসজিদ ভাঙা রাবিশ সমান করতে লাগল। মাঝখানে কেউ একটা গেরুয়া ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে গেল। 'আরে, এটা ত তখন দেখায়নি।'

'এটা তখন হয়নি, এখনও তো চলছে, এটা এখন লাইফ।' 'ভাঙা ত হয়েই গেল, এখন আবার কী?' 'দ্যাখো কী করে, যে স্পিডে মসজিদ ভাঙল, ঐ স্পিডে মন্দির বানিয়ে না বসে,' টিভিতে বার্তাপাঠকের মুখ এসে পড়ে। মুকুলবাবু এগিয়ে এসে টিভি আর ভি সি আর দুটোই অফ করে দেন। ভি সি আর থেকে ক্যাসেটটা বের করে ড্রয়ারে রেখে তিনি সোজা হন। টিভিটা বন্ধ হতেই এই ঘরটা জেগে ওঠে। কেউ একজন স্লোগান দিয়ে ওঠে,'জয় শ্রীরাম।' আর একজন ঠাট্টা করে বলে 'জয় মা কালী।' অরবিন্দবাবু সোফা থেকে উঠে তাকিয়ে দেখেন, ঘরভর্তি লোক, বেশিরভাগই খেলার মাঠের ছেলেরা। তাদের কাছে খবর পৌঁছুবার পর দল বেঁধে দেখতে এসেছে। দরজা খোলাই ছিল—যে পারে সেই ঢুকে গেছে। হয়ত মুকুলবাবু তাঁর ঘরের মধ্যে এত ভিড় চাইছিলেন না। হয়ত সেজন্যেই তাড়াতাড়ি টিভিটা বন্ধ করে দিলেন।

এই নিখুঁত ধ্বংস-বর্ণনার পাশাপাশি দেবেশ দাঙ্গার অনিবার্য উপাদান নির্বিচার খুন ও ধর্ষণকাণ্ডের ধারাবিবরণী লেখেন নিষ্ঠুর ও নৈর্ব্যক্তিক, নিরাবেগ ও নির্বিরোধী ভাষায়। পড়তে-পড়তে আমাদের, আতঙ্কে ও অবিশ্বাসে, শ্বাসরোধ হয়ে আসে :

বাড়িটার একতলার দেয়ালটা যেন আগুনের মতো পাথর দিয়ে তৈরি। আগুন নিজের বাতাস নিজে সংগ্রহ করে নেয়। সেই বাতাসে আগুনের শিখা লাফিয়ে দোতলার দিকে উঠছে। দিনের আলোতে মিশে যাওয়া আগুনের ক্রমবিস্তারিত শিখায় লেখা হয়ে যায়, এটা মুসলমানের বাড়ি। বাইরে আগুন লাগিয়ে পাশের গলিপথ দিয়ে দঙ্গলটা বাড়ির ভিতরে ঢোকে। এ বাড়ির ভিতর থেকে কোনও কান্না আর চিৎকার বাইরে আসতে পারে না—বাইরে তখন এমনই হল্লা। দূরে দূরে দু-একটি বাড়ির ছাদে, ব্যালকনিতে বা জানলায় কিছু কিছু ভিড়। সেই জ্বলন্ত কপাটের আগুন মাড়িয়ে এই দঙ্গলটা ভিতরবাড়িতে ঢোকে। এই দঙ্গলের সমবেত আত্মবিশ্বাসে এরা জানে যে, এ আগুন এই দঙ্গলকে স্পর্শ করতে পারবে না, যাদের পোড়ানোর, এ আগুন তাদেরই পোড়াবে। যারা আগুনের শিখা জ্বালিয়েছে, তারা এবার সেই শিখা রক্ত দিয়ে ভেজাবে। এক বুড়ি এক খোলা দরজার সামনে দু-হাত সামনে তুলে ধরে হাঁ করে তাকিয়ে। তার ভঙ্গির মধ্যে হয় এক শেষ আত্মসমর্পণ ছিল, না-হয় শেষ বাধাদান ছিল। বুড়ি দাঁড়িয়েছিল, তার মাথা লোহার রডের লক্ষের মধ্যে পড়ে। একটি আঘাতেই বুড়ি মেঝেতে পড়ে যায়, কিছুক্ষণ পরে তার মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে তরলের নিয়মে মেঝের ঢাল খুঁজে নেয়। দঙ্গলের একটি অংশ বাড়ির জিনিশ লুঠ করতে লেগে যায়। ভিতর থেকে কান্নার সমবেত রব ওঠে। গলা শুনে বোঝা যায় না, পুরুষকণ্ঠ না নারীকণ্ঠ। এই দঙ্গল চিৎকার করে ওঠে—'জয় শ্রীরাম।' দুটো শরীর টপকে, প্রতাপ বাড়ির আরো অভ্যন্তরে ঢুকে যায়। তার সামনের দেওয়ালে একজনকে লোহার রড দিয়ে চেপে

ধরা হয়েছে। এক মহিলার শাড়ি খুলে নেওয়া হচ্ছে। মহিলা নির্বাক হাঁ করে থেকে কাপড়ের গিঁটটা নিজে থেকেই খুলে দেন, যেন যারা বাড়ির মুখে আগুন লাগিয়ে বাড়ির এতটা ভিতরে এসে ঢুকেছে, তারা তাঁর শাড়িটুকু নিতে এসেছে। মহিলাকে যখন ধাক্কা দিয়ে খাটের ওপর ফেলে দেওয়া হয়, তখনো তাঁর গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরয় না। তিনি শুধু হাঁ করে থাকেন। যে লোকটা তাঁকে খাটের ওপর ফেলে দিয়েছিল, সেই লোকটাই ধর্ষণ করার জন্যে তার ওপরে ওঠে। তিনি তাঁর নগ্নতাকেও অবারিত করে দেন, যেন সেই নগ্নতা তাঁকে বাঁচাতে পারবে। যাকে দেওয়ালে রড দিয়ে সেঁটে রাখা হয়েছিল, সেই পুরুষ এই ধর্ষণ দেখে যায়। সেই লোকটি ধর্ষণ শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে, 'জয় শ্রীরাম।' আর একজন গিয়ে মহিলার ওপর ওঠে। প্রতাপ বুঝে উঠতে পারে না, এই দঙ্গলের ভিতর তার অধিকার কতদূর পর্যন্ত। বাড়িতে আগুন লাগানো, দরজা ভাঙা, লুঠ, মাথায় ডাণ্ডা মারার পরও কি তার অধিকার ধর্ষণ পর্যন্ত বিস্তৃত? এত তাড়াতাড়ি, মাত্র একটি রাত্রির মধ্যে প্রতাপের হাতের আওতায় একটি আস্ত নারী শরীর এসে যাচ্ছে? কাল সিনেমায় যেমন দেখেছিল, তেমনি করে ধর্ষণ সেরে প্রতাপ তার লিঙ্গ মুছে বেরিয়ে যেতে পারে? কাউকে কোনও কৈফিয়ৎ তাকে দিতে হবে না? এতটাই বদলে গেল সবকিছু রাতারাতি? শুধু হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা চাই আর এই দঙ্গলটা চাই যেখানে কেউ কারও নাম পর্যন্ত জানে না, যেখানে একজনও প্রতাপকে চেনে না, প্রতাপও একজনকেও চেনে না। 'চলো, রেপ করো', কেউ একজন, প্রতাপকে ঠেলে দেয়। আগের লোকটি মহিলাটির ওপর থেকে নেমে এসেছিল। প্রতাপ মহিলাটির ওপর ওঠে। সে ডানহাতে ধরা লোহার রডটা মহিলার পাশে শুইয়ে রাখে। প্রতাপ অত দ্রুত নিজেকে ধর্ষণের জন্য তৈরি করে তুলতে পারে না। তবুও সে মহিলার ওপর ওঠে। তারপর নেমে আসে। এই লোকগুলির উপস্থিতিই যেন তাকে এই নতুন অধিকারের স্বীকৃতি দেয়—সবার চোখের সামনে একটা গোটা নারীদেহের ওপর তারও আধিকার সাব্যস্ত হয়। কেউ এখন প্রতাপকে দেখে নিশ্চয়ই বলতে পারবে না, সে-ই মহিলাকে শেষ ধর্ষণ করেছে কিনা, আবার প্রতাপ যদি আরও একবার মহিলাকে ধর্ষণ করতে যায়, তাহলেও কেউ তাকে বাধা দেবে না। প্রতাপের নাম ধরে কেউ ডাকে নি বটে, কিন্তু প্রতাপই ত মহিলার ওপর চড়েছিল। প্রতাপ এদিক ওদিক তাকিয়ে পরমানন্দকে খোঁজে। অন্তত একজনও যদি সাক্ষী থাকে যে একটা মেয়ের শরীর প্রতাপ কিছুক্ষণের জন্যে সম্পূর্ণ দখল করেছিল। প্রতাপ এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। সে যে এই মহিলার ওপর এরকম তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারল সে ত এই ঘরে এই লোহার ডাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলেই। এই দঙ্গলের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রতাপে চিৎকার করে ওঠে, 'জয়

শ্রীরাম।' একজন কেউ চিৎকার করে ওঠে, 'খেল খতম করো।' সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটিকে ডাণ্ডা দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে রাখা হয়েছে তার তলপেটে একটা ছুরি বিঁধে যায়, লোহার ডাণ্ডা উঠে আসে, লোকটা নিজের পেট ধরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। আর একজন গিয়ে খাটের ওপর মহিলার গায়ে পেট্রল ছড়িয়ে দেয়। মহিলা এতক্ষণে চিৎকার করে ওঠেন। তার আগে তাঁর শরীরে আগুন লাগানো হয়ে গিয়েছে ও সেই আগুন দ্রুত একটা নারী শরীরের আকার নিচ্ছে। প্রতাপ কালকের ব্লু ফিল্‌মের চাইতেও এগিয়ে যায়—রেপ ভি হ্যায়, মার্ডার ভি হ্যায়। কিন্তু সেখানে ত আগুনে পোড়ানো ছিল না। এখানে আগ্‌ ভি হ্যায়। দঙ্গলটা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। যেন কোথাও কোনও হিসেব আছে—একটা বাড়িতে আগুন লাগানো, হয়েছে, একটা বউকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তিনটে মার্ডার করা হয়েছে, তারপর সে বাড়িতে আর কিছু করার নেই। এ বাড়িতে ঢুকে দঙ্গলটা ত আলাদা আলাদা দিকে ছড়িয়ে গেছে, কেউ কেউ দোতলায় উঠে গেছে। এই বাড়ি থেকে বেরনোর সময় একটা দঙ্গল থেকে অনেকগুলো দঙ্গল তৈরি হয়ে গেছে। এক একটা দঙ্গল এক একটা কাজ করে যায়। দঙ্গল শুধু বেড়ে যায়। প্রথম বাড়ি আক্রমণের ঘটনার মধ্যে অনেক অনিশ্চয়তা থাকে— কেউ বাধা দেবে কিনা, বাড়ির ভেতরে অস্ত্রশস্ত্র মজুত আছে কিনা, পাল্টা আক্রমণ হবে কিনা। প্রথম আক্রমণেই ঠিক হয়ে যায়, শুধু আক্রমণ করে যেতে হবে, শুধু আগুন লাগাতে হবে, শুধু ধর্ষণ করতে হবে, শুধু খুন করতে হবে। তুমি যতক্ষণ পার আর যতক্ষণ তুমি একটা ধাবমান দঙ্গলের ভিতর ঢুকে থাকতে পার, ততক্ষণই তুমি তোমার যা খুশি করে যেতে পার। তার মধ্যে কতবার দল বদল হয়, কতবার হাতিয়ার বদল হয়। প্রতাপ চিনে উঠতে পারে না সে কোন দঙ্গলে ছিল। মুখগুলো পর্যন্ত চেনা নয়। সব দঙ্গলেই এমন লিডার কেউ না কেউ থাকে যারা জানে কোনটা মুসলমানের বাড়ি, যারা জানে আগুন লাগাতে হয় কোথায়, যারা ধর্ষণ করতে জানে, করাতে জানে, যারা জানে ধর্ষণের পর ধর্ষিতার শরীরে আগুন লাগিয়ে দিতে হয়। কে বা কারা যে সেই লিডার তা প্রতাপ আন্দাজ করতেও পারে না।

লেখকের এই বিবরণ শেষ পর্যন্ত কোনও তথাকথিত ভাবমোক্ষণে পৌঁছয় না। সাহিত্য চিরকাল আমাদের যে-ভাবে নান্দনিক উত্তরণে পৌছে দেওয়ার ব্রত পালন করে, দেবেশ এখানে সেই দায়-পালনে একেবারেই বীতস্পৃহ। হিংস্রতার এই বিনির্মাণের মাধ্যমে তিনি যেন যুগপৎ আমাদের তথাকথিত পেলব মূল্যবোধ আর কঠিন নিরাসক্তির উপরই আঘাত করতে চান সত্যের নির্মমতা দিয়ে। তাতে তথাকথিত সাহিত্যনন্দনতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হল কি না, তা তাঁর কাছে বিন্দুমাত্র গুরুত্বের নয়।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের (১৯৫০) *রক্তের নিচে* (১৯৯৯) উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান

সম্পর্ক অনেকটাই রোমান্টিকতার নিরিখে বিধৃত। উপন্যাসটি সংক্ষিপ্ত আয়োজনে একটি গভীর তাৎপর্যময় সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা বলে। দুই ধর্মাবলম্বী দুটি নারী-পুরুষের ভালবাসা, সঙ্কট, সংঘাত সুব্রত এখানে খুবই মরমী কলমে লিখেছেন। একই সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা ও অনুচ্চ বিশ্লেষণে নীলকান্ত-জুলেখার সম্পর্কে ছড়িয়ে দিয়েছেন যথোচিত তাপ ও হিম।

স্বামী জনাব আলির মৃত্যুর পর জুলেখার সঙ্গে খুবই নিরুচ্চারে সম্পর্ক তৈরি হয় স্বামীর বন্ধু নীলকান্তর। জুলেখাকে, তার মেয়ে রোশনিকে গ্রহণ করেই, বিয়ে করে নীলকান্ত। স্থানীয় আর্যসমাজে গিয়ে তার আগে জুলেখাকে 'সুলেখা', আর রোশনিকে 'রেশমি' নাম পাল্টে নেয় সে। চটকলের মজুর, বামপন্থী ইউনিয়নের কর্মী নীলকান্ত ভালবাসার জোরেই কাজটি করতে পারে। আর, জুলেখা জানে, কেবল বেঁচে থাকার জন্য নারীকে বারবার নিজের স্থান-কাল-পাত্র বদলে নিতে হয়। নীলকান্ত-রেশমি-সুলেখার জীবন গল্পের মতোই নিরুদ্বেগে প্রবাহিত হয়। ছোটখাটো সুখদুঃখ-মানাভিমান কখনও পুঞ্জীভূত হলেও, শেষ পৃষ্ঠায় মেঘ কেটেও যায়। গল্পপাঠের এক অনাবিল আনন্দ সুব্রত তাঁর উপন্যাসে বরাবরই দিতে পারেন। এখানেও দিয়েছেন। কিন্তু, তাঁর কাছে আমাদের যেহেতু প্রত্যাশা কিছু বেশি থাকে, সেহেতু এমন-একটি জ্বলন্ত বিষয় নিয়ে এহেন কোমল উপাখ্যান-রচনা আমাদের কিছুটা হতাশ করেই। কেননা, একটি ছোট মফস্বলে হিন্দু-যুবকের মুসলমান-বিধবা যুবতীর সঙ্গে প্রণয়-তথা-পরিণয়ে দুই পরিবারের-তথা-সমাজের কোথাও সামান্য আলোড়ন উঠল না, এই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বিস্ময়াবহ। সর্বোপরি, তিনি যে-ভাবে রোশনিকে রেশমি, আর জুলেখাকে সুলেখা বানালেন, তা-ও বেশ কষ্টকল্পিত মনে হয়। তবু, সুব্রতর সদিচ্ছার যে যথেষ্ট মূল্য রয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

সুব্রত উপন্যাসে এক ফকির-চরিত্রের অবতারণা করে সুলেখা-নীলকান্তর ব্যক্তিগত মানাভিমানে অন্যতম মাত্রা আরোপ করেছেন :

> *পাকুড় গাছের ঝিলিমিলি পাতায় আলো হাওয়া। দূর আকাশের ওভারব্রিজে মানুষজনের যাতায়াত। রেললাইনের ওভারহেড তারে আলোর জটিল রেখাচিত্র। একটি কাকের নিঃসঙ্গ বসে থাকা। প্রায় নীল আকাশের এখানে সেখানে সাদা মেঘের জটাধারী।*
>
> *পরম তত্ত্ব মানুষ তত্ত্ব সারাৎসারের কথা*
> *আর সব ঝুটো পাথর দেখিস কি ফল পাবার পাশে*
> *ও মন মানুষ চেয়ে দেখ তোর আপনজন বিরাজে—*
>
> *ঘুঙুরখানি তাল রাখে গানের পাশে পাশে। তালে তালে মাথা দোলে ফকিরের। নীলকান্ত ছাড়া আর সবাই অবাক হয়ে শোনে পীর-বন্দনার বাইরে গিয়েও ফকির এমন গাইতে জানে।*

এই ফকিরের গানই যেন আবার মিলিয়ে দেয় সুলেখা-নীলকান্তকে। দুই বিপ্রতীপ

সম্প্রদায়ের দুটি নারী-পুরুষ নিজেদের মাঝখানে স্থাপন করে প্রেমকে। উপন্যাসের শেষে লেখকের অভিপ্রায়টি বোঝা যায়।

আবুল বাশার (১৯৫১) সমকালীন সাহিত্যে একটি নিজস্ব, সমান্তরাল পথ তৈরি করে নিতে পেরেছেন। প্রথম উপন্যাস *ফুলবউ* (১৯৮৮) থেকেই তিনি আত্মপরিচয়টি খুব স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাঙালি-মুসলমান-জীবনের আলো-আঁধারকে তিনি সমালোচনা ও সমবেদনার গাঢ় রঙে চিত্রিত করেছেন। মুসলমানি ধর্মীয় আচ্ছন্নতার পাশে তিনি বারবার প্রেমকে স্থাপন করে দেখতে চেয়েছেন ধর্ম ও প্রাণের অন্তর্নির্হিত টানাপোড়েন, আসক্তি, আকুতি।

আবুল বাশারের *সুরের সাম্পান* (১৯৯০) উপন্যাসটি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি জরুরি মাত্রা আরোপ করে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান সুর আর সংগীত দিয়ে পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছিলেন উপন্যাসের মুসলমান ওস্তাদজি। তাঁর ছাত্ররা সকলেই হিন্দু। কেবল গোপালেরই কোনও ধর্ম নেই। কেননা, তার জন্মবৃত্তান্ত সকলের অজানা। গোপালকে সন্তানস্নেহে মানুষ করেছিলেন সুরসাধক ওস্তাদ। তিনি তাকে নিজের ধর্মের ভার দেননি, সংগীতের নির্ভরতা দিয়েছিলেন। সংগীত ছাড়া আর-কোনও শিক্ষা ছিল না গোপালের।

কিন্তু, শেষপর্যন্ত, সাম্প্রদায়িক সমাজ-ব্যবস্থার কাছে পরাস্ত হতে হয় ওস্তাদকে। গোপাল-সোহিনীর প্রেমকে পরিণয়ের পূর্ণতা দিতে ব্যর্থ হন তিনি। আর অনিচ্ছার বিবাহ-সাজে সোহিনীর মনে হয় *'গলার মালাটা বুকের ওপর কামড়ে ধরেছে তাকে। যেন রক্ত বেরিয়ে ভিজে যাবে বুক। এটি আর এক রক্তক্ষরণ, দাঙ্গার মতোই তা মানুষকে শেষ করে দেয়।'*

যদিও, এই অনিবার্য বিচ্ছেদকে যে-কোনও মিলন-প্রত্যাশী লেখকের মতো মেনে নেন না আবুল বাশার। তিনি লেখেন এই রক্তাক্ত বিচ্ছেদ-সত্ত্বেও, *'গোপালরা জন্মাতে থাকে...বারবার। প্রতি বছর। প্রতিদিন।'*

ধর্মের গ্রহণ (১৯৯২) উপন্যাসে বাশার সারংপুর নামে এক গ্রামের পটভূমিতে স্থাপন করেছেন একটি ধর্মপ্রবণ মুসলমান-পরিবারকে। সারংপুরের মুহুরি একলাস মুনসি জীবনজুড়ে কেবল অন্যের ভিটেমাটি, জোতজমি আত্মসাৎ করেছেন। সম্পত্তি, নারী এবং ধর্মের নেশায় অন্ধ তিনি। নিয়মিত নামাজ পড়েন, কোরান কণ্ঠস্থ। এহেন চরিত্রের পাশে বাশার এঁকেছেন উপন্যাসের নায়ক বেলালকে। আচারসর্বস্ব ধর্মে বেলালের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। প্রপৌত্র বেলালের সঙ্গে একলাস বিয়ে দেয় রূপসী, ধর্মপ্রাণ নাজনিনকে। বেলাল লক্ষ করে, তাদের দাম্পত্যের মধ্যে কীভাবে ছায়া ফেলে ধর্ম, নিয়ন্ত্রণ করে এমনকী প্রেম ও যৌনতাকেও। ধর্ম বিচ্ছেদ ঘটায় প্রণয়ে। কিন্তু, শেষপর্যন্ত, ধর্মকে পরাভূত করে প্রেম, জেগে ওঠে প্রাণ।

ধর্মের এই আত্মসাৎ-প্রবণতাই বারবার ব্যক্ত করেছেন বাশার তাঁর রচনায়। তথাকথিত

ধর্মের ছলনা ও শক্তির কথা, তার অন্তঃসারশূন্যতার কথা লিখেছেন। *ধর্মসম্মত নিধনযজ্ঞ* নামে একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

> *ধর্ম জিনিসটা দু-মুখো সাপের মতো—দুটি মুখই অবিকল এক। কোনটা আসল, কেউ জানে না। অথবা দুই মুখই সমান। একমুখে হিংসা, অন্যমুখে অহিংসা। দু-মুখো সাপকে ঘিরে লোককথা বা পুরাণকথা হচ্ছে, একমুখে সে বলে কামড়েছি, অন্যমুখ বলে কামড়াইনি। তাই দু-মুখোর বিষ ঝেড়ে নামানো যায় না—ধর্মের বিষও তাই। যুদ্ধ করো ধর্মের নির্দেশ, যুদ্ধ কোরো না ধর্মেরই নির্দেশ। ত্যাগ ধর্ম, ভোগও ধর্ম। হিংসার প্রয়োগ ধর্ম, অহিংসার প্রয়োগও ধর্ম। এক গীতা থেকেই অগ্নিযুগের বিপ্লবী সহিংস পথে দেশের মুক্তি চেয়েছিলেন, সেই গীতাই মহাত্মা গান্ধীকে করেছিল রাজনৈতিক ফকির এবং অহিংসার পূজারী। ধর্ম মানুষকে রূপ-যশ-সম্পদের কাঙাল করে তোলে, ধর্মই মানুষকে করে পরার্থবাদী এবং সেই পরার্থপরতা অধিকাংশ সময়ই জাতি বা সম্প্রদায়ের মঙ্গল-চেষ্টা মাত্র। কখনও তা মানবকেন্দ্রিক উচ্চতা লাভ করেছে। কচিৎ করেছে।*
>
> *ধর্মই মানুষকে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাত্য করেনি? ধর্মই কি বলেনি, ব্রাহ্মণের জানুদেশ থেকে শূদ্রের জন্ম? কেন বলেছে? ধর্মই কি বলেনি, কোরেশ বংশই খাস মানুষের বংশ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ? ধর্মই কি বলেনি, মানুষ হচ্ছে কাফের? বর্ণাশ্রম প্রথা কি ধর্মসম্মত নয়? ধর্মই কি মানুষকে জল-অচল করেনি? অহিংসা পরমধর্ম, সর্বজীবে সমদয়া—ধর্মকে এই সংজ্ঞায় স্থির করা রক্তপ্রবাহিনী ধর্মের পক্ষে সম্ভবই নয়। এ-কথা বললে ধর্মকেই দেশচ্যুত হয়ে গিরিগুহা-কন্দরে লুকিয়ে পড়তে হয়। অহিংসার ধর্ম সংখ্যালঘুর চেয়েও অসহায়। আফগানিস্তানে যেভাবে বুদ্ধমূর্তি অসহায়। তবু ধর্মধ্বজীরা বলেন, যা করেছে ধর্ম করেনি, মানুষ করেছে। ধর্ম খারাপ করে না ইত্যাদি।*
>
> *এইসব ধার্মিক কুযুক্তি ধর্মের হিংস্র চেহারাকে আড়াল করতে চায়। আমি কি দু-মুখো সাপের মতো একমুখে বলব, মহাত্মা গান্ধী নিষ্ঠাবান হিন্দু, অন্যমুখে বলব, না তিনি নন, নিষ্ঠাবান হিন্দু নাথুরাম? ধর্ম কী, আমি কার কাছে জানতে চাইব, মহাত্মার কাছে না গড়সের কাছে? কে গীতাকে যথার্থ বুঝেছিলেন? নাথুরাম, নাকি যিনি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময় মাথাটা বুকের কাছে নামিয়ে বলে উঠলেন, 'হে রাম!'—সেই মোহনদাসের কাছে, কার কাছে?*
>
> *—রক্তমাংস, গুজরাত সংখ্যা, ২০০২*

বলা যায়, তথাকথিত সংখ্যালঘু হিসাবে বাশারের যে-অভিজ্ঞতা—ধর্মের নাগপাশ, অনাচার এবং প্রতিবেশী হিন্দু-মূলস্রোতের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্ব—তা-ই ব্যক্ত হয় তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে। বলা যায়ই, ধর্মই তাঁর রচনার অনেকাংশিক চালিকাশক্তি। যেমন, *আকাশলীনা* (১৯৯৪) উপন্যাসে।

উপন্যাসের নায়িকা আকাশলীনার নামের পরে কেন 'সৈয়দ' পদবিটি বসাতেই হবে, তা ভেবে পাননি তাঁর একদা-হিন্দু মা স্বর্ণদীপা। আহসান ইমাম ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন হিন্দু-কন্যা স্বর্ণদীপাকে। স্বর্ণদীপা-আহসানের কন্যা আকাশলীনা শৈশব থেকে দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সহিংস-আন্দোলনের-কারণে-জেলবন্দি বাবাকে তাঁর রাজনীতি আর বিয়ের কারণে কখনওই সমর্থন করেনি ধর্মান্ধ, নিরাপদ-রাজনীতি-অভ্যস্থ গ্রামসমাজ। আকাশলীনা তবু ডানা মেলতে চেয়েছে নতুনতর আকাশে।

কিন্তু, ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর যেন হঠাৎই তাঁর সব বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানে। ধূল্যবলুণ্ঠিত বাবরি মসজিদের মতোই গোটা পৃথিবী আর তার মানুষদের দীর্ণ হতে দেখে সে। বাশার লেখেন :

> *— আচ্ছা বাবা, একটা জাত আর একটা জাতকে ঘৃণা করে কেন? এত জাতে ভরা এই দেশটা, এত সম্প্রদায়, এত ধর্ম! ঈশ্বরের ধর্মে মানুষ এত উঁচু নিচু, ছোট, বড়—কেন? আর তুমিই বা কোনও ধর্ম পালন কর না কেন?*
>
> *—তোমার কথার মধ্যেই তোমার প্রশ্নের উত্তর আছে কিছুটা। পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্ম নেই যাতে নারী আর পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছে।*
>
> *পুরুষের বাঁ পাশের বাঁকা হাড় দিয়ে নারী গঠিত—এই কথাটি কোরানেও পাবে তুমি। এইরকম একটা অতি অবৈজ্ঞানিক ধারণা, একটা অলৌকিক কেচ্ছা, সত্যি বলতে কি আধুনিক মানুষ মেনে নিতেই পারে না। ধর্মও মানুষের একটি স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন—মানুষের মাথা থেকেই যুগে যুগে নানান ধর্মের উৎপত্তি। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন, নাম আদম। এমনকি 'কুন' উচ্চারণ করলেন খোদা, অর্থাৎ বললেন হোক, তাই হল। কী হল? সাত দিনে জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেল। লেট দেয়ার বি লাইট, দেয়ার ওয়াজ লাইট। আলো হোক, তাই আলো হল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের বাসনা দ্বারা উদ্ভূত। কী বিস্ময়কর ঘটনা!*
>
> *—এ আমি জানি বাবা!*
>
> *—তাহলে আমারই বাঁ পাশের হাড় দিয়ে তোমার মাকে ঈশ্বর গড়েছেন—কী বল? আমি বলি কি, ঈশ্বরের অভিপ্রায় না থাকলে, প্রজাপতির অভিলাষ না থাকলে, স্বর্ণদীপার সঙ্গে আহসান ইমামের শাদি অসম্ভব। সম্প্রদায়কে, পুরুত মোল্লা প্রভৃতিকে বোঝানো যায় না কেন? পৃথিবীর সবচেয়ে অযুক্তির নাম ধর্ম। পদে পদে ধর্ম আমাদের সে কথা বুঝিয়ে চলেছে। অযোধ্যায় গতকাল যে ঘটনা ঘটে গেল তার যুক্তিটা হল বাবরি মসজিদের মধ্যে ঈশ্বর রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারণ ওটা গোড়ায় ছিল রামমন্দির, কারণ জায়গাটা অযোধ্যা।*
>
> *—বাস্তবিক, এ তো ইতিহাসের ব্যাপার।*
>
> *—কোনটা ইতিহাসের ব্যাপার? বাবরি মসজিদ গোড়ায় কী ছিল, মন্দির ছিল কি না, ওখানে রামের জন্ম কি না—হ্যাঁ এসবই ঐতিহাসিকের কৌতূহলের বিষয়*

হতে পারে। কিন্তু সেকথা শুনছে কে? কলকাতায় গত মাসে এক কলেজ-অধ্যাপক, প্রৌঢ়, হঠাৎ আমাকে বললেন, আপনারা হিন্দুদের ওই মসজিদটা ছেড়ে দিলেই তো গোল চুকে যায়। কী সরলমতি লোক। এই লোক ছাত্র মানুষ করেন। অবশ্য হাসতে হাসতে কথা বলছিলেন বেচারি। ভাবখানা এমন যে, তিনি আমার সঙ্গে চমৎকার রসিকতা করতে পেরেছেন।

—তুমি কী বললে?

—বললাম, ধরে কে রেখেছে বলুন তো! প্রৌঢ় বললেন, কেন পাকিস্তান তো বলছে...তাছাড়া আপনারা পাকিস্তান ক্রিকেটে জিতলে কেমন করেন? বাজি পোড়ান না? কথা কি, মুসলমানদের যথেষ্ট তোল্লাই দেওয়া হয়েছে, অযোধ্যার ঘটনা হল তারই রিঅ্যাকশন। প্রৌঢ় বললেন, এসব কিন্তু আমার কথা নয় মশাই। ট্রেনে আসতে আসতে শুনছিলাম, পাবলিক ডায়ালগ। তা, আমি চুপ করে আছি দেখে, প্রফেসর বললেন, চুপ করে রইলেন যে! তখন বললাম, আমার ভারী কপালের দোষ মশাই, জেল খেটে খোঁড়া হয়েছি, আমার ফের মন্দির-মসজিদ কিছুই নেই। হকচকিয়ে গেলেন কলেজের মাস্টারমশাই। উৎকট হেসে ফেলে বললেন, আপনার একটাই বিবি তাহলে? ছেলেমেয়ে কয়টি? আচ্ছা, মুসলমানরা...আপনার কথা বলছি না, তারা চারটি বিবি করেন কেন? গণ্ডা গণ্ডা ছেলেপুলে...বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ...এই সব অস্বীকার করতে পারেন? ম্যালথাস বলেছেন, নিবারক বাধা...হয় যুদ্ধ নয় মহামারী, মুসলমানদের জন্য আমরা ভুগব কেন?...শুধালাম, কথাটা আপনার না পাবলিকের? উনি সেকথায় কান না দিয়ে বললেন, আচ্ছা সলমন রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস বইটা কেমন? ভাল? খুব নিরীহ গলায় জিজ্ঞাসা।

—তুমি কী বললে?

—বললাম, জানি না। আমার বাবা রেলে চাকুরি করতেন। কবি নজরুলের ভক্ত ছিলেন। ছুটিছাটায় গ্রাম চাঁদপুরে ফিরতেন। সেই সময় বিহারের কাটিহারে থাকেন। গাঁয়ে এসে নামাজ পড়তেন। জুম্মার নামাজ থেকে ফিরছেন, মাথায় টুপি, কপালে সিজদার দাগ। পুরনো আমলের গ্র্যাজুয়েট। গ্রামের মানুষ বেজায় সম্মান করত। তা সেই বাবা যখন জুম্মা সেরে মসজিদ থেকে বার হয়ে পথে নামতেন, তখন আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতেন ; পথের পাশের ঝুলন্ত জবা ছিঁড়ে নিয়ে কানে গুঁজতেন। আর গুনগুন করে নজরুল গীত ধরতেন। কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। লোকে সম্মানবশে চুপ করে থাকত। ঘটনার শেষাংশ আরও অদ্ভুত। উনি কানে গোঁজা জবা বিসর্জন দিতেন ওই পাম্পসেটটার মাথায়, ফুল চড়াতেন, কেন জানো?

বাবা এবার এক মিনিট নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমি এমন ঘটনা কখনও

শুনিনি। আশ্চর্য হয়ে বললাম—ওই পাম্পসেট বাবা? ওটা তো অচল এখন। ওই মডেল্প ইদানীং কিনতে পাওয়া যায় না। কোম্পানি উঠে গেছে বোধহয়।

—হতে পারে। মেশিনটার নাম গঙ্গা। এই নামটার জন্যই বাবা ফুল চড়াতেন ওটার ওপর। মেশিনটা জল তুলত হড়হড় করে, এখন অচল, কিন্তু বাবার কালে ফোয়ারার মতন ঢালত। হেদিয়ে জল দিত। সেই গঙ্গায় বাবা জবা চড়িয়ে বাড়িতে ঢুকে যেতেন, টানা বারান্দায় প্রকাণ্ড কাছিমের মতন পড়ে থাকত যন্ত্রটা।

অন্যদিকে বাশার অকপটে ব্যক্ত করেন দাঙ্গার বীভৎসতা :

মানুষের ধর্ম এবং জাত যৌনতা-সন্নিহিত। মানুষকে উলঙ্গ করে দেখা হয় মানুষের জাত কী? রুদ্র সেকথা ভোলেনি। মা সেই অপমানে কেঁদেছেন। দাঙ্গায় শুনেছি, মানুষের যৌনাঙ্গ দেখে ধর্ম নির্ণয় করা, সম্প্রদায় শনাক্ত করা এবং অতঃপর ছুরি বসানো—এইভাবে চলে হিংসার ঐতিহাসিক উৎপাদন। একটা মানুষকে মস্তানি হত্যালীলায় মাস্কেট বিদ্ধ করে বোঝানো হয়, অন্ত্যজ হত্যায় পাপ নেই।

আমি জানি, আবার গুলির আওয়াজ ভেসে উঠবে। মুস্তাফা কিছু আগে বলেছে, চক-সরষেতলায় রাত্রে আজ বাজি পুড়বে, বাবরি ধ্বংসের আনন্দে মহোৎসব হবে। কলকাতায় দাঙ্গা বেধে যাবে, এই জেলা দাঙ্গায় ধসে যাবে। বাতাসে হু হু করে গুজবের বৃশ্চিক ছুটে মরছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আকাশে একফালি চাঁদ ওঠে। দয়িতের হাত ধরে, যেন ডানা মেলে, নিরুদ্দেশে, নতুন আকাশের দিকে চলে যায় আকাশলীনা। বাশার লেখেন :

চিত্রিতার মুখের দিকে নিমেষভর চেয়ে থেকে স্বর্ণদ্বীপা বললেন—আমি কি সত্যিই মুসলমান চিত্রিতা? আমার স্বামীও কি তাই? আমি স্বামীকে বলেছিলাম, মেনে নাও ইমাম। আজ কতকাল পর তোমার সামনে নিজেকেই বলছি, মেনে নাও। ভাগ্যকে স্বীকার করে নাও, আর বলছি কি জানো, ভালবেসেই শেষ হয়েছি, আমার মেয়েরও সেই অধিকার আছে।

...

স্বামীর বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন স্বর্ণদীপা। আকাশে একফালি চাঁদ উঠল সন্ধ্যায়। ইমামকে আলিঙ্গন করে তিনি বললেন—আজ বড় কষ্ট তোমার। আমি আছি তোমার কাছে। ভয় পেও না।

চাঁদের গায়ে এক অনির্বচনীয় আলো ফুটে উঠেছে তখন।

প্রসঙ্গত, হর্ষ দত্তর (১৯৫৫) *ময়ূরাক্ষী, তুমি দিলে* (১৯৮৯) উপন্যাসটির কথা আমরা মনে করতেই পারি। মীরপুরের রুক্ষ মাটিতে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও, শেষ পর্যন্ত এক গভীর সামাজিকতায় পৌঁছে যায়—দুটি সম্প্রদায়ের সম্মিলিত জীবনের গভীরতা হায়াত বা ময়ূরাক্ষীর হাত ধরে এগিয়ে যায় জটিল, স্বাভাবিক, অমোঘ পরিণতির দিকে। আমরা সবিস্ময়ে পড়ি :

মুনীর আলি থেমে গেল। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল মাঠের উপর দিয়ে। বিচিত্র সব গন্ধে বাতাস ভরপুর। ময়ূরাক্ষী শাড়ির আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল। হায়াৎ টানটান হয়ে বসেছে। শ্মশ্রুমণ্ডিত চয়নের মুখ অভিব্যক্তিহীন। সুনীত বলতে যাচ্ছিল—তারপর? তার আগেই মুনীর আলি বললো, তা বাপজান, তখন চোখের নজর ছিল পরিষ্কার, মাথা ছিল পরিষ্কার। ভুল দেখিনি। উই হোথায়, আর একটু দূরও হতি পারে, পষ্ট নজরে এল—একটা প্যাঁচা। দুধের মতো সাদা গো! উড়ে এসে বসলো সোনার বরণী মাঠের মাঝখানটিতে। আর পাঁচটা পাখির মতো নয়। সাইজে এই অ্যাত্ত বড়ো। প্রথমে ভেবেছিলাম স্বপ্ন দেখছি। চোখ বড় বড় করে দেখি স্বপ্ন নয়, পাখিই বটে। লক্ষ্মী প্যাঁচা। কে যেন বাছার কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়েছে—একেবারে গোল করে। তা, আমি তো খুব ভয় পেলাম। জিন-পরীরা পাখি সেজে ভয় দেখাতে এয়েছে কি? লাঠি ছুঁড়ে মারব না চিৎকার করব? নাকি ছৈয়দ সাহাবকে ডেকে আনব। এই সব ভাবতিছি, হঠাৎ শুনি জোড়া মলের ঝুমঝুম শব্দ। নিঃশ্বেস বন্ধ করে বসে আছি।

এত যে শীত লাগতিছিল, সেসব কোথায় উবে গেছে। মলের শব্দ যেন আকাশ থেকে নেমে এল। চোখের পলক পড়েছে কি পড়েনি, ভেবে দেখ সেই যৌবনের চোখ—দেখি কি প্যাঁচাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক মেয়েছেলে। বাঁ হাতে একগোছ ধান, ডান হাতে একটা কুনকে। কুনকের গায়ে কত রঙবেরঙের কড়ির কাজ। মেয়েছেলেটার সে কী রূপ! সর্বাঙ্গ সোনায় মোড়ানো। চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল। অমন শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছি। হঠাৎ মনে হল, আরে এ যে মা-লক্ষ্মী। মহীনবাবুর বাড়িতে মেয়েলোকটার পট দেখেছি। একে বড় মান্য করতেন মহীনবাবু। রোজ ধূপ-ধুনো দিতেন। খুব ছোটবেলায় মহীনবাবুর বাড়িতে কিছুকাল ছিলাম বাপজান! বড় ভালো মানুষগো! নারকেল ছোবড়ার ব্যবসা করতেন। তা আমাকে ওর গদি-ঘরের কাজে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। এখন যেখেনে মীরপুরের হাইস্কুল, সেখেনেই ছিল মহীনবাবুর আড়ৎ। তা মালক্ষ্মীকে চিনতে পেরে ভয় ডর তো চলে গেল। মনে হল, দুটো কথা বলি। অতশত তো বুঝিনি, যেই না মা বলে হাঁক পেড়েছি—কোথায় কে? সব ভোঁভা। নিমেষে সব উধাও। মা-লক্ষ্মী যেখেনে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনও চিহ্নমাত্র নেই গা! পতিপতি করে খুঁজলাম। কিচ্ছু নেই। তবে একটা জিনিস ছিল। গন্ধ। আমার এই চার কুড়ি বয়েস হল। তেমন সুন্দর গন্ধ আর জীবনে দ্বিতীয়বার শুকিনি। এখনও নাকে লেগে আছে গো। কবরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত থাকবে বাপজান! এ যে মা লক্ষ্মীর গায়ের গন্ধ।

এই পাঠ যাবতীয় ধর্মাধর্মের ভেদাভেদ নিমেষে মুছে দেয়। মুসলমান যুবকের লক্ষ্মী-দর্শন যেন উপন্যাসের প্রতীককে অতিক্রম করে যায়।

দেশভাগের ক্ষত যেন এখনও দপদপ করছে এই উপ-মহাদেশে। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছিল ধর্মকে ভিত্তি করে নয়, বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে। পশ্চিম পাকিস্তানের অ-বাংলাভাষী শাসককুল উর্দুর শাসনে বাঁধতে চেয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানকে। যে-বাংলাভাষার জন্য বাঙালি, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে, ১৯৫১ সালে রক্ত ঝরিয়েছিল, তার উপর পরবর্তী বলাৎকার সহ্য করেনি পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাভাষীরা। ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্থাপিত হয়েছে পৃথিবীর একমাত্র বাংলাভাষী রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'। কিন্তু, পরবর্তিকালে, আমরা দেখলাম, ১৯৪৭-এর ক্ষত সেখানে এখনও অক্ষত। ধর্মের ভিত্তিতে, ধর্মের ভাগাভাগিতে, ধর্মের অজুহাতে বাংলাদেশে বারবার দাঙ্গার আগুন জ্বলেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। ভারতে সংখ্যালঘু-নিধন হলে, বাংলাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে সূচিত হল শ্রেষ্ঠতম কলঙ্কের দিন। রাজনীতির সুস্পষ্ট মদতে অযোধ্যায় লুটিয়ে পড়ল বাবরি মসজিদ। আর, তাতে ফল যা হওয়ার, হল তাই-ই। দেশজুড়ে শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা, জারি হয়ে গেল বিভিন্ন প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন কার্ফু। সেই অন্ধকারের ঢেউ সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছে গেল বাংলাদেশে। শুরু হল সংখ্যালঘুর উপর মৌলবাদী গোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত আক্রমণ।

সেই ঘোর অসময়ের পটভূমিতে তসলিমা নাসরিন (১৯৬২) লেখেন তাঁর জ্বলন্ত উপন্যাস *লজ্জা* (১৯৯৩)। উপন্যাসটি ঢাকায় প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই 'নিষিদ্ধ' হয়ে যায়। পরে কলকাতা থেকে উপন্যাসটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি সে-সময় এই বাংলায় একটি লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া তার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ও আভিজাত্য ভুলে *লজ্জা*-র অজস্র নকল সংস্করণ প্রকাশ করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোনও বইকে ঘিরে এরকম গণ-উন্মাদনা সৃষ্টি হয়নি। পরে আমরা এই উন্মাদনার অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িক-তথা-রাজনৈতিক অভিসন্ধি টের পেয়েছি। হিন্দু-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি *লজ্জা*-কে বর্ম বানিয়ে তাদের বহুমাত্রিক চক্রান্তের অন্যতর মহিমা আরোপ করেছে। হিন্দু-বাঙালি পাঠকও বইটি পড়েছে ওই সাম্প্রদায়িক প্রণোদনায়। এ-জন্য অনেকেই তখন লেখককে দায়ী করেছেন। তাঁর প্রণয়নে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, সেই দোষারোপ যে যৌক্তিক নয়, তা এখন বোঝা যায়। তসলিমা একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির, এবং সেই-পরিস্থিতি-থেকে-উদ্ভূত মনস্তত্ত্বের বিবরণ দিয়েছেন। একজন সৎ সাহিত্যিকের কাজ যে সততই শান্তির ললিত বাণী শোনানো, সকলে তেমন মনে না-করতেই পারেন—বিশেষত, শেষ-পৃষ্ঠায়-লাল-সূর্যোদয় যখন সাহিত্য-শিল্পে সবিশেষ ক্লিশে হয়ে গিয়েছে।

তসলিমার এই উপন্যাসের নায়ক সুরঞ্জন এক প্রগতিশীল যুবক। নিজেকে সে কখনও ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ভাবেনি। মুসলমান-বন্ধুদের সঙ্গে সহমর্মিতায় রমজান মাসে বাইরে চা-সিগারেট পর্যন্ত খায়নি, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না বলে গর্ব বোধ

করেছে, মুসলমান-প্রেমিকা পারভিন আর সে চুম্বিত হয়েছে। কিন্তু, বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে বাংলাদেশও জড়িয়ে পড়েছে দাঙ্গায়। চেনা মুখগুলি হঠাৎই অচেনা হয়ে গিয়েছে। তবু, নিজের বিশ্বাসে স্থির থাকতে চেয়েছে সুরঞ্জন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, যখন তার বোন মায়াকে লুঠ করে নিয়েছে দাঙ্গাকারীরা, কেবল সে হিন্দু আর যুবতী বলে, তখন নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি সুরঞ্জন। নিজেকে কেবল 'হিন্দু' ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে। ধর্ষণের-পরিবর্তে-ধর্ষণের জিঘাংসা জেগেছে তার। সেই অনিবার্য জিঘাংসার আগে :

সুরঞ্জন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা একসময় বলত। বলত এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুনাম রয়েছে। সুরঞ্জন তুলনা করে দেখত ভারতে যত দাঙ্গা হয়, এদেশে তার কিছুই নয়, সেদিন হায়দারও একথা বলেছিল, বলেছিল— ভারতে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে, এদেশে তো তার কিছু হয়নি। সুরঞ্জন কথাটির প্রতিবাদ করেছে, বলেছে ভারতের সঙ্গে এদেশের তুলনা কেন? ভারতে দাঙ্গা হয়েছে, ভারতের মসজিদ মন্দির নিয়ে। কিন্তু এদেশের মানুষ কেন ভারতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। আর তুলনাই বা হচ্ছে কেন?

এই অসাম্প্রদায়িক সুরঞ্জন পরে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে :

...শুধু তাই নয়, জনতা ব্যাঙ্ক, সোনালী ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্ক. শিল্প ব্যাঙ্কে কোনও এম ডি নেই হিন্দু সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর হিন্দু কেউ নেই, সোনালী ব্যাঙ্ক, অগ্রণী, শিল্প ও কৃষি ব্যাঙ্কের কোনও ডাইরেক্টর হিন্দু নেই। সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি না পায় তবে সংখ্যালঘুদের মানসিক নিরাপত্তা অর্জন করা খুব কঠিন হবে, শুধু মানসিকই নয়, শারীরিক নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে নিজের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারায় সুরঞ্জন। মায়ার ধর্ষণের কথা ভেবে প্রতিহিংস হতে চায় সে—একটি যে-কোনও মুসলমান-মেয়েকে ধর্ষণ করে চরিতার্থ করতে চায় প্রতিশোধস্পৃহা, আত্মবিস্মৃত হয়। তসলিমা লেখেন :

সুরঞ্জন রিক্সাকে বার কাউন্সিলের মোড়ে থামায়। থামিয়ে সিগারেট ধরায়। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি, হেঁটে হেঁটে একটি মেয়ে আসে, সুরঞ্জন ডাকে, এই।

বলতেই মেয়েটি রিক্সার পাশে এসে দাঁড়ায়, হাসে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি।

মেয়েটির বয়স উনিশ বিশ হবে। মুখে রঙ মাখিয়েছে, কিন্তু চেহারায় এক ধরনের সারল্য আছে। মেয়েটি হেসে বলে, পিংকি।

পুরো নাম বল।

শামীমা আক্তার।

বাবার নাম?

আবদুল জলিল।

বাড়ি?

ফেনী।

কি নাম যেন তোমার?

শামীমা।

ঠিক আছে রিক্সায় ওঠ।

শামীমা রিক্শায় ওঠে। রিকশাওয়ালাকে টিকুটুলির দিকে যেতে বলে সুরঞ্জন। শামীমার সঙ্গে সারা রাস্তা সুরঞ্জন আর কোনও কথা বলে না। তার দিকে তাকিয়েও দেখে না। এই যে মেয়েটি গা ঘেঁষে বসেছে, অযথা কথা বলছে, হাসতে হাসতে ঢলে পড়তে চাইছে সুরঞ্জনের গায়ে—সুরঞ্জনকে এসব কিছুই স্পর্শ করছে না। সে খুব মন দিয়ে সিগারেট ফোঁকে। নিজের ঘরটি বাইরে থেকে তালা দিয়ে এসেছে সে। সদর দরজায় ডাকাডাকি না করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে পড়া যায়। সুরঞ্জন ঘরে ঢোকে, পেছনে শামীমাও। সে আজ যা করছে, সুস্থ মাথায় করছে। আজ কোনওরকম নেশা করেনি। তার মস্তিষ্ক কোনও রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। ঘরে ঢুকে শামীমা একটু জোরে জোরেই কথা বলতে শুরু করে, সুরঞ্জন তাকে থামিয়ে বলে, চুপ। একটি কথা নয়। একেবারে চুপ।

ওঘর থেকে কোনও শব্দ আসে না। সম্ভবত ঘুমিয়ে গেছে ওরা, অবশ্য কান পেতে রাখলে টের পাওয়া যায় সুধাময় গোঙাচ্ছে। তারা কি বুঝতে পেরেছে তাদের মেধাবী পুত্রধন এ বাড়িতে একটি বেশ্যা নিয়ে ঢুকেছে। সুরঞ্জন অবশ্য শামীমাকে কোনও বেশ্যা ভাবছে না। ভাবছে একটি মুসলমান মেয়ে। একটি মুসলমান মেয়েকে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে ধর্ষণ করতে।

শামীমাকে ধর্ষণ করবে সে। স্রেফ ধর্ষণ। সে ঘরের বাতি নিবিয়ে দেয়। শামীমার শাড়ি কাপড় টেনে খুলে ফেলে, তার শ্বাস দ্রুত হয়, ধাক্কা দিয়ে শামীমাকে মাটিতে ফেলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুরঞ্জন। এর নাম আদর সোহাগ নয়, সুরঞ্জন বুঝতে পারে সে অযথাই মেয়েটির চুল ধরে হেঁচকা টান দিচ্ছে, সে মেয়েটির বুকের মধ্যে জোরে কামড় বসাচ্ছে, মেয়েটির তলপেটে, পেটে, উরুতে, ধারালো নখের আঁচড় দিচ্ছে। মেয়েটিকে তছনছ করে সুরঞ্জন ধর্ষণ করল। মেয়েটিও সম্ভবত এমন অদ্ভুত হিংস্র খদ্দের দেখেনি যে তাকে এমন কামড়ে ছেঁড়ে। শামীমা কাপড়-চোপড় গুটিয়ে দাঁড়ায়। সুরঞ্জন বড় শান্ত এখন। এই মেয়েটিকে এখন লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিলে তার আনন্দ হবে। তার শ্বাস আবার দ্রুত হয়, সে গলাধাক্কা দিয়ে মেয়েটিকে ঘরের বার করে দেবে ভাবে। তার বারবার মায়াকে মনে পড়ছে, মায়াকে কি ওরা সাতজনই ধর্ষণ করেছে? মায়ার খুব কষ্ট হয়েছে বোধহয়? মায়া খুব চিৎকার করেছে বোধহয়।

মায়ার চিৎকার কি কেউ শুনতে পায়নি? একটি প্রাণীও নয়? মায়া এই শহরের কোথায় আছে এখন? ছোট্ট একটি শহর অথচ সে জানে না তার প্রিয় বোনটি আঁস্তাকুড়ে পতিতালয়ে না বুড়িগঙ্গার জলে। কোথায় মায়া?

মেয়েটি সম্ভবত ভয় পেয়েছে সুরঞ্জনের আচরণে। কাপড়চোপড় দ্রুত পরে নিয়ে বলে, টাকা দেন।

খবরদার এক্ষুনি বের হ, সুরঞ্জন ধমক দেয়।

শামীমা দরজার দিকে এগোয়। সে আবার করুণ চোখে তাকায় সুরঞ্জনের দিকে। বলে, দশটা টাকা অইলেও দেন। সুরঞ্জনের সামান্য মায়া হয়। দরিদ্র একটি মেয়ে। সে হয়ত আজকের টাকা দিয়ে চাল কিনবে, ভাত রেঁধে খাবে। সুরঞ্জন প্যান্টের পকেট থেকে দশটি টাকা শামীমাকে দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে—

তুই তো মুসলমান, না?

হ্যাঁ।

তোরা তো আবার নাম পাল্টাস। নাম পাল্টাস নি তো।

না।

যা।

শামীমা চলে যায়। সুরঞ্জনের মনে বড় আরাম হয়।...আজ বিজয়ের দিন, আজ সকলে আনন্দোল্লাস করছে। একুশ বছর আগে এইদিনে স্বাধীনতা এসেছিল, এই দিনে শামিমা আক্তারও এসেছে সুরঞ্জন দত্তের ঘরে। বাহ্, স্বাধীনতা বাহ্!

যদিও এই জিঘাংসা শেষপর্যন্ত অসহায়তার দিকে নিয়ে যায় সুরঞ্জনকে। দাঙ্গার-বিরুদ্ধে-দাঙ্গা যে সঠিক রাজনীতি নয়, ধর্ষণের-বিরুদ্ধে-ধর্ষণ যে আসলে এক সর্বাত্মক ভুল, তাতে যে ধর্ষক ও দাঙ্গাকারী হয়ে যায় সুরঞ্জনও, এই বোধে তাকে পৌঁছে দিতে পারেন না তসলিমা। শেষপর্যন্ত সুরঞ্জনের ইন্ডিয়ায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখায়ই উপন্যাস শেষ করেন তসলিমা। বাস্তব এ-রকমই। কিন্তু, সাহিত্য তো নিজস্ব বাস্তবতার কথাও লেখে! আর সেই সাহিত্য-বাস্তবতার ছোঁয়া তসলিমার *লজ্জা*-য় অদৃষ্ট বলেই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি *লজ্জা*-কে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পেরেছিল। *লজ্জা*-র সাফল্য ও ব্যর্থতা এখানেই।

১৯৯৩ সালের অক্টোবরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তসলিমা নাসরিনের উপন্যাস *ফেরা*। ১৯৯৪-এর জানুয়ারিতে উপন্যাসটি কলকাতা থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। 'দেশ-ছাড়া মানুষদের' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন লেখক। এখানে লক্ষণীয় যে, *লজ্জা* উপন্যাসটিও প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে (ফেব্রুয়ারি)। অর্থাৎ, মনে হয়, *লজ্জা* লিখে তিনি বিতর্ক ও বহু-প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হয়েও ওই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনা থেকে মুক্ত হননি। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য *লজ্জা*-য় তিনি সুরঞ্জনের হিংস্রতার মাধ্যমে প্রকাশ করার পরে আবারও *ফেরা* উপন্যাসের কেন্দ্রে

আনলেন হিন্দু-সংখ্যালঘুর সামাজিক-মানসিক সঙ্কটকেই।

ময়মনসিংহের ভিটেমাটি, নদী, বাতাস আর প্রিয়জনদের ছেড়ে একদিন কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল তরুণী কল্যাণীকে। ক্রমশ সেখানেই তার ডালপালা, পত্রপুষ্প, সুখদুঃখ ছড়িয়ে যায়। তবু সেই স্মৃতিময় ভূমি আর নিজের-শিকড়-প্রোথিত আবহের জন্য তার অন্তর্গত টান টের পায় সে। কল্যাণীর মনে থাকে, সে প্রেমিক বাদলকে আর প্রিয় বন্ধুদের কথা দিয়েছিল ফিরে যাবে। সেই স্মৃতি আর শিকড়ের টানে সে একদিন, অবশেষে, তিরিশ বছর পর, ফিরে যায় ময়মনসিংহে। আর, সেই ফেরার প্রেক্ষিতেই তসলিমা দেশবিভাগ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তাৎপর্যের নানা টুকরো ছবি, ঘটনা, সংলাপ লিখেছেন এই হৃদয়স্পর্শী উপন্যাসে।

যেমন :

(সৌমিত্র) *কল্যাণীকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল—'তোমাদের দেশের ওরা তো উর্দু বলে তাই না?'*

কল্যাণী বলেছিল—পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা বলে।

—আর ইস্টের নন-বেঙ্গলিগুলো?

—ইস্টে আবার নন-বেঙ্গলি কোত্থেকে আসল?

—আই মিন মুসলমানরা?

—ওরা উর্দু কইব কেন? ওরা তো বাঙালি!

—বাঙালি? সৌমিত্র যেন একটি অসম্ভব সংবাদ শুনেছে এমন মুখ করে তাকিয়েছিল।

অন্যত্র :

কল্যাণী দেশভাগের সবটুকু যন্ত্রণা নিজে ভোগ করেছে। সে বোঝে হরিনারায়ণ কেন দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। এই দেশ থেকে উর্দুঅলা মুসলমানদের তাড়ানো হল, নিজের দেশ থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তবে কেন চলে যেতে হয়েছিল হিন্দুদের?...কল্যাণী এই ভেবে গর্ব অনুভব করে, ভারত যারা ভেঙেছিল, যারা এই দেশকে মুসলমানের হোমল্যান্ড করেছিল, যাদের কূটবুদ্ধি এই দেশের মানুষকে দেশছাড়া করেছে, তাদের গালে কড়া একটি থাপ্পড় মেরেছে একাত্তরের পাকিস্তানি খেদানো যুদ্ধ, প্রমাণ করেছে এই দেশ বাঙালির, মুসলমানের নয় ; ভাষা এখানে বড়, ধর্ম নয়।

কিন্তু, সেই 'বাঙালির' দেশে পৌঁছে স্বপ্নভঙ্গ হয় কল্যাণীর :

...বড়বাজারে যে একটি মন্দির ছিল, সেটি কোথায়—হুডখোলা রিক্সায় বসে আশেপাশে খোঁজে কল্যাণী। বড় একটি ঝকমকে মিনার চোখে পড়ে। কল্যাণী জিজ্ঞেস করে—ওটি কি মন্দির নাকি?

রিক্সাওয়ালা ধমকে ওঠে—মন্দির মানে? ওইটা বড় মসজিদ।

—এখানে যে একটি মন্দির ছিল, ওটি কোথায়?

—মন্দির? মন্দিরের খোঁজ দিতে রিক্সাঅলার উৎসাহ নেই তেমন।

আবার :

...লোকগুলো নিজেদের মধ্যে বলতে থাকে—মেয়েলোকটা কে, কান্দে কেন?

কেউ বলে—আরেকদিনও আইছিল, হিন্দু।

শুনে একজন বলে—হিন্দু বেটি এইখানে আইসা কান্দে কেন?

একজন মিনমিন করে বলে—ইন্ডিয়া থেইকা আইছে, বাড়িঘর নাকি এইখানে ছিল।

—এইখানে ছিল? এইখানে বাড়ি আবার কবে ছিল? ব্রিটিশ আমলে?

...

—থাকলে ছিল। কত কারও তো ছিল।...ইন্ডিয়া থেইকা মুসলমানরা আসে নাই সব ছাইড়া-ছুইড়া?

...

একটি ভারী কণ্ঠ আর সব সংলাপ হটিয়ে দিয়ে বলে—যতসব ফাইজলামি, থাকতে চায় ইন্ডিয়ায় আবার দেশের ভাগটাও লইতে চায়।

বুড়োমত একজন কাছে এসে বলে—কী নাম তোমার মা? বাবার কী নাম? কত দূর থেকে আসছ মা, কারও বাসায় বস, খাওয়াদাওয়া কর। এইসব কী শুরু হইছে এইখানে, মানুষ তো না এরা, সব অমানুষ হইয়া গেছে। সব অমানুষ। বাড়িঘর না থাক মা, দুইটা ভালমানুষ তো এখনও আছে দেশে। নইলে দেশ কি কইরা টিইকা আছে কও।

স্মৃতি-সমৃদ্ধ দেশে ফিরে কল্যাণীর ক্রমশ স্বপ্নভঙ্গ হতে থাকে :

রাস্তায় আধময়লা জামা পরা কিছু বাচ্চাছেলে খেলা করছিল, তারা খেলা থামিয়ে তাকিয়ে থাকে কল্যাণীদের দিকে। কী করুণ ওদের মুখ, চোখ বসে গেছে কোটরে, চোয়াল ভাঙা, পাঁজরের হাড় গোনা যায়, ম্যালনিউট্রিশানে ভুগছে সবকটি শিশু...ওদের দেখে বড় মায়া হয় কল্যাণীর।

হঠাৎ ওরা হেসে ওঠে, সবকটি মলিন শিশু হাসিতে ঝলকায়, আর চেঁচিয়ে বলে—'হিন্দু হিন্দু তুলসীপাতা, হিন্দুরা খায় গরুর মাথা।'

কল্যাণীর গা কেঁপে ওঠে। স্বপনের দিকে আড়চোখে তাকায় সে, নিজের জন্য নয়, তার লজ্জা হয় স্বপনের কথা ভেবে। স্বপন নিশ্চয়ই কুঁকড়ে যাচ্ছে শঙ্কায়, সঙ্কোচে। অনেকটা পথ নিঃশব্দে হাঁটে তারা, পিছনে তখনও 'হিন্দুরা খায় গরুর মাথা'র হৈ হৈ রব, অবোধ জিভের উচ্চারণ।

শেষপর্যন্ত :

আতাহরের কণ্ঠে কিছু শ্লেষ কিছু অহঙ্কার খেলা করে—আমাদের টেলিভিশন

দেখছেন নাকি? ভাল নাটক হয় কিন্তু। আইজও আছে নাটক, আসেন, দেখেন। বাবার মসজিদের খবর-টবরও কন। ওই দেশে তো আপনারা আমাদের কচুকাটা করতাছেন।

—আপনাদের মানে? কল্যাণী জিজ্ঞেস করে?

—আমাদের মানে মুসলমানদের আর কী।

পোলাও মাংসের ওপর যে আঙুলগুলো নড়ছিল কল্যাণীর, আর নড়ে না। ঢকঢক করে জল খায় সে। কতদিনের তৃষ্ণা তার জলের, তৃষ্ণা তবু মেটে না। দীপনের খাওয়া হয়ে গেলে শুতে যায় ঘরে। কল্যাণী হঠাৎই বলে—শরীরটা ক্লান্ত লাগছে শরিফা। তুই খেয়ে নিস। আমি বরং শুয়ে পড়ি।

এখানেই যেন কল্যাণী নিজের ভুল বুঝতে পারে। বোঝে, স্মৃতি আসলে স্মৃতিই। তার উপর সময়ের পলি পড়ে। সময়, কালবেলা, ধর্ম তছনছ করে দেয় স্মৃতি, সত্তা। ফেরা যে খুব সহজ নয়, তা অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝে কল্যাণী। পৃথিবীর যে-কোনও শিকড়হীন মানুষের মতো সে তারপর ফেরে নিজস্ব প্রবাসে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান-বাঙালির অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-বাঙালির অভিজ্ঞতাকে একাকার করে দেয় ওই কালবেলা, ধর্ম। তসলিমার দুটি উপন্যাস হয়ে ওঠে সেই নষ্ট সময়ের অনন্য অভিজ্ঞান।

মহাধর্মের গল্প : রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ছোটগল্পের সূচনা, আমরা সকলেই জানি, হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই হাতে। বাংলায় নানা আখ্যানধর্মী রচনা আগে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো-ছিটানো থাকলেও রবীন্দ্রনাথের লেখনিতেই তা সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি রচনায় ছোটগল্পের সামান্য স্ফুরণ লক্ষিত হলেও, রবীন্দ্রনাথের আগে কোনও লেখকই এই সাহিত্যধারাটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। উপন্যাসের আকার সঙ্কুচিত হলেই যে তা ছোটগল্প হয় না, বা ছোটগল্পের আকৃতি স্ফীত হলেই যে তা উপন্যাস-পদবাচ্য হয় না, তা বোঝা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং ছোটগল্প পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে।

আধুনিক যুগেব ভাবধারার পরিপূরক হয়ে উঠেছিল বাংলা ছোটগল্প, অবশ্যই ইউরোপীয় প্রয়াস ও ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে। যুগের প্রয়োজনে, মানুষ যখন উপন্যাসের কলেবর আর মহাকাব্যের কলরবে ঈষৎ ক্লান্তবোধ করেছে, তখন ছোটগল্প স্বল্প পরিসরে, সংক্ষিপ্ত বিচ্ছুরণে অধিকার করে নিয়েছে মানুষের মন। যদিও, সে-জন্য উপন্যাসের মহত্ত্ব বা অস্তিত্ব মোটেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং উপন্যাসের নানা বিকাশ আরও বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু সাময়িক উপন্যাস-অনীহায় ছোটগল্পের যে-সূচনাটি হয়ে গিয়েছে, তাতে আরও শস্যশ্যামল হয়েছে সাহিত্যের সামগ্রিক ধারাটিই। উপন্যাস এবং ছোটগল্প সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে, হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেই আমরা প্রথম চিনে নিলাম এই শাখার অসীমতা। সমালোচকদের মতে তিনিই ছোটগল্পের 'পথনির্মাতা' ও 'শ্রেষ্ঠ শিল্পী'। বস্তুত, গীতিকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের এক অন্তর্নিহিত সাযুজ্য থাকে বলেই যেন রবীন্দ্রনাথ এই শাখাটিতে সবিশেষ সাফল্য দেখাতে পেরেছিলেন। উপন্যাসে তিনি যতটা স্বচ্ছন্দ ও সফল, ছোটগল্পে তিনি তার চেয়ে অনেকবেশি প্রবহমান। *হিতবাদী* পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক থাকাকালীন তিনি ওই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি করে ছোটগল্প লিখেছিলেন। পরে, শিলাইদহে জমিদারির কাজে ব্যাপৃত থাকাকালীন তিনি অজস্র গল্প লিখেছেন। *সাধনা* পত্রিকায় বেরিয়েছিল তাঁর অসংখ্য গল্প। তিনখণ্ড *গল্পগুচ্ছ*-সংকলনে বিবৃত রয়েছে সে-সব অসামান্য গল্পমালা।

বিশিষ্ট সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানুষ প্রকৃতি এবং রহস্যলোকের অতিপ্রাকৃত ভাবের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। আমাদের ও নাগরিক জীবনের নানা ছবি, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনধরা দশা, পারিবারিক বিরোধ, স্নেহ-প্রেমের সংঘাত ও সঙ্কট, নানাধরনের ধর্মীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংস্কারের সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধ, পরিশেষে মানবধর্মের জয় ইত্যাদি বাঙালী-জীবনের নানা ধরনের ছোট বড়ো*

> *কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তিনি গোটা বাঙালী-জীবনকে দেখেছেন। সে জীবন কলকাতার নাগরিক জীবন হতে পারে, আবার গ্রাম্যজীবন হতেও বাধা নেই।*

ছোটগল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সাফল্য টলস্টয়, মোপাসাঁ, চেকভের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর গল্পের গভীরতা এবং বিস্তার এতটাই যে আজও সে-সব গল্পের প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে অনুভব করা যায়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। এইসব গল্পে দুই সম্প্রদায়ের আপাত-বিভেদ ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে মানবতাবোধ, তথা পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত আবেগ ও জটিলতা, তথাকথিত ধর্মীয় বিভেদের অন্তঃসারশূন্যতা।

সমস্যাপূরণ, দুরাশা, মুসলমানির গল্প ইত্যাদি গল্পে রবীন্দ্রনাথ দুই সম্প্রদায়ের সংস্কারগত বিভেদকে যেমন প্রকাশ করেছেন খুবই সহজ-স্বাভাবিকতায়, তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন মানবিকতার, মহামিলনের। সাধারণভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলমান-চরিত্রের বিকাশ লক্ষিত হয়। কিন্তু, এক উদার আকাশের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা লিখেছেন। কেবল লেখেননি, বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় তিনি হিন্দু-মুসলমানের রাখিবন্ধনের আয়োজন করেছিলেন। আমরা এই রচনার পূর্বাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে, উপন্যাসে তাঁর মিলন-প্রত্যাশার নানা উৎসার লক্ষ করেছি। মুসলমান-সমাজকে তিনি 'উদার বিশ্বাত্মবোধে উদ্দীপ্ত মানসিকতায়' দেখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। *শুচি* কবিতার কবীর, *রঙরেজিনী* কবিতার রঙরেজ জসিম ও তার কন্যা আমিনার মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই মানসিক বিস্তারের ছবিটি দেখেছি। তাঁর উপন্যাসেও আমরা লক্ষ করেছি অনুরূপ স্ফুরণ। ছোটগল্পেও তিনি লিখেছেন দুই সম্প্রদায়ের মানসিক সংঘাত আর জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতের চিত্র, যা শেষপর্যন্ত এক মহাধর্মের দিকে নিয়ে যায় আমাদের।

বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ মুসলমান-সমাজের কাছাকাছি হয়েছিলেন ১৮৯১ সালে পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে জমিদারির কাজ দেখাশোনা করতে গিয়ে। এই সময় থেকেই তিনি তাদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পের রচনাও এ-সময়। পদ্মাপাড়ের জীবনকে, সেখানকার ছোট-ছোট সুখদুঃখচিত্রকে তিনি এই নতুনতর সাহিত্যমাধ্যমে রূপ দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের রায়তদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান-সমাজভুক্ত। জমিদারির কাজের সূত্রে তিনি এই সম্প্রদায়কে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। সঙ্গত কারণেই তিনি তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলেন। কিন্তু, আমাদের স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, বৃহত্তর মুসলমান-সমাজ তাঁর গল্পগুচ্ছে সবিশেষ গুরুত্বে আভাসিত হয়নি। সম্ভবত, তিনি মুসলমান-সমাজকে দেখেছিলেন অনেকটাই বাইরে থেকে। ফলে তাঁর পক্ষে ওই সমাজের অন্তর্নিহিত অভিঘাতগুলি বোঝা সে-ভাবে সম্ভব হয়নি। রোমান্স এবং কল্পনার বিস্তার দিয়ে তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন অভিজ্ঞতার অভাব।

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ *দালিয়া* গল্পটি লেখেন। ওই গল্পেই প্রথম মুসলমান-চরিত্রের

অবতারণা করেন তিনি। কিন্তু, ওই পর্যন্তই। বৃহত্তর মুসলমান-সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা-বেদনা, অ-মুসলমান-সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপোড়েন এই গল্পে বিন্দুমাত্র আভাসিত নয়। অবশ্য, এই গল্পে রোমান্সই রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন। পূর্ববঙ্গগীতিকার কাহিনি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ *দালিয়া* গল্পটি লিখে থাকতে পারেন। গীতিকায়-বিবৃত করুণ-পরিণামী গল্পটিকে মধুর পরিণামে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি।

দালিয়া গল্পটি ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা শাহ সুজার কন্যা আমিনা আর দালিয়া নামে এক ধীবর-যুবকের প্রণয়ের আখ্যান। আমিনা ভাগ্য-বিপর্যয়ে এক ধীবর-পরিবারে পালিত হয়েছিল। দালিয়ার সঙ্গে সেখানেই সে প্রণয়-সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনা-পরম্পরায় দালিয়ার আরাকান-রাজপুত্র পরিচয়টি প্রকাশ করেন লেখক। শাহ সুজার শত্রু আরাকান-রাজার পুত্র দালিয়া আমিনার পাণিপ্রার্থী হলে শত্রুপক্ষীয় পাণিপ্রার্থীকে বোন সুলেখার পরামর্শে হত্যা করতে গিয়ে আমিনা চিনতে পারে পূর্ব-প্রণয়ীকে। মিলন তখন অবশ্যম্ভাবিতায় পৌঁছয়।

এই গল্পে রোমান্সের ইচ্ছাপূরণ থাকলেও, মুসলমান-জনজীবন-তথা-বাদশাহি জনজীবনের কোনও বাস্তব-চিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকেননি। আমিনার মনে প্রেমিকের পরিবর্তে রাজপুত্রকে বিয়ে করার দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু মুসলমান-হিন্দুর প্রণয়-সম্পর্কের জটিলতাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি রবীন্দ্রনাথ। আমিনার মধ্যে ধীবরকন্যা-রাজকন্যার টানাপোড়েন রয়েছে, কিন্তু ধর্মীয় দ্বৈততার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। অথচ, এই রোমান্স-নির্ভর আখ্যানের মধ্যেও সেই দ্বন্দ্ব দেখানোর সুযোগ যথেষ্টই ছিল।

খুবই দ্রুত-কথনের ভঙ্গিতে রচিত *দালিয়া* গল্পটির একেবারে সূচনায়ই আমরা হিন্দু-রাজা ও মুসলমান-সম্রাটের যে-ভেদাভেদের চিহ্ন লক্ষ করি, তাকে রবীন্দ্রনাথ কাহিনিতে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। আরাকান-রাজের বিবাহ-প্রস্তাবে যেমন ধর্মকে গুরুত্ব না-দেওয়ার বিশেষত্ব-তথা-হিন্দু-রাজার মুসমলান-নারী-জয়ের অভীপ্সা চিহ্নিত থাকে, শাহ সুজার তা প্রত্যাখ্যান করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ধর্মই। এই ধর্মীয় অধিকারলিপ্সাই যেখানে গল্পটির কেন্দ্রবিন্দু, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ গল্পটিকে কেন্দ্রচ্যুত করেন যেন রোমান্স-রচনার ভাবাবেগেই। গল্পের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> *পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকানরাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপুত্রদের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে, একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরেন। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায়, এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।*

এখানে আমরা সুজা ও আরাকান-রাজের সহযোগিতা ও শত্রুতার যে-সম্পর্ক লক্ষ করি, তা আসলে সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের সম্পর্ক। পরে গল্পে সেই দ্বন্দ্বই আরও তীব্র ও গভীর হয়েছে। যদিও, রবীন্দ্রনাথ সেই সম্পর্কের দিকে পাঠকের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করাননি। রোমান্সের নিয়মে একরৈখিক কাহিনি বয়ন করেছেন, যার অন্তে মুসলমান-কন্যা আমিনা হিন্দু-প্রণয়ী দালিয়ার প্রেম-ক্রোড়ে পরম আশ্রয় পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়।

১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ *রীতিমতো নভেল* ও *কাবুলিওয়ালা* গল্পদুটিতে মুসলমানি প্রসঙ্গ ও চরিত্রের অবতারণা করেছেন। *রীতিমতো নভেল* গল্পে ললিত সিংহের বিক্রমকে গৌরবান্বিত করার জন্য সূচনায় মুসলমান-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

> *'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিনলক্ষ যবনসেনা, অন্যদিকে তিনসহস্র আর্যসৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থবৃক্ষের মতো হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেইসঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং আজিকার ওই অস্তাচলবর্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।*
>
> *হর হর বোম্ বোম্। পাঠক বলিতে পার, কে ওই দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশজন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল? —কাহার বজ্রমণ্ডিত 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে তিনলক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল?*

এই তথাকথিত ইতিহাস-বর্ণনায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ছায়া লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সচেতনভাবেই এই অংশে বঙ্কিমের অনুসরণ করেছিলেন। এই অংশে 'আল্লা হো আকবর' আর 'হর হর বোম্ বোম্' ধ্বনির মাধ্যমে তিনি যে-ভাবে দুই যুযুধান সম্প্রদায়ের চিত্রটি পরিস্ফুট করেছেন, তা স্বাভাবিক। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও যে-ভাবে 'যবন' ও 'ম্লেচ্ছ' শব্দদুটি প্রয়োগ করেছেন, তাতে তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে পক্ষপাতই যে প্রকট হয়ে উঠেছে, এ-কথা অস্বীকারের নয়। যদিও কল্পকাহিনির (*রীতিমতো নভেল* নামকরণটি লক্ষণীয়) পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান-প্রসঙ্গ একেবারেই উহ্য রাখায়, গল্পের উদ্ধৃত সূচনাংশটি সামান্য বিচ্ছিন্ন মনে হয়।

একই-বছরে-লেখা *কাবুলিওয়ালা* গল্পের রহমত মুসলমান হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিরকালীন স্নেহাতুর পিতা-রূপেই এঁকেছেন। যেন সে মুসলমান নয়, নৃশংস খুনি নয়, সে চিরন্তন মানুষ, হৃদয়ী পিতা। ধর্ম, স্থান, কাল, পাত্র সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে সেই আপাত-নির্মম মানুষটি সুদূর-কাবুলে-ফেলে-আসা নিজের শিশুকন্যাটির সঙ্গে কলকাতার হিন্দু-সন্তান

মিনিকে মিলিয়ে নিতে পারে—শাশ্বত পিতৃস্নেহে আপ্লুত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ অন্তঃপুরের আপত্তির প্রসঙ্গটি একটিমাত্র বাক্যেই নিহিত রেখেছেন। হিন্দু-সম্ভ্রান্ত পরিবারে শুভকাজে বিধর্মীয় কাবুলিওয়ালা স্বাভাবিক সংস্কারেই অবাঞ্ছিত। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ সেই আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে জেল-ফেরত রহমত আর বধূবেশী মিনিকে মুখোমুখি দাঁড় করাতে পেরেছেন—তা যতটা গল্পের খাতিরে, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবিকতার খাতিরে। এই মানবিকতারই জয়গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যসমগ্রে।

১৩০০ সালে প্রকাশিত *সমস্যাপূরণ* গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের অন্তঃসারশূন্যতার অতুলনীয় চিত্র এঁকেছেন। গল্পটি সমকালে হিন্দু-রক্ষণশীলদের অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। অছিমুদ্দি বিশ্বাসের দানের জমি মামলা করে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল ঝিঁকড়াকোটার জমিদার কৃষ্ণগোপালের পুত্র বিপিনবিহারী। মুসলমান-প্রজার প্রতি হিন্দু-জমিদারের এই আচরণ সে-সময়ে ছিল খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে বিবদমান অছিমুদ্দি আর বিপিনবিহারীর মধ্যে স্থাপন করেছেন অছিমুদ্দির মা মির্জা বিবিকে, যে বিবদমান পুত্র ও পুত্রবৎকে মেলাবার চেষ্টা করে :

মির্জাবিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারি কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গোপনে বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভালো করুন। বাবা, অছিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম—তাহাকে নিতান্তই অবশ্যপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করো—সে তোমার অসীম ঐশ্বর্যের ক্ষুদ্র এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ন হইয়ো না বাপ।"

গল্পের শেষাংশে আসল মোচড়টি দেন রবীন্দ্রনাথ। হিন্দু-রক্ষণশীল-সমাজের প্রতিভূ কাশীবাসী কৃষ্ণগোপালের সঙ্গে মির্জা বিবির অবৈধ প্রণয়-সম্পর্কটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। কৃষ্ণগোপাল অছিমুদ্দিকে বিপিনবিহারীর কোপ থেকে রক্ষা করতে পুত্রকে জানিয়ে দেন অছিমুদ্দি তাঁরই ঔরসজাত সন্তান।

গল্পটি রবীন্দ্ররচনাপ্রবাহে যথেষ্ট দুঃসাহসিক। হিন্দু-জাতীয়তাবাদ যখন মুসলমান-সম্প্রদায়কে যথেচ্ছ হেয় প্রতিপন্ন করে চলেছিল, ক্রমশই তিক্ত হচ্ছিল দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক, সে-সময় হিন্দু-জমিদার আর মুসলমান-যুবতীর অবৈধ প্রণয়-তথা-শরীর-সম্পর্ক বিষয়ে গল্প লেখা রীতিমতো দুঃসাহসিক সন্দেহ নেই। অহং-সর্বস্ব হিন্দু-সমাজ এর ফলে যথাবিহিত ক্ষিপ্ত হয়েছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন :

> *যখন পুত্রের জন্মদাতা স্বয়ং কৃষ্ণগোপাল যে কথাটা ছেলেকে নির্জন বটতলায় ডাকিয়া 'কম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে', 'কম্পিত স্বরে' চুপি চুপি এবং আবশ্যক হইলে লোকের কাছে বলিতে বলিয়াছিলেন, সে কথাটা রবীন্দ্রবাবু স্থির অঙ্গুলিতে লেখনী ধরিয়া অকম্পিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার এমন কি আবশ্যকতা অনুভব করিলেন? বলা বাহুল্য যে, বর্তমান গল্পের বিষয় রবীন্দ্রবাবুর মত লেখকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।*
>
> —*উদ্ধৃত, রবীন্দ্রজীবনী, প্রশান্ত পাল*

মুসলমান-চরিত্র ও আবহে রবীন্দ্রনাথ *ক্ষুধিত পাষাণ* গল্পটি লিখেছিলেন ১৩০২ সালে। এক নির্জন, পরিত্যক্ত প্রাসাদ এবং তার অনুষঙ্গে যে-কল্পকাহিনির বিস্তার, তাতে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনা এবং কল্পনার বিস্তার একাকার হয়ে গিয়েছে। মুসলমান-সংস্কৃতি ও জীবনধারা বিষয়ে তাঁর কৌতূহলের প্রকাশও এই গল্পটি। উত্তম-পুরুষে-লিখিত এই গল্পটি এক রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করে আমাদের সামনে। গল্পের নায়ক 'শ্রীযুক্ত অমুক' সেই রহস্যের দিশা পেতে নিজেকে পাল্টে ফেলেন মুসলমানি সাজে, কেতায়, চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> *সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যান্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোখা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া, বহুযত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোন এক প্রিয় সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।*

বস্তুতপক্ষে, এই অলীক গল্পটির আধারে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমরা দেখেছি, এই গল্প লেখার আগে, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরূপ আগ্রহের কথা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবীকে :

> *সেই পারস্য এবং আরব দেশ ডামাস্ক, সমরকন্দ, বুখারা, আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, সিরাজের মদ, মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সোওয়ার,*

পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস...এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত, এই ঐশ্বর্যময়, সৌন্দর্যময়, অথচ ভয় ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে মানুষের হাসি কান্না সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।

—ছিন্নপত্র

সেই সম্ভব-অসম্ভবেব গল্পই *ক্ষুধিতপাষাণ,* যা সুদীর্ঘকাল পরে আজও আমাদের কাছে অন্য মাত্রায় আভাসিত হয়।

১৩০৫ সালে সিপাহি-বিদ্রোহের পটভূমিকায় হিন্দু-নায়কের প্রতি মুসলমান-নায়িকার প্রেম-নিবেদন এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জটিলতা ও বিষাদের কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের *দুরাশা* গল্পে। এই গল্পের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা ইচ্ছাপূরণের অনুগামী হয়েছিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান সংস্কৃতি, ধর্ম এবং জনজীবনকে মেলাবার যে-আদর্শবাদ তাঁর মধ্যে আজন্ম-সঞ্চারিত ছিল, সেই বাস্তবতারহিত ভাবাবেগের তাড়নায় তিনি মুসলমান-কন্যাকে শিবানন্দ স্বামীর অনুমোদন-সাপেক্ষে শাস্ত্রের পাঠ সম্পূর্ণ করিয়ে তাঁকে 'মুসলমানব্রাহ্মণী'-র রূপান্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সংগীত যেন একেবারে এক মুহূর্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া-চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জোড়করে ঊর্ধ্বমুখে নবোদিতসূর্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্তবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোরাগে ভজনগান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

আমি মুসলমানবালিকা ছিলাম কিন্তু কখনো স্বধর্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্মসংগত উপাসনাবিধিও জানিতাম না, তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপুরের প্রমোদভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধকরি স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন, অথবা আর-কোনো নিগূঢ় কারণ ছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নির্জন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের পূজার্চনাদৃশ্যে আমার সদ্যসুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধুর্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনু

দেহখানি ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত, ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমানদুহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্মপার্বণ উপলক্ষ্যে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া বলিতাম, 'তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত, 'কেশরলালঠাকুর কাহারো অন্নগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।'

এই রূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোরূপ ভক্তিচিহ্ন দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্বপুরুষের কেহ-একজন একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম, এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বন্ধে কল্পনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্যকাহিনী, রামায়ণমহাভারতের সমস্ত অপূর্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম, শুনিয়া সেই অবরুদ্ধ অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দুজগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইত। মূর্তিপ্রতিমূর্তি, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম, অগুরুচন্দনমিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগীসন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতিপুরাতন অতিবিস্তীর্ণ অতিসুন্দর অপ্রাকৃত মায়ালোকে সৃজন করিত, আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দুসংসার আমার বালিকাহৃদয়ের নিকট একটি পরমরমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দুস্থানে হিন্দুমুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন। তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো একটি বিশেষ কুটুম্বসম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, 'উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে

না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না, আমি কোম্পানিবাহাদুরের সহিত লড়িব না।'

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দুমুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, 'নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।'

পিতা বলিলেন, 'সে-সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।'

কেশরলাল কহিলেন, 'ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।'

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না। কহিলেন, 'যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতকিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন, আনন্দে আমার ভূষণাবিহীন প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

পরবর্তী সময়ে :

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কৈশরলাল, সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনাতীরের আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম, সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম, শুনিলাম নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন 'জল'।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের নিমীলিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বামচক্ষু নষ্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনা হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর জল দিব?' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি?' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধীনা আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী। মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি মূর্ছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী, প্রথমদিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি, তখনো বহিরাকাশের লুব্ধ তপ্ত সূর্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই, সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।"

আরও পরে :

হিন্দুশাস্ত্রে আছে জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে, মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে-কথার কোনো উল্লেখ নাই, তাহার একমাত্র কারণ তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তৎপূর্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তিলাভ করিলাম।

এই গল্পেও সমকালীন হিন্দু-সংস্কারকে আঘাত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু, তিনি যে-ভাবে মুসলমান-রমণীকে ব্রাহ্মণ্য সাধনার মাধ্যমে হিন্দুত্বের অধিকারে উন্নীত

করতে চেয়েছেন, তা যেমন বাস্তবতারহিত, তেমনই সেই রূপান্তর মুসলমানি স্বাতন্ত্র্যের প্রতি যথেষ্ট অবিচারই করে।

দুরাশা গল্পটির বিপরীতমুখী আখ্যান *মুসলমানীর গল্প* (১৩৬২)। এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের চিরকালীন ধর্মনিরপেক্ষ, মিলন-ভাবনার আদর্শায়িত আখ্যান। *দুরাশা* গল্পটিতে তিনি যেমন নবাবকন্যাকে 'মুসলমানব্রাহ্মণী' করে তুলেছিলেন, আলোচ্য গল্পের হিন্দুকন্যা কমলাকে তিনি বিপরীতভাবে করে তুলেছেন মেহেরজান—দুই ধর্মের সম্মিলন।

বিয়ের পর কমলা শ্বশুরালয়ে যাওয়ার পথে বনপথে দস্যুকবলে পড়ে বিচ্ছিন্ন হল নিজের সম্প্রদায় থেকে। তখন 'পয়গম্বরের মতো' বৃদ্ধ হবির খাঁ তাকে উদ্ধার করে আশ্রয় দেন। ক্রমশ, ঘটনাচক্রে, হবিরের ছেলে করিমের সঙ্গে কমলার প্রণয় গড়ে ওঠে। মুসলমানের আটমহলা বাড়ির হিন্দু-মহলে কমলাকে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যে থাকতে দিয়েছিল হবির খাঁ। কিন্তু প্রণয়ের টানে সে সেই তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যকে তুচ্ছই মনে করল।

রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে তাঁর আদর্শায়িত ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনা আরোপ করেছেন হবির খাঁ চরিত্রে। ডাকাতদের কবল থেকে কমলাকে বাঁচাবার পর :

> *...হবির এসে কমলাকে বললে, "তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চল আমার ঘরে।" কমলা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠল। হবির বললে, "বুঝেছি তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে কিন্তু একটা কথা মনে রেখো যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চল তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব।" কমলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল, "দেখ, আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় করো না।" হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আটমহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা। একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, "মা হিন্দুর ঘরের মতো এ জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।"*

করিমের সঙ্গে সম্পর্কের নিবিড়তার পর :

> *(কমলা) হবির খাঁকে একদিন বললে—"বাবা আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আঁস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি ত দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজো আমি ভুলতে পারিনে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম বাপজান তোমার*

ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা, তিনি হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি, আমার ধর্মকর্ম ওরি সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না ; আমার না হয় দুই ধর্মই থাকল।"

ধর্ম-বিভক্ত এই সমাজে এহেন 'দুই ধর্ম' থাকা কতখানি বাস্তব, সে-প্রশ্ন এই গল্পে অবান্তর হয়ে যায়। আমরা গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ-ভাবনার রূপক হিসাবেই গ্রহণ করি। ফলে, রবীন্দ্রনাথ কমলাকে যে-ভাবে করে তুলেছেন মেহেরজান, তাকে রবীন্দ্রনাথের মহাধর্ম-ভাবনার সূত্রে আমাদের খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না।

ধর্ম-নিরপেক্ষতা : রবীন্দ্র-পরবর্তী গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময়ে শরৎচন্দ্র বাংলার মুসলমান-সমাজকে তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে মুসলমান-চরিত্র নিয়ে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে গল্প বা উপন্যাস না-লিখলেও, বিচ্ছিন্নভাবে অনুরূপ প্রসঙ্গ রয়েছে তাঁর নানা রচনায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রসঙ্গ আমরা আগে আলোচনা করেছি। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে *মহেশ* গল্পটির কথা আমাদের মনে থাকেই।

সমকালে *মহেশ* গল্পটিকে 'মুসলমানের গো-হত্যা'র অপরাধ-বিচারের আলোকেই দেখা হয়েছিল। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, গল্পটি আর্থিক অসাম্যের বাস্তবতা-বিবৃত এক করুণ ও আত্মধ্বংসী আখ্যান। কৃষিজীবীর শ্রমিক হয়ে ওঠার অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে হিন্দু-সামন্ততন্ত্রের শোষণ ও ধর্মকে সেই শোষণের অন্যতম উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন শরৎচন্দ্র। দারিদ্র্যের অপমান থেকে যে-অক্ষম ও আকস্মিক ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেই ক্রোধের বশবর্তী হয়েই *মহেশ* নামে পালিত জীবটিকে হত্যা করেছিল গফুর। এখানে কোনও সাম্প্রদায়িক ক্রোধ আদপেই ক্রিয়াশীল ছিল না। বরং দারিদ্র্যের মধ্যে মহেশকে বাঁচিয়ে রাখতে সে যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে গিয়েছে, তেমনই মহেশের মৃত্যুতে তীব্র আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছে সে। রবীন্দ্রনাথের *শাস্তি* গল্পটির সঙ্গে *মহেশ*-এর যেন এখানে একটি ক্ষীণ মিল রয়েছে। *মহেশ* গল্পটি নিয়ে সমকালে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিস্তর বাদানুবাদ হয়েছিল। *মুসলিম সাহিত্য সমাজ* বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন :

> *...'মহেশ নামে আমার লেখা একটি ছোট গল্প আছে, সেটি সাহিত্যপ্রিয় বহু লোকেরই প্রশংসা পেয়েছিল। একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি Matric-এর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। আবার একদিন কানে এলো সেটি নাকি স্থানভ্রষ্ট হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোন যোগ নেই, ভাবলাম এমনিই হয়তো নিয়ম। কিছুদিন থাকে, আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে নাকি গো-হত্যা আছে। আহা! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে।*
>
> ...
>
> *উপরি-উক্ত হিন্দু মুরব্বীর মত আবার মুসলমান মুরব্বীও আছেন। শুনেছি তাঁরা নাকি আদেশ করেন ইতিহাস ফরমায়েশ মত লিখতে। ইসলাম-ধর্মী কোন ব্যক্তি কোথাও অন্যায়-অবিচার করেছেন এর লেশমাত্রও যেন কোন পড়ার বইতে না থাকে। এখানেও সান্ত্বনা এই যে, এদের কেউ কখনো কোনকালে সাহিত্য-সেবা করেননি। করলে এমন কথা মুখে আনতে পারতেন না। সত্যিকার*

সাহিত্যিকদের হাতে যদি এই ভার পড়ে, আমার বিশ্বাস, না-হিন্দু, না-মুসলিম কোন পক্ষ থেকেই বিন্দুমাত্র অভিযোগ শোনা যাবে না।

শরৎচন্দ্র *মহেশ* গল্পটি লিখে যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল অংশের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, তা লেখকের উদ্ধৃত বক্তব্যে পরিষ্কার। হিন্দু-রক্ষণশীল সমাজ গো-হত্যাজনিত (যদিও মহেশ গো-মাতা নয়, ষাঁড়) অধর্মের দোহাই পাড়লেও অনুমান করা যায়, সেটি তাদের প্রকৃত আপত্তির কারণ ছিল না। 'তর্করত্ন' চরিত্রটির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র হিন্দু-রক্ষণশীল সমাজের যে-তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, তা-ই তাদের বিরাগের কারণ হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, মুসলমান গফুর মিঞার হিন্দুদের মতো গো-অনুরাগ, হিন্দু-দেবতার নামে তার নামকরণ, তথা হিন্দুধর্মের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস—এ-সবও তাদের ক্ষুণ্ণ করে থাকতে পারে।

গল্পের শুরুতেই তর্করত্নের মাধ্যমে হিন্দু-সমাজের চিরাচরিত মুসলমান-বিদ্বেষ বিবৃত করেছেন শরৎচন্দ্র :

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফ্‌রা, বলি ঘরে আছিস?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে, বাবার যে জ্বর।

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড। ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙ্গা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্চে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁজে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খর বাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখচি তেমনি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।

সূচনার এই মুসলমান-বিদ্বেষ গল্পের পরবর্তী অংশে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে, যা রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের কাছে স্বভাবতই সহনীয় হয়নি।

প্রাগুক্ত *মুসলিম সাহিত্য সমাজ* শীর্ষক বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র ওয়াজেদ আলিকে উদ্ধৃত করেছেন, যিনি শরৎচন্দ্রের রচনায় মুসলমানদের প্রতি *'সহানুভূতির অভাব, ভালবাসার অভাব এবং মোটামুটি একটা অন্তর্দৃষ্টির অভাব'* লক্ষ করেছিলেন। ওয়াজেদ আলি লিখেছেন :

শরৎচন্দ্রের মত সাহিত্যিকদের সম্প্রদায়, জাতি, একছাড়া দুই নয়। এ কথা

সহজেই আমাদের স্বীকৃতি দাবী করতে পারে। কিন্তু আরও একটি সহজ কথার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেটি এই যে সাহিত্য মানুষের মনের সৃষ্টি, এবং মানুষের মনকে তৈরি করে তার ধর্ম, তার সমাজ, তার পরিবেশ, তার কৃষ্টি। এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা কি সামান্য ব্যাপার? এবং সাধারণত সেটি কি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব?

....

বস্তুত, দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষের ফলে এই বিক্ষোভ। এর জন্য আক্ষেপ বৃথা। হিন্দু মুসলিমকে বোঝে না, এজন্যে দুঃখের বিলাপ আজ চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে তার ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি তার মনকে করেছে অপরিসর, দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন। আপনার পরিধিকে অতিক্রম করে গতি তার নিশ্চল ; আপনার আভিজাত্যের গর্বে যে চিরকালীন, পরাজয়ের প্রাচীন অভিমান যার আজও দুর্জয়, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থান দান করতেও যার আপত্তি অন্তহীন, তার বুদ্ধিকে মুক্ত বলা কঠিন। অথচ, মুক্তি যার নেই সে চলে না, চলতে পারে না, সে জড়। এই আত্মকেন্দ্রী পরবিমুখ জড়বুদ্ধির পরিবেশ এ দেশের মুসলিমকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' করে রেখেছে, ভারতের মাটির রসে রসায়িত হয়েও তার মন যেন ভিজছে না।

অন্যদিকে মীজানুর রহমান লিখেছিলেন (উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত) :

শরৎবাবু তাঁর রাশিকৃত উপন্যাসের ভিতর স্থানে স্থানে মুসলমান-সমাজের যে-সব ছবি এঁকেছেন তা মুসলমান-সমাজের খুব উঁচু দরের লোকের নয়।

শরৎচন্দ্র এই অভিযোগের উত্তরে বলছেন :

উঁচু-নীচু স্তরের পাত্র-পাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা, ভাল-মন্দ নির্ভর করে? এ যদি তাঁর অভিমত হয়, তবে আমার সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য হবে না।

ওয়াজেদ আলির অভিযোগের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছেন :

...আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী, আমাদের আকাশ বাতাস মাটি জল এক। মাতৃভাষা এক বলেই স্বীকার করি। তবু সংঘর্ষ এত বড় কঠোর যে, তার জন্যে আক্ষেপ পর্যন্ত করা বৃথা—এই মনোভাবই যদি সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের সত্য হয় ত এই কথাই বলবো যে, এর চেয়ে দুর্গতি মানুষের আর ঘটতে পারে না।

শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে সমকালে যে-বিতর্ক পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সেই প্রেক্ষিতে *মহেশ* গল্পটি যখন আমরা পড়ি, তখন দরিদ্র মুসলমান-সমাজের শোষিত প্রতিনিধি হিসাবেই গফুর আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। লেখকের সমবেদনা যে তার ট্রাজেডিকে আরও ঘনীভূত করে তোলে, তাতে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র কেবল নিম্নবর্ণের মুসলমান-চরিত্র এঁকেছেন, এই অভিযোগ যুক্তিহীন। কেননা, সামাজিক অগ্রগতির ধারায়, দুর্ভাগ্যক্রমে,

মুসলমান-সমাজ তুলনীয়ভাবে পশ্চাদবর্তী। সে-ক্ষেত্রে, উচ্চবর্ণের মুসলমান-চরিত্র না-এঁকে শরৎচন্দ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান-সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র এঁকে সঠিক কাজই করেছিলেন। অন্যদিকে, ওয়াজেদ আলির 'বিলাপের' অভিযোগে এ-টুকুই বলা যায়, শরৎচন্দ্র তাঁর রচনাসমগ্রে সততই সাধারণ, পীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। সাধারণ মানুষের ধর্ম-পরিচয় খুঁজতে যাননি। তাঁর কাছে *মহেশ*-এর গফুর যেমন, *অভাগীর স্বর্গ*-এর কাঙালিও তেমন—সমান গুরুত্বে, সম-সহানুভূতিতে অঙ্কিত। এদের পরিচয় কেবল অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসে—ধর্মে নয়, দারিদ্র্যে। তবে *মহেশ* গল্পের গফুরকে গল্পের প্রয়োজনেই শরৎচন্দ্র মুসলমান করেছেন। গো-পূজারী হিন্দু-সমাজের বিপরীতে গফুরকে স্থাপন না-করলে গল্পের অভিঘাতটি এতটা তীব্র হত না।

দেশভাগের পটভূমিকায় কয়েকটি অবিস্মরণীয় গল্প লেখা হয়েছে বাংলাভাষায়। এইসব গল্পে দেশভাগের ফলে ঘরছাড়া, দেশ, জমি, প্রতিবেশী-ছাড়া মানুষের আত্মিক ও আর্থিক বিপন্নতার ছবি যেমন বিধৃত, তেমনই হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অবনতি, পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ খুবই গভীরতায় আঁকা হয়েছে। দুটি বিপরীত ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সুনির্মিত বিভেদ, সেই বিভেদের সুযোগে শোষণ বলবৎ করা, এবং সাধারণ মানুষের মিলনের আকাঙ্ক্ষা এই জাতীয় গল্পে নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রমেশচন্দ্র সেনের (১৮৯৪-১৯৬৩) *পথের কাঁটা* গল্পটির অংশবিশেষ পাঠ নিতে পারি আমরা। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে বাস্তুহারা মানুষের দল যখন সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে অনির্দেশ যাত্রায় শামিল হয়েছে, তখন তাদের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আতঙ্ক, হতাশা গোপন থাকেনি এই গল্পের পরতে-পরতে :

> *লোকটি তাদের নিজের দেশের কথা বলে। তাদের দেশ কাছেই, এখান হইতে বিশ-পঁচিশ মাইল দূর। সেখানে কোনো উপদ্রব হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানরা এখনও সদ্ভাবে পাশাপাশি বাস করে। তবে ভদ্রলোকরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। দেখাদেখি চাষী-মজুররাও যাইতেছে। তার বাড়ির সিকি মাইলের মধ্যে কোনো লোক নাই ; স্বজাতি এমন একজনও নাই যে মরার সময় মুখে এক ফোঁটা জল দেয়, মরার পর দেহ কাঁধে করে। দেশে থাকিবে কীসের ভরসায়? কার উপর নির্ভর করিয়া? তাই দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছে।*

যাত্রাপথে :

> *একটুক্ষণ চাহিয়া পরাশর বলে, 'একদল মানুষ নাকি?'*
> *ছায়া বলিল, 'যদি মোছলমান হয়?'*
> *'মোছলমান?' কুমুদিনীর গলায় ধুলা আটকাইয়া গেল।*
> *মোহিনী চোখ বুজিয়া ঠাকুরের নাম আওড়াইল।*
> *পরাশর বলিল, 'দেশ ভাগ করছে। যত সব—'*

কালো রেখা স্পষ্ট হয়, আরো বড় হয়। দেখা যায়, সত্য-সত্যই একদল মানুষ আসিতেছে।

ধ্বনি ওঠে, 'আল্লা হো'...

নির্মেঘ আকাশে বজ্রনির্ঘোষ হইলেও পরাশররা এতটা আঁতকাইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। প্রতাপ ছাড়া সকলেরই মুখ কালো হইয়া গেল। ছায়া ও কায়া সমস্বরে ডাকিল, 'বাবা!'

'আল্লা হো, আল্লা—' আওয়াজ ক্রমেই জোরে হয়।

প্রতাপও পাল্টা আওয়াজ করে, 'বন্দে—'

পরে ভ্রম ভেঙে যায়। দেখা যায়, বিপরীতমুখী দলদুটি একইরকম অসহায়, বাস্তুহারা, সমব্যথী—কেউ কারও প্রতিপক্ষ নয় :

> *সামনে আসিয়া একদল আরেকদলের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দু-দলের দৃষ্টিই শান্ত, স্থির, তাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই। তাদের চোখে শুধু একটি প্রশ্ন, 'তোমাদেরও এই দশা ভাই? এ করলে কে? কারা?'*
>
> *প্রশ্নের সঙ্গে ছিল সহানুভূতি, মানুষে-মানুষে দরদ। এবার কেহ আর আল্লা হো আকবর বলিয়া আওয়াজ করে না, বন্দে মাতরমও নয়। তাদের সহানুভূতি ধ্বনির জগৎ ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।*

সাধারণ মানুষের কেবল বেঁচে থাকার জন্য যে-অসহায়ত্ব, তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় সুনির্মিত সাম্প্রদায়িকতা। অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৯০৪-২০০৩) *দূরের মানুষ* কিংবা *আঙিনা বিদেশ* বা *যে বাঁচায়* গল্পেও দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে মানুষের অসহায়ত্ব, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ভেদ-অভেদ খুবই বেদনায় বিবৃত।

দূরের মানুষ-এ লেখকের হতশ্বাস :

> *আমিও নিশ্চল হয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর ভাবছিলুম ভ্রাতৃস্নেহের মতো কিছু কি আর আছে? তাই যদি হবে তবে আমরা হিন্দু মুসলমান শিখ এমন করে আলাদা হয়ে গেলুম কেন? শুধু কি আলাদা হওয়া? লক্ষ লক্ষ ভাই ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছে, হাজার হাজার বোন ভাইয়ের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। হা বিধাতা!*

আঙিনা বিদেশ গল্পে এই দেশভাগজনিত সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লেখকের উদ্বেগ :

> *আমি পার্টিশন কামনা করিনি। তবে এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম যে গৃহযুদ্ধ যদি হিন্দু-মুসলমানের ধর্মযুদ্ধের মোড় নেয় তাহলে মুসলিমপ্রধান এলাকায় কোনো হিন্দুই নিরাপদ নয়, সে হিন্দুপ্রধান এলাকায় আশ্রয় নেবেই। তেমনি হিন্দুপ্রধান এলাকায় কোনো মুসলমানই নিরাপদ নয়, সে মুসলিম-প্রধান এলাকায় আশ্রয় নেবেই। এমনি করে এক-একটি এলাকায় বাস করবে কেবলমাত্র মুসলমান বা কেবলমাত্র হিন্দু। তাহলে তো হিন্দুস্থান পাকিস্তান আপনা হতেই ঘটে গেল। সমগ্র দেশের উপর কংগ্রেসের বা সমগ্র প্রদেশের উপর মুসলিম লীগের একচ্ছত্র*

রাজত্ব চলতে পারে না। সে সাধ্য কি কারো আছে? দুই পক্ষই যে বদলা চায়। না হিন্দুরাও এর ঊর্ধ্বে নয়। কাজেই পার্টিশন সহ্য করতেই হবে।

যে বাঁচায় গল্পে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নতুন মাত্রায় আভাসিত হয় :

'কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের একটি অভিযোগ আছে, জজ। আপনারা যখন ধ্বনি দেন হিন্দু-মুসলমান এক হো তার মানে কি এই নয় যে, হিন্দু-মুসলমান এক নয়? হিন্দুত্ব ও ইসলাম এক নয়। গীতা কোরান এক নয়। যা এক নয় তা এক হবে কী করে? হতে পারে কখনো? হিন্দু-মুসলমান বরাবরই দুই ছিল, বরাবরই দুই থাকবে। তাদের একত্বটা স্বপ্ন। তাদের দ্বিত্বটাই বাস্তব। দ্বিত্ব যেমন করে হোক বজায় রাখতে হবেই, নইলে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আপনাদের কী? আপনারা তো মেজরিটি।' বলতে-বলতে হাফিজ গরম হয়ে ওঠেন। যেন ইসলাম বিপন্ন।

আমি ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, হিন্দু-মুসলমান যেমন ধর্মের দিক থেকে দুই তেমনি রাজনীতির দিক থেকে এক। অর্থনীতির দিক থেকে এক। ধ্বনি যখন দেওয়া হয় তখন ধর্মের কথা ভেবে দেওয়া হয় না। রাজনীতি অর্থনীতির কথা ভেবেই দেওয়া হয়।

...

মুসলিম মানস কোন খাতে বইছে দূর থেকে তার আভাস পাচ্ছিলুম। কিন্তু অতটা পরিষ্কার আর কখনো হয়নি। আমি শিউরে উঠি। ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষ কি হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র? না যুদ্ধ এড়াতে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ভূমি? তখনো জিন্নাসাহেব পার্টিশনের দাবি তোলেননি। কিন্তু ইকবালের মুখে পাকিস্তানের দাবি উঠেছিল।

অন্নদাশঙ্কর অনেকটা প্রবন্ধের ভঙ্গিতে, দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ভেদাভেদের তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলি এইসব গল্পে উত্থাপন করেছিলেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর *গণনায়ক* গল্পটিতে দেশবিভাগ ও হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ভিত্তিতে কায়েমি স্বার্থের আখের গোছানোর চিত্রটি সুবিন্যস্ত :

হাট আর আজ জমল না। লোকের মুখে মুখে মুনীমজির খবর হাটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাওজির দোকান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সকলেই মুনীমজির নিজের মুখ থেকে খবর শুনতে চায়। নানা প্রশ্নে সকলে তাকে উদ্‌ব্যস্ত করে তোলে। দিনাজপুর আর মালদার হিন্দু হাটুরেরা দল বেঁধে আসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। মুনীমজি বাইরের অন্য লোকদের সরিয়ে দিতে বলেন সাওজিকে—কি জানি, কোনো মুসলমান যদি থেকে যায় ভিড়ের মধ্যে। মালদা, দিনাজপুরের হিন্দুদের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ একান্তে কথাবার্তা বলেন। এই বিপত্তির সময় মুনীমজির স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতিতে তারা মনে বল পায়। ওদেশে থাকা আর নিরাপদ নয় ;

আত্মীয়-পরিজনদের বাড়ি থেকে সরাতে হবে। তারা আর অপেক্ষা না-করে হাট ভালোভাবে বসবার আগেই ফিরে যেতে চায়। আর্দ্রস্বরে মুনীমজি তাদের বলেন যে, তাদের এক মুহূর্ত দেরি করা উচিত নয়, তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তাদের সব চাল কিনে নেন—ষোল টাকা দরে। গত হাটে চালের দাম ছিল উনিশ, কাল সুধানীর বাজারে ছিল বাইশ।

দেশভাগের জ্বলন্ত পরিস্থিতির বর্ণনা লেখেন সতীনাথ মাত্রই দুটি অমোঘ বাক্যে :

পুলের ওপারে রেলিঙের উপর লাগানো হয়েছে সবুজের উপর চাঁদতারা দেওয়া লিগের ঝাণ্ডা ; পুলের এদিকে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসি তিনরঙা পতাকা। ওদিকে একদল চিৎকার করে, 'লে লিয়া হ্যায় পাকিস্তান', 'বাট গেয়া হ্যায় হিন্দুস্তান', এদিকের দল চেঁচায়, 'বন্দে মাতরম', 'জয় হিন্দ'।

শেষপর্যন্ত :

নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পুলের এপারে হিন্দুস্থানের পতাকা, ওপারে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা। আতর গোলাপের ছড়াছড়ির মধ্যে পুলটি কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়—খানিকটা পাকিস্তান, খানিকটা হিন্দুস্থানে, খানিকটা শূন্যে—।

...

'মুনীম সাহেব কী জয়।' 'মহাত্মা গান্ধীজি কী জয়।' জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে।

মুনীমজী ওপারে সকল লোককে বলেন যে, 'সকালে পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে দিয়ে দিও। আমি গভর্নমেন্টের কাছে জমা করে দেব। হিন্দুস্থানে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ রাখা বারণ।

তাঁরই দেওয়া পাকিস্তান নিশানগুলি আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে।

তিনি মনে-মনে ভাবেন—এগুলি নিয়ে কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। পোড়া গোঁসাইয়ের খালিবাড়িতে উঠবেন, তাঁর জমিটমিগুলো একবার দেখেও আসবেন, সেখানে বেচতে হবে এই পাকিস্তান ঝাণ্ডাগুলো। আর সেখানে জোগাড় করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থান পতাকাগুলি। একই জিনিশ দু-দুবার করে বেচবেন। তিনি হিসেব করেন সব মিলিয়ে তাঁর কত হল। 'কমিশন' অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে, আবার অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু এই কমিশনের রায়ের, কমিশন বাবদ তাঁর প্রাপ্য তিনি পেয়ে গিয়েছেন। হিশেবে কোথাও ভুল হয়নি।...

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর (১৯০৪-১৯৭৬) স্বাক্ষর গল্পটিতে খুবই স্বল্প পরিসরে দাঙ্গার নিরর্থক হিংস্রতা বর্ণিত। বরিশালের জহুরালি আর যশোরের দীননাথ নিছক নিম্নবিত্ত। জহুরালি সবজি বেচে, আর দীননাথ বিক্রি করে টুকিটাকি—মালাই-বরফ থেকে ফিতে-

কাঁটা-আলতা। পাশাপাশি বস্তিতে তারা থাকে বন্ধুতায়, দারিদ্র্যে, দুই বন্ধু একসঙ্গে হাসে। তারপর :

সেই হাসির উপর হঠাৎ একদিন দিক-বিদিক হতে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর্তনাদের ছুরি। ছিটকিয়ে পড়লো রক্তের পিচকিরি। নিরীহ পথচারীর রক্ত। নিরপরাধের অন্তিম আর্তনাদ।

মুহূর্তে যে কী হ'য়ে গেল দীননাথ আর জহুরালি কিছু কিনারা করতে পারলো না। চোখের সামনে দোকান-দানি পুড়তে লাগলো, লুঠ হ'তে লাগলো। গলিঘুঁজির মোড়ে নিরুদ্দেশ পথিকের বুকে-পিঠে ছুরি বসতে লাগলো। শান্তিপ্রিয় নিশ্চেষ্ট গৃহস্থের আঙিনা পিছল হয়ে উঠলো শিশু-শাবকের রক্তে। কলকাতার রাস্তায় শকুনের পাখসাট।

এ তাকায় ওর মুখের দিকে, ও তাকায় এর। জহুরালি আর দীননাথ। দু'জনের মুখে আর স্নেহ নেই, কোমল নিশ্চিন্ততা নেই। অবিশ্বাসের ছায়া পড়েছে, ফুটে উঠেছে সন্দেহের কুটিলতা। কথার বদলে স্তব্ধতা, হাসির বদলে বিরক্তি।

কী করে যে দুটো মুখের চেহারা বদলে যায় আস্তে আস্তে তারা নিজেরাও যেন বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে, যখন বিকেলের দিকে তাদের বস্তিতে আগুন ধরে।

বস্তির লোক দু-দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে আসে হন্যে হয়ে। দীননাথ দাঁড়ায় রাস্তার এ-মোড়ে, জহুরালিরা রাস্তার ও-মাথায়। দীননাথের হাতে একখানা ইট, জহুরালির হাতে সোডার বোতল।

অবশ্য, এই শোচনীয় বিবাদ শেষ পর্যন্ত সত্য থাকে না। বিবদমান দুই বন্ধু গল্পের শেষে একটি বিড়ি ভাগ করে খায়। 'আগুনের অক্ষরে' এক মিলনের 'সন্ধিপত্রে' তারা স্বাক্ষর করে। তার আগে দু-জন দু-জনের ক্ষতস্থানের দিকে তাকায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ছেলেমানুষি* এবং *স্থানে ও স্তানে* গল্পদুটিতেও দুই সম্প্রদায়ের মিলন ও ভেদবুদ্ধির পরিচয় সুপরিস্ফুট হয়েছে। সময়ের করাল চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে গল্পের ছত্রে-ছত্রে। *ছেলেমানুষি* গল্পে বয়স্কদের ভেদ-বিভেদ তুচ্ছ করে হাবিব আর গীতা নামে দুই বালক-বালিকা 'আকবর-পদ্মিনী খেলা' করে বন্ধ ঘরের ভিতর। পাশাপাশি দুই প্রতিবেশী-পরিবার চিরকালীন সৌহার্দ্য ভুলে মেতে ওঠে সন্দেহে, অবিশ্বাসে :

শঙ্কায় কালো হয়ে যায় দু-বাড়ির মুখ। কিছুক্ষণ গম-গম করে স্তব্ধতা, তারপর ফেটে পড়ে মুখর গুঞ্জন।

এ-বাড়ি বলে বুক চাপড়ে : শোধ নিয়েছে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয় গুম করে রেখেছে, নয়—

ও-বাড়ি প্রতিধ্বনি তোলে মাথা কপাল কুটে।

তারাপদ বলে, গীতা নিশ্চয় আছে তোমার বাড়িতে নাসির।

নাসিরুদ্দিন বলে, হাবিবকে তোমরা নিশ্চয় গুম করেছ তারাপদ।

এবার আর রোখা যায় না, আগুনের মতো গুজব আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এত চেষ্টা করেও উস্কানিদাতারা ও মেশাল পাড়ার শান্তিতে দাঁত ফোটাতে পারেনি, এমনি একটি সুযোগের জন্য তারা যেন ওৎ পেতে ছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দেখতে-দেখতে বাড়ি-দুটির সামনে জড়ো হয় দু-দল উন্মাদ মানুষ। এরা এ-বাড়িতে চড়াও হবে, ওরা ও-বাড়িতে।

এই অনুচ্ছেদে, উপক্রমী দাঙ্গার মোড় ঘুরল অবশেষে, আর গল্পের অন্তিম অনুচ্ছেদে :

বহুক্ষণ সার্চ চলে নাসিরুদ্দিন আর তারাপদর বাড়িতে, গুম-করা ছেলে-মেয়েদুটির সন্ধানে। হালিমা আর ইন্দিরার গা ঠেসে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে তাই দেখতে থাকে গীতা আর হাবিব।

দাঙ্গাব ভূমিকা, বিভেদের অর্থহীনতা মুহূর্তে প্রকট হয়ে যায় পাঠকের চোখে।

স্থানে ও ভানে গল্পটি পূর্ববঙ্গের ভূমি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দেওয়ার আখ্যান। দাঙ্গা-পরিস্থিতিতে কলকাতাবাসী নরহরি পূর্ববঙ্গের শ্বশুরালয় থেকে স্ত্রী সুমিত্রাকে শহরে আনতে বদ্ধপরিকর। মানিক লেখেন :

সুমিত্রার বাপের বাড়ি পর্যন্ত হয়তো পৌঁছুবে না, পথেই ঘায়েল হয়ে যাবে। সে আতঙ্ক আছে। কিন্তু যদি মরে, মরবে সে বিষাক্ত সাপের ছোবলে। কলকাতা সাপভোজী সাপের আস্তানা। হিন্দু সাপ মুসলমান সাপ বলে তো কিছু থাকতে পারে না, নিছক সাপ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রর (১৯১৬-১৯৭৫) *জৈব* গল্পটিতে দাঙ্গার প্রেক্ষিত ও ভূমিকা পরোক্ষ—গল্পটি শেষপর্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক গল্প হয়ে উঠেছে। লাহোরে দাঙ্গার কবলে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল সুদত্তা। এই সন্তানধারণে স্বামী মৃগাঙ্কর জটিল মনস্তত্ত্ব এই গল্পের প্রতিপাদ্য।

অন্যদিকে, তাঁর *পালঙ্ক* গল্পটিতে বিধৃত রাজমোহন আর মকবুলের মধ্যে একটি মহার্ঘ পালঙ্ক ঘিরে সম্পর্কের যে-জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তা গল্পটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। পালঙ্কটি যে আসলে বৃদ্ধ, পরিত্যক্ত, একা রাজমোহনের এক গভীর সংস্কারের, অস্তিত্বের প্রতীক, তা বোঝেনি কেউ। রাজমোহন পালঙ্কটি মকবুলকে বিক্রি করে দিয়েও ফিরিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। গল্পে নরেন্দ্রনাথ দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অবস্থান বর্ণনা করেছেন :

দিন দুই বাদে সন্ধ্যার পরে রাজমোহনের বাড়িতে ডাক পড়ল মকবুলের। উত্তর ঘরের চওড়া বারান্দায় পাশাপাশি দুটি সতরঞ্চি পাতা। একটি মুসলমানদের জন্যে আর একটি হিন্দুদের। মাঝখানে তামাকের ডিবা, আগুনমালসা, গুটিতিনেক ছোটোবড়ো হুঁকো। দুটি হিন্দুর একটি মুসলমানের।

পাড়ায় বর্ণহিন্দু বলতে আর কেউ নেই। যারা আছে তারা সবাই কৃষ্ণবর্ণ। শরৎ শীল, মুরারি মণ্ডল, ফটিক কর্মকার, নিবারণ রজক, এরা সকলেই

রাজমোহনের অনুগৃহীত। অনেক সময় অনেক উপকার পেয়েছে। আর মুসলমানদের দলে আছে ছদন মৃধা, বদন সিকদার, গেদু মুন্সী।

মকবুল এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গেদু মুন্সী মুরব্বীর সুরে বলল, 'কাজটা তুমি ভালো করো নাই শেখের পো। দেশ ছাইড়া সব হিন্দু মশাইরা চইলা গেছেন। কিন্তু ধলাকর্তা আমাগো মায়া ছাড়েন নাই, তিনি আমাগো জড়াইয়া ধইরা আছেন। এখনো আমরা তানার জমি চাষি, তানার বাড়িতে বসি, আপদে-বিপদে তানারে ডাকি। তুমি ধলাকর্তার জিনিস ধলাকর্তারে ফিরাইয়া দাও গিয়া।

এই বিবাদ নানা ঘটনাক্রম অতিক্রম করে যেখানে পৌঁছায়, সেখানে পাঠকের যে-গভীর ভাবমোক্ষণ হয়, তার বিশেষ তুলনা হয় না। নরেন্দ্রনাথ লেখেন :

রাজমোহন বললেন, 'মকবুল'।

মকবুল বলল, 'ধলাকর্তা!'

তারপর কেউ আর কোন কথা বলল না। ফতেমা ঠিক তেমনি করে কেরোসিনের ডিবাটা দু'জনের সামনে ধরে রইল। আর সেই ধোঁয়া-ওঠা ক্ষীণ দীপের আলোয় মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, ধলা আর কালো—দুই রঙের দুই পালঙ্কপ্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

একটু বাদে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মকবুল বলল, 'ফতি, পোলাপান দুইডারে নিচে নামাইয়া শোয়া। আমি পালং খুইলা ধলাকর্তারে দেই।'

রাজমোহন বললেন, 'সে কী কথা, মকবুল!'

মকবুল বললেন, 'হ ধলাকর্তা, আপনে নিয়া যায়ন পালং। আইজ আমি রাখলাম। কাইল যদি না রাখতে পারি?' বলে মকবুল সত্যিই ছেলেমেয়ে দুইটিকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, রাজমোহন বাধা দিয়ে ওর হাত ধরলেন, 'খবরদার!'

তারপর আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'এতদিন চুরি কইরা কইরা তোর ঘরের পালং আমি দেইখা গেছি মকবুল। কিন্তু খালি পালং-ই দেখছি। আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম—দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে। আমারে পৌঁছাইয়া দিয়া আয় মকবুল।'

স্ত্রীর হাত থেকে কেরোসিনের ডিবাটা তুলে নিতে নিতে মকবুল বলল, 'চলেন ধলাকর্তা।'

এই পালঙ্কের অনুষঙ্গে গল্পটি, সব বিভেদ নিমেষে মুছে দিয়ে, হয়ে ওঠে মহামিলনের, মহাধর্মের অব্যর্থ প্রতিচ্ছবি।

নরেন্দ্রনাথের *পতাকা* গল্পটিও দেশভাগের পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের মিলনের গল্প। জাতীয় পতাকা যখন আলাদা হয়ে যায় দুই সম্প্রদায়ের, তখন জাতির

জীবনে ভাঙন আর বিদ্বেষ কতটা তীব্র হয়ে পড়ে, এ-গল্প তারই অভিজ্ঞান। ইংরেজ, কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ মিলে দেশভাগ করেছিল দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে। যে-সব মুসলমানকে তারপরও থেকে যেতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, তারাও ধর্মের আর মৌলবির প্রভাবে তিনরঙা ভারতের পতাকার বদলে সবুজ চাঁদ-তারা পতাকার পন্থী হয়ে পড়ে। স্বাধীনতাদিবসে ভারতের পতাকা তুলতে বাধা দেয় তারা। প্রবীণ নেতা শচীবিলাস অপমানিত, বিষণ্ন হন চিরচেনা মুসলমান-যুবকদের নতুনতর হিংস্র আচরণে :

ইদানীং ফসল না-হওয়ায় জায়গাটা খালিই পড়ে থাকে। গোরু-ছাগলে চরে, পাড়ার ছেলেরা খেলাধূলা করে। আর বছর-বছর গাঁয়ের লোক স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিনে জাতীয় পতাকা তুলতে আসে এখানে। কয়েক বছর শচীবিলাসও নিজের হাতে তুলেছেন। মকবুল-মনসুররা জায়গা নিয়ে কোনো আপত্তি করেনি, বরং তারা এসে সমানভাবে কামলা খেটেছে, দূর্বাঘাসের ওপর বসে শচীবিলাসের বক্তৃতা শুনেছে, তাদের বউ-ঝিরা বেরিয়ে এসে গাছ-গাছালির আড়াল থেকে ঘোমটা তুলে রঙ্গ দেখেছে ছোটোকর্তার। এতদিনের মধ্যে কোনোদিন কোনো আপত্তি ওঠেনি, কোনো নালিশ অভিযোগ কোনো পক্ষ থেকে। আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সমস্তকিছু কলুষিত হয়ে উঠেছে। সম্মান নেই, শ্রদ্ধা নেই, সৌহার্দ্য নেই। শচীবিলাসদের সমস্ত অন্তর বেদনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

চটানের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে মুসলমান জনতা ভিড় করে রয়েছে। উত্তেজিতভাবে তারা কী যেন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে। শচীবিলাস এগিয়ে গেলেন সেখানে। ডাকলেন 'মকবুল, মনসুর, এদিকে এসো।'

পিছন থেকে কয়েকটি মুসলমান চেঁচিয়ে উঠল, 'মকবুল মনসুর নয়, মকবুল মিঞা, মনসুর মিঞা।'

শচীবিলাস ম্লান একটু হাসলেন, 'আচ্ছা তাই হবে, মকবুল মিঞা এদিকে একবার আসুন।'

মকবুল এসে জোড়হাত করে দাঁড়াল, 'মাফ করবেন কাকাবাবু। ওই ফাজিল ছোকরাদের কথায় কান দেবেন না। মিঞা কেন, আমাকে শুধু মকবুল বলেই ডাকুন। আমি আপনার ছেলের মতো।'

শচীবিলাস অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ছেলের মতো এ-কোন কাজটা করলে তুমি। বছর-বছর ধরে এখানে আমরা জাতীয় পতাকা তুলছি, আজ হঠাৎ তোমাদের আপত্তির কী কারণ ঘটল। আর আপত্তিই যদি ছিল আগে জানালে না কেন। কেন শামিয়ানা, আর চেয়ার টেবিলগুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে তছনছ করে দিলে।'

মকবুল বলল, 'আজ্ঞে সব ওই বদমাস ছোকরাদের কাণ্ড। ওরা খেপে গিয়েছে।'

শচীবিলাস চোখ গরম করে বললেন, 'আর খেপিয়ে তুলেছে তোমাদের ওই বদমাশ মৌলবী।'

মুসলমানদের মধ্যে একটা হৈ চৈ শব্দ শোনা গেল। দু-হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলে মকবুল একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াল শচীবিলাসের সামনে, বলল, 'মৌলবী নয় কাকাবাবু, মৌলবী সাহেব। তিনি এখানকার সালার সাহেব আমাদের, নেতা, আপনি যেমন হিন্দুদের।'

শচীবিলাস ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কেবল হিন্দুদের। আমি কি তোমাদেরও নই?'

মকবুল চুপ করে রইল।

শচীবিলাস আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ কী বলেছেন, তোমাদের মৌলবী সাহেব?'

মকবুল বলল, 'বলেছেন ও-নিশান আমাদের নয়। আমাদের নিশান চাঁদ-মার্কা লিগের নিশান। আপনাদের ওই তে-রঙা উড়তে দেখলে আমাদের গুনাহ হয়। ও-নিশান এখানে আমরা উড়তে দিতে পারি না।'

শচীবিলাস প্রতিবাদ করে বললেন, 'মিথ্যা কথা। এ-নিশান কেবল হিন্দুর নয়, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই। এ-নিশান ভারতের একমাত্র জাতীয় পতাকা। একে অসম্মান কোরো না মকবুল।'

কিন্তু সমস্ত মুসলমান জনতার কোলাহলে শচীবিলাসের কণ্ঠ ডুবে গেল। তাঁর শেষের দিকের কথাগুলি মোটেই শোনা গেল না।

হিন্দু যুবকের দল একদিকে রুখে দাঁড়াল আর একদিকে মুসলমানেরা। সংখ্যায় তারাই বেশি। মুহূর্তে-মুহূর্তে তাদের দল স্ফীত হতে লাগল। পিছনের দিকে লাঠি আর খেজুর গাছ কাটা ছ্যানি দেখা গেল কারো-কারো হাতে। এখানে কিছুতেই তে-রঙা নিশান তারা ওড়াতে দেবে না।

বিনয় শচীবিলাসের কানের কাছে এসে বলল, 'অনুমতি করেন তো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়ি গোটা কয়েক। ভয়ে ওরা পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।'

শচীবিলাস মাথা নাড়লেন, 'না বিনয়, ও-সব নয়।'

বিনয় বলল, 'তবে কি জাতীয় পতাকা এ গাঁয়ে উঠবে না আজ? প্রাণের ভয়ে আমরা পিছিয়ে যাব? অপমান করব জাতীয় পতাকার?

শচীবিলাস বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়। জাতীয় পতাকা আজ আমরা তুলবই এখানে।'

বন্ধুরা বললেন, 'কাজটা সমীচীন হবে না শচী। ফের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কোনোরকম সুযোগ দেওয়া উচিত নয় এখন। চলো বরং অন্য স্থান দেখি, গাঁয়ে তো আরো-অনেক জায়গা আছে।'

ইন্দিরা বলল, 'তা আছে। কিন্তু গাঁয়ের অনেক মানুষই তাহলে এখানে পড়ে থাকবে। স্বাধনতা দিবসের উদ্‌যাপনে গাঁয়ের বেশিরভাগ লোকেরই কোনো অংশ থাকবে না।'

শচীবিলাস কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তুমি তাহলে করতে চাও কী? ওদের ওই ভ্রান্ত ধারণার, অবুঝ আবদারের প্রশ্রয় দিতে চাও?'

ইন্দিরা বলল, 'আপাতত এক-আধটু তো দিতেই হবে বাবা। কেবল কি ধমকেই ফল হবে? আচ্ছা, দেখি, আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে।'

শেষপর্যন্ত পতাকা উত্তোলন না-করেই স্বাধীনতাদিবস পালন করতে হয় শচীবিলাসকে। কন্যা ইন্দিরার কথায় তিনি পতাকার বদলে মানুষকেই নির্বাচন করেন।

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে হল আজকের দিনে শূন্য তাঁর হাত। দৃঢ় হস্তে জাতীয় পতাকা তিনি সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। লোকে কানাকানি করছে এটা তাঁর নিতান্তই সন্তানবাৎসল্য। তিনি জানেন তা ঠিক নয়, এ তাঁরই স্বদেশ আর স্বজনবাৎসল্যও বটে। বক্তব্যটুকু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য অভ্যাস বশে পলকের জন্য একটু চোখ বুজলেন শচীবিলাস। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে মুখে তাঁর গভীর প্রশান্ত পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল। আর-কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো বেদনা নেই তাঁর অন্তরে।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা দুলে-দুলে উঠছে মৃদু হাওয়ায়। মাঝখানটায় খদ্দরের পবিত্র শুভ্রতা, আর দুইপাশে হরিত হলুদের ঢেউ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *উস্তাদ মেহেরা খাঁ* গল্পটিতে দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অবিশ্বাস আর সন্দেহের বিষবায়ুতে কলুষিত হয় সংগীতের পবিত্রতা। শিল্পের সাধক উস্তাদ মেহেরা খাঁ-কে প্রাণ দিতে হয় হিন্দু-আততায়ীদের হাতে, অন্ধকার গলিপথে, কেবল মুসলমান হওয়ার অপরাধে। তার আগে :

শুধু শঙ্করের মুখেই মেঘের রঙ ধরেনি—ঝোড়ো মেঘের কালো রঙ ধরেছে দেশের আকাশে। কলকাতায় কিছুদিন ধরেই সর্বনাশা দাঙ্গা শুরু হয়েছে হিন্দুমুসলমানের। প্রাসাদপুরী কলকাতা, আধুনিক কলকাতা রূপান্তরিত হয়েছে সুন্দরবনে। তার পথে পথে এখন হিংস্র জানোয়ারেব ক্ষুধিত পদসঞ্চাব।

এ-খবর উস্তাদজী রাখেন না, এ-সমস্ত তাঁর সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের বাইরে। নিজের ছোটো ঘরটি—নিঃসঙ্গ নিরালা জীবন, তাঁর সেতার আর তানপুরা, স্বপ্নের গভীরে শহর মুম্বই আর শহর দিল্লী। এতদিন এ-খবর তাঁকে কেউ দেয়নি, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেই যেন সজাগ ছিল না কেউ। কিন্তু আপাতত তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠবার সুযোগ ঘটেছে।

কাগজ নিয়ে পোস্ট অফিস থেকে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে শঙ্কর, এমন সময় চার-পাঁচটি ছেলে এসে ঘিরে দাঁড়াল তার চারদিকে।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে শঙ্করদা।

—আমার সঙ্গে?

—হাঁ, খুব জরুরি কথা।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

—ব্যাপারটা কি হে?

চাপা গলায় একজন বললে, এখানেও লাগবে।

—সে কী!—শঙ্করের শরীরের ভেতর দিয়ে চমকে গেল শীতল শিহরণ : কী লাগবে?

—দাঙ্গা।

—বলো কি!—শঙ্কর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—ঠিকই বলছি।—বিশ্বস্ত স্বরে ওদেরই আরেকজন বলে গেল, বাইরে থেকে বিস্তর লোকজন এসেছে আশেপাশে। খালপারের মসজেদে রোজ ওদের গোপন জমায়েৎ হচ্ছে। গভীর রাত্রে মশাল জ্বেলে লাঠি খেলছে সব। কাল দেখেছি নরু মিয়ার বাঁশঝাড় থেকে লাঠি কাটছে।

—শুধু কি তাই?—আর একজন বললে, রাম জেলের কাছে চাঁদা চাইতে গিয়েছিল। বলেছে চাঁদা না দিলে ঘরবাড়ি লুটপাট করে নেবে।

বিবর্ণ মুখে শঙ্কর বললে, তবে আর কী হবে। তোমরাও তৈরি হয়ে যাও।

—তৈরি আমরা আছিই। কত ধানে কত চাল বেরোয় সেটা বুঝিয়ে দিতে পারব। কিন্তু আপনাকে একটু সাবধানে থাকতে হবে শঙ্করদা, বিভীষণ রয়েছে আপনার বাড়িতে।

—আমার বাড়িতে। আকাশ থেকে পড়ল শঙ্কর : সে আবার কী?

—ওই উস্তাদজী!

—উস্তাদজী! শঙ্কর এবারে হো হো করে হেসে উঠল : মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমাদের। আজ পনেরো বছর ধরে এ-বাড়িতে উনি আছেন—আমাদের একেবারে আপনার জন।

—ও কেউটে সাপের জাত শঙ্করদা। সব সমান। কলকাতায় কী হলো জানেন না?

শঙ্কর তবু হাসছিল : উনি গুরুজন, বাবার গুরু। ওঁর সম্বন্ধে এ-সব কথা ভাবলেও পাপ হয়।

ছেলেরা চটে উঠল : আপনার পাপ পুণ্য নিয়ে তবে আপনি থাকুন। আমাদের কাজ আমরা করলাম, সাবধান করে দিলাম আপনাকে। পরে যদি কিছু একটা হয় আমদের দোষ দিতে পারবেন না।

হাসিমুখেই শঙ্কর কথাটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে হাসিটা তার শুকিয়ে আসতে লাগল। দিনের পর দিন একই কথা একই আলোচনা। চারদিকে একটা নিঃশব্দ অনিবার্য প্রস্তুতি যে চলেছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। নিজের চোখেই শঙ্কর দেখেছে খালপারের মসজেদে গভীর রাত্রে মশালের

আলো—লাঠির ঠকঠক শব্দ, দূরে কাছে, নানা জায়গা থেকে টুকটাক খবর আসছে সব সময়ে। আর চোখ বুজে থাকা চলে না।

এতদিনে একটা নতুন সত্য আবিষ্কৃত হলো শঙ্করের কাছে, খুলে গেল একটা নতুন দিক। উস্তাদজীর সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে একটি মাত্র পরিচয় মনের মধ্যে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল : উস্তাদজী গুণী নন, উস্তাদজী আর কিছু নন, তিনি মুসলমান। এবং ফলে তাঁকে বিশ্বাস করা চলে না।

আজকাল তাই শঙ্কর একটা বিচিত্র নতুন চোখে তাকায় উস্তাদজীর দিকে। সে চোখে শ্রদ্ধা নেই, নবাবী আমলের আতিশয্যের প্রতি সকৌতুক কৌতূহল নেই কোথাও। আছে সন্দেহ, আর আছে বিশ্লেষণ।

কিন্তু উস্তাদজীর দৃষ্টি নিষ্প্রভ তিনি বুঝতে পারেন না। একটা ছেলেমানুষি খুশির অকারণ জোয়ার এসেছে তাঁর ভেতরে, কেটে যাচ্ছে সেই ধ্যানপ্রশান্ত নির্লিপ্ততা। ডাক দিয়ে বলেন, আও বেটা, তোমাকে একখানা জৌনপুরী শুনাই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **ইজ্জত** গল্পটিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে তুচ্ছ করে দারিদ্র্যের হাহাকার এত তীব্র হয়ে ওঠে যে পাঠক স্বভাবতই আবিষ্ট হয়ে পড়ে :

দিনের আলোয় দেখা গেল সমান উৎসাহে দু-দলই পাঁয়তারা কষছে।

কালী মাইকি জয়—আল্লা-হ-আকবর। রক্তপাত আসছে আসন্ন হয়ে। কোনোবার এ সময় ডাকাতে-কালীর থানে পুজো হয় না, কিন্তু এবার কী মানত আছে জগন্নাথ ঠাকুরের, তাই আগামী অমাবস্যায় পুজো তার না করলেই নয়। মূর্তি তৈরি হচ্ছে কুমোরপাড়াতে, সঙ্গে সঙ্গে শান পড়ছে টাঙ্গী-সড়কি-ল্যাজাতে। এবারে এসপার ওসপার যা হোক কিছু হয়ে যাবে একটা।

এরা দাঁড়ায় ডাকাতে-কালীর থানের পাশে, ঝুরি-নামা বটগাছের শান্ত স্যাঁতসেঁতে রহস্যঘন ছায়ায়। অন্ধকার কোটরে আগুনের ভাটার মতো ধকধক করে প্যাঁচার চোখ। এই নীলাভ বিচিত্র ছায়ায়, এই গা ছমছম-করা অস্বস্তিভরা পরিবেশের ভেতরে দাঁড়িয়ে ওদের রক্তের আদিমতার সাড়া আসে। মনে পড়ে যায় অমাবস্যায় নরবলি হতো এখানে, থকথকে রক্ত চাপ বেঁধে থাকত মাটিতে। এখনি আধ হাত জমি খুঁড়লে বেরিয়ে আসবে নরমুণ্ড, দেখা দেবে কবন্ধ-কঙ্কাল। ডাকাতে-কালী আজ আবার নতুন করে নরবলি চাইছেন।

ওপারে ফকিরের দরগার সামনে দাঁড়ায় ধলা মস্তাইয়ের দলবল। সমানে শানানো চলছে ল্যাজা-সড়কিতে, বাঁশঝাড় উজাড় করে লাঠি কাটা হচ্ছে, তবে আপাতত শুধু ওদের লক্ষ্য করে যাওয়া। যত খুশি ঘরে বসে মূর্তি তৈরি করো, যত খুশি দল পাকাতে থাকো। কিন্তু থানে মূর্তি বসিয়ে ঢাকে একটা লাঠি দিলেই হয়। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে—সব তৈরি আছে ভেতরে ভেতরে।

চোখ শাণিত করে দেখে ধলা মস্তাই, অন্যমনস্কভাবে থুতনির নিচে ছোটো

দাড়িটা আঁচড়াতে থাকে। ওদিকে কুকুরছানার বেঁড়ে ল্যাজের মতো টিকিটা সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ঠাকুরের মাথায়।

আচমকা চিৎকার ওঠে : কালী মাইকি জয়—

ওদিক থেকে সমান উৎসাহে আসে তার প্রতিধ্বনি : আল্লা-হু-আকবর—

মনে হয় এখনি দাঙ্গা শুরু হলো বুঝি। কিন্তু দু'দলই জানে—এখনো সময় হয়নি। এ শুধু পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া, চালাকি চলবে না। আমরাও সতর্ক আছি, আমরাও আছি প্রস্তুত হয়ে। শুধু দেখে যাচ্ছি—শুধু হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছি। যথাসময়ে দেখা যাবে কে কতবড় মরদ।

মুখোমুখি দু'দল। সমান সামরিক, সমান উৎসাহী। দু-চারটে খুনজখমে কোনো পক্ষেরই আপত্তি নেই। জমি নিয়ে, মেয়েমানুষ নিয়ে যা হামেশাই ঘটে থাকে, ধর্মের জন্যে তার চাইতে আরো কিছু বেশি মূল্য দিতেই রাজী আছে ওরা!

শেষ পর্যন্ত হাবিব মিঞার স্ত্রী লালবিবি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যায়, কবরস্থ করা হয় তাকে। বিবদমান দুই সম্প্রদায় সাময়িক প্রশমিত হয়। দূরে দাঁড়িয়ে হিন্দুরাও অভিভূত হয়ে পড়ে হাবিব মিঞার শোকে। কালীমায়ের নামে জয়ধ্বনি ভুলে যায় তারা। তারপর :

কেলেঙ্কারিটা হল সেই রাত্রেই।

কে একজন বেশি রাত্রে বেরিয়েছিল ছাগল খুঁজতে। সে এসে চুপিচুপি খবর দিলে হাবিব মিঞাকে। বাঁধের ওপর থেকে দশমীর চাঁদের মেটে মেটে আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কারা যেন আল্লাতলীতে কবর খুঁড়ছে লালবিবির।

জিন? না, জিন নয়। নিশ্চয় মানুষ। জ্যোৎস্নায় তাদের ছায়া দেখয়ে পাওয়া গেছে। জিন হলে ছায়া পড়ত না।

এক হাতে দোনলা বন্দুক আর এক হাতে টর্চ নিয়ে হাবিব মিঞা। ডেকে নিলেন দলবলকে। আমবাগানের ভেতর দিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল দলটা।

সংবাদটা নির্ভুল। দুজন লোক। একজন শাবল মারছে, আর একজন মাটি তুলছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, কাফনের কাপড় চুরি করবে।

—ধর, ধর শালাদের—

লোক দুটো পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কবরখানার উঁচু-নিচু মাটির ঢিবি আর গর্তে পা পড়ে দুজনেই ধরা পড়ে গেল। তখন দশমীর চাঁদের মেটে মেটে আলোটা এক টুকরো মেঘে ঢাকা পড়েছে, কাফন-চোরদের চিনতে পারা গেল না।

—কোন্ শালা হারামীর বাচ্চা মুর্দাকে বেপর্দা করতে চায়?

জোরালো টর্চের আলো ফেললেন হাবিব মিঞা।

শুধু লোক দুটো নয়—দলসুদ্ধ সবাই পাথর হয়ে গেছে। টর্চটা খসে গেল

হাবিব মিএগার হাত থেকে। একজন সাঁচ্চা মুসলমানের বেটা ধলা মন্তাই, আর একজন বামুন ঠাকুর জগন্নাথ—মুসলমানের মুর্দা ছুঁলে যাকে গঙ্গাস্নান করতে হয়। ধলা মন্তাইয়ের হাতে শাবল, জগন্নাথের কনুই পর্যন্ত গোরের মাটি।

কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে সামনে নিলেন হাবিব মিএগা। বিকৃত বিকট গলায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন : মার, মার, মেরে শালাদের তক্তা করে দে। দু শালাই কাফের—ইবলিশের বাচ্ছা।

কিন্তু লোকগুলো সব যেন পাথর হয়ে গেছে। মারবার জন্যে কারো হাত উঠল না, এমনকি আঙুলগুলো এতটুকু নড়ল না পর্যন্ত। শুধু সকলের বিস্মিত বিমূঢ় মনে একটা প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে : ফকির আর কালীর ভেতরে এত সহজে মিটমাট হয়ে গেল কেমন করে?

এই কায়েমি স্বার্থের দাঙ্গা-অভিসন্ধির কথাই লেখা হয় নবেন্দু ঘোষের (১৯১৮) *ত্রাণকর্তা* গল্পে। স্বার্থপর বোসবাবুরা টাকার বিনিময়ে কীভাবে দাঙ্গার দিকে ঠেলে দেয় সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণিকে, বোসবাবুরা রক্ষা পায়, প্রাণ যায় ঝগরুদের—যাদের বোসবাবুরা কখনও মন্দিরে ঢুকতে দেয়নি অস্পৃশ্যতার কারণে, তারাই তথাকথিত হিন্দুত্বের মোহে রক্ষা করে দেবালয় আর চক্রান্তকারী ধনীদের—সেই বিবরণ লেখা হয় এই গল্পে :

হঠাৎ মিস্টার বোস দেখলেন যে উপবিষ্ট সবার মাঝে ঝগরুই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ও কী? তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন, ঝগরু? বোসো বোসো—'

আশ্চর্য হয়ে গেল ঝগরু, আকস্মিক এই অভ্যর্থনায় হকচকিয়ে গেল সে, আমরা-আমতা করে বলল, লেকেন—'

'কিছু না কিছু না, লজ্জা কোরো না, বোসো—'

'হামি ডোম আছি, হুজুর—'

'ডোম?' মিস্টার বোস চোখ কপালে তুললেন, তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে থরথর করে কাঁপতে লাগল, 'ডোম, তাতে কী? তুমিও আমাদের মতো মানুষ, আমাদেরই মতো হিন্দু—বোসো, বোসো ভাই—'

হঠাৎ আবেগের আতিশয্যে তিনি উঠে এগিয়ে এলেন, বিস্মিত ঝগরুর হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

ঝগরু কথা বলতে গেল, কিন্তু কথা বেরোলো না তার গলা দিয়ে। কড়া নেশা করেও যে অনর্গল কথা বলে যায়, আজ সেই ঝগরু বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায়, অনাস্বাদিত এক আনন্দে কথা হারিয়ে ফেলল।

নোটের খশখশ শব্দ শোনা গেল।

একটু বাদেই সেখান থেকে বেরোলো ঝগরু।

বাড়ি ফেরবার সময় বস্তির নিকটবর্তী শিবমন্দিরের সামনে দিয়ে চলতে-

চলতে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল মন্দিরের কাছে। মন্দিরের নোনা-ধরা দেওয়ালের উপর হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে একবার হাসল। বিড়বিড় করে তারপর বলল, 'শিউজি-তু বড়া ভালা আছে, বড়া ভালা—'

...

বস্তির সবাই হঠাৎ উৎসবে মেতে উঠল, রামপ্রসাদ সিংয়ের ভাটিখানা একঘণ্টায় উজাড় হয়ে গেল। নিঃশেষ হয়ে গেল বানোয়ারা হালুয়াই আর তেওয়ারির দোকানের খাবার।

মাঝে-মাঝে কোলাহল ভেসে আসে। উন্মত্ত তাণ্ডবের ধ্বনি—'আল্লা-হো-আকবর।' দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মতো সে-ধ্বনি মাথার ওপর দিয়ে তরঙ্গ গর্জনের মতো গড়িয়ে যায়।

মাঝে-মাঝে দু-একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়। আর গভীর রাত্রির এই নিঃশব্দ ও অন্ধকার মুহূর্তে ডোমপাড়ার সর্দার জেগে বসে থাকে। তার দু-চোখ সামনের দিকে প্রসারিত, কান রয়েছে সমস্তরকম শব্দ ও প্রতিশব্দের দিকে।

রাত একটা নাগাদ যুদ্ধ ঘোষণা করল ওরা।

'আল্লা-হো-আকবর—'

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ—'

ঢোলকে ঘা-দিল ঝগরু। ডুম ডুম ডুম ডুম।

সমস্ত ডোমপাড়া জেগে উঠল। নিঃশব্দে ছুটে বেরোলো, সবাই একত্রিত হল।

ওরা ব্যান্ড বাজিয়ে এল। এল মশাল জ্বালিয়ে। নরকের একটা বিভীষিকাময় অংশও নেমে এল তাদের সঙ্গে। আদিম অরণ্যের যত রক্ত-তৃষাতুর অশরীরী সবাই যেন আজ ওদের মস্তিষ্কের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে।

শিবমন্দিরটাকে লক্ষ্য করেই ওরা প্রথমে এগিয়ে এল, উদ্দেশ্য মন্দির ধ্বংস করার পর পাড়াকে ধ্বংস করবে।

সমস্ত পাড়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সাইরেন বাজতে লাগল, অট্টালিকা শীর্ষে লাল বাতিগুলো থেকে আতঙ্কের রক্তদ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল, ছেলেমেয়েদের কান্না শোনা গেল, দুড়ুম-দাড়াম করে দরজা-জানালা বন্ধ হতে লাগল, ধাবমান পদশব্দ ধ্বনিত হল, আর ধ্বনিত হল শঙ্খ। সমস্ত পাড়া ভয়ার্ত হুংকার ছাড়ল, 'বন্দেমাতরম'—যে-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে দেশকে মুক্ত করতে চায় ওরা, আজ সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে দেশের লোককেই মারতে চাইল।

ঝগরুর ঢোলক তখন থেমেছে। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছে ওরা।

'শোরগোল মত কর ভাই—নজদিক আনে দে—' ঝগরুর নির্দেশ ধ্বনিত হল।

'আল্লা-হো-আকবর'—

হঠাৎ বন্যার মতো ওরা সবাই ধেয়ে এল। মশালের আলোতে মধ্যাহ্নের

সূর্যালোকের মতো ওদের ঝকঝকে ছোরা আর তরোয়াল ঝলসে উঠল।

ঝগরু দুলছিল ওদের বাজনার তালে-তালে, এবার বলল, 'অব লগ যা ভাই—জঞ্জাল সাফ কর—'

ধ্বনি উঠল ঝগরুর দলের।

যে-শিবমন্দিরের ভেতরে কোনোদিন ঢুকতে পারেনি তারা, যে-শিবঠাকুরের মন্দিরের নোনা-ধরা দেওয়ালের ওপর হাত বুলিয়ে আর মাথা ঠুকেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে তারা, যে-নির্বাক প্রস্তর দেবতা তাদের এই বঞ্চিত দুভাইয়ের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদই জানায়নি, আজ ঝগরু সেই দেবতারই জয়ধ্বনি ক'রে উঠল।

'হর-হর মহাদেও—জয় শিউজিকি জয়—'

তারপর যেন দুটো পাহাড়ে সংঘর্ষ ঘটল। মাটির পাহাড় নয়, আদিম পৃথিবীর লৌহকঠিন পাথরের পাহাড়।

রক্তের ঢল নামল। হাত, পা মাথা ছিটকে-ছিটকে পড়ল। চূর্ণীকৃত মাথা থেকে ঘিয়ের মতো ঘিলু গড়াল, বুকের ভেতরকার রক্তমাংসকে চুম্বন করে ধারালো ছোরারা বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এল।

নবেন্দু ঘোষের উলুখড় গল্পটিও একইভাবে দাঙ্গার অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা দেয় :

হ্যারিসন রোড ধরে এগোচ্ছিল আজিজ। এমনি সময় হঠাৎ সে লক্ষ করল যে রাস্তায় যেন লোক চলাচল হঠাৎ অতিমাত্রায় দ্রুত হয়ে উঠেছে। তখন বেলা প্রায় বারোটা। গাড়ি-ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না, বাস চলছে না, ট্যাকসিগুলো সবেগে ছুটে যাচ্ছে আর মানুষেরা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে দ্রুত হাঁটছে।

—'ব্যাপার কী?'

পার্শ্ববর্তী লোকটিকে সে জিজ্ঞেস করল—'ক্যা হুয়া ভাই?'

লোকটি বোধ হয় হিন্দু, সে চলতে-চলতে কটমট করে তাকাল আজিজের দিকে, তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলল—'কী আবার? দাঙ্গা!'

—'দাঙ্গা!' কুড়ি তারিখে যা করতে পারেনি কর্তারা, সেই দাঙ্গা লেগে গেল। হঠাৎ আজিজের মনে প'ড়ে গেল যে আঠাশ তারিখের সাধারণ ধর্মঘটকে পণ্ড করল এই দাঙ্গা।

বিবর্ণ হয়ে সে বলল—'আবার দাঙ্গা!'

লোকটি শ্লেষ ভরে বলল—'হ্যাঁ, উপায় কী, তোমরাই তো ব্যাপারটাকে জিইয়ে রেখেছ মিএগা—'

আজিজ মাথা নাড়ল, নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখাল বুকের ওপরে যেখানে লাল কাগজে লেখা আছে 'ধর্মঘটী ট্রামশ্রমিক।' ম্লানভাবে হাসল সে, যেন বলতে চাইল যে আমরা অন্য লোক ভাইসাব, আমরা হিন্দুস্থানেরও নই, পাকিস্তানেরও নই, আমরা ভুখা মজদুর, আমরা বিত্তহীন শ্রমিক, আমরা গরিব উলুখড়। যারা

ছোরা চালায় আর ছোরা খায় তারাও তাই, শুধু ওরা কেউ জেনেও জানে না যে এ-রক্তপাতে ঘাতক আর নিহতদের কোনো লাভ নেই, লাভ শুধু কয়েকজন তখৎওয়ালাদের যারা ওপরে বসে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধের মানচিত্র দ্যাখে আর দুষ্টগ্রহের মতো মূর্খ জনগণকে সর্বনাশের দিকে তাড়না করে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল আজিজ। সঙ্গে রাবেয়া। কোনো উন্মুক্ত রক্ত লোভাতুরের মুখোমুখি দাঁড়ানো তার চলবে না।

...

জোহরা সামনে এসে দাঁড়াল—'না, আজ তোমার যাওয়া চলবে না।'

—'মানে? কেন?' বুঝেও না-বোঝার ভান করল আজিজ।

জোহরার মুখে-চোখে শঙ্কার ছাপ, বিরক্ত হ'য়ে তিক্তকণ্ঠে সে বলল—'কেন অমন করছো বলো তো?'

—'তুমিই বা কেন অমন করছো?'

—'দাঙ্গা লেগেছে, তার মধ্যেই যাবে?'

—'না গেলে চলবে কী করে?' রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে আজিজ বলল—'মেয়েটার অসুখের কথা মনে নেই? আর এদিকে পকেটও যে শূন্য তাও তো জানো।'

দারিদ্র্য যে দাঙ্গার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব, তা নিমেষে প্রকট করেন লেখক।

সোমেন চন্দর (১৯২০-১৯৪২) *দাঙ্গা* গল্পটি দাঙ্গার বীভৎস চিত্র-সমন্বিত একটি ঐতিহাসিক দলিল। দাঙ্গা-বিরোধী শান্তি-মিছিলে নৃশংসভাবে খুন হন এই ফ্যাসি-বিরোধী লেখক। এই গল্পটি সে-কারণেও বাংলা কথাসাহিত্যে এক উজ্জ্বল উদ্ধার রূপে বিবেচিত হয়। গল্পটিতে বামপন্থার নিরিখে দাঙ্গার কার্য-কারণ নিরূপিত হয়েছে। দাঙ্গাকারীদের কাছে মানুষের প্রাণের মূল্য যে একেবারেই অকিঞ্চিৎ, তা বুঝি আমরা সোমেনের নৈর্ব্যক্তিক রচনায় :

লোকটা মাঠ ছেড়ে রাস্তায় পড়ল। তার পরনে ছেঁড়া-ময়লা একখানা লুঙি, কাঁধে ততোধিক ময়লা একটি গামছা, মাথার চুলগুলি কাকের বাসার মতো উশকোখুশকো, মুখটি করুণ। তার পায়ে অনেক ধুলো জমেছে, কোনো গ্রামবাসী মনে হয়।

এমন সময় কথাবার্তা নেই দুটি ছেলে এসে হাজির, তাদের মধ্যে একজন কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে লোকটার পিছনে একবার বসিয়ে দিল। লোকটা আর্তনাদ করে উঠল, ছেলেটি এতটুকু বিচলিত হলো না, লোকটার গায়ে যেখানে-সেখানে আরো তিনবার ছোরা মেরে তারপর ছুটে পালাল, কুকুর যেমন ল্যাজ তুলে পালায় তেমনি ছুটে পালাল। লোকটা আর্তনাদ করতে-করতে গেটের কাছে গিয়ে পড়ল, তার সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে গেছে, টাটকা লাল রক্ত, একটু আগে দেখেও মনে হয়নি এত রক্ত ওই কঙ্কালসার দেহে আছে।

মিনিট দশেক পরে এক সৈন্য বোঝাই গাড়ি এল, সৈন্যরা বন্দুক হাতে করে গাড়ি থেকে পটাপট নেমে সার্জেন্টের আদেশে হাতের কাছে যাকে পেল তাকেই ধরল। হিন্দি বুলি ছেড়ে, সিগার খেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে সার্জেন্টদের শ্বেতবর্ণ মুখ আরক্ত হয়ে এল। যারা এদিকে জেলের ভাত খেতে আসছিল তাদের থামিয়ে দিল। 'উধার মৎ যাইয়ে বাবু, মৎ যাইয়ে!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিন নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় অর্ধেকটা ঘেরাও হয়ে গেল, ছোটো-ছোটো গলি এবং সমস্ত রাস্তার মাথা সশস্ত্র পুলিশ সঙিন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ ঢুকতে পারবে না, কেউ বেরুতেও পারবে না, শৃঙ্খলিত করে একটা সাময়িক বন্দীশালা তৈরি হলো।

বামপন্থী অশোকেব 'হিন্দু সোসালিস্ট' ভাই অজয় দাদার সঙ্গে মুসলমান-বিরোধী তর্ক করে, কিন্তু দাঙ্গার অন্ধকারেও অশোক শুভবুদ্ধি বিসর্জন দিতে রাজি নয়। দাঙ্গায় যে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান কারও স্বার্থই নিহিত নেই, তা সে বোঝাতে চায় অনুজকে। ইতিমধ্যে অশোক-অজয়ের বাবা সুরেশবাবু দাঙ্গায় নিখোঁজ হয়ে যান। মাইনের দিন সম্ভবত তাকে খুন করে কষ্টার্জিত টাকাগুলি কেড়ে নিয়েছে দাঙ্গাবাজেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে। বাবার নিরুদ্দেশের সংবাদে আরও ক্ষিপ্ত হয় অজয় :

এমন সময় পাশের ঘরে আলো দেখা গেল—আলো নয়তো আগুন। কাগজ পোড়ার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। অশোক গিয়ে দেখলো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবেদনের ইস্তাহারগুলি স্তূপীকৃত করে অজয় তাতে আগুন দিয়েছে।

অশোক তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'এ-সব কী করছিস?'

—'কী করবো আবার। মড়া পোড়াচ্ছি!'

—'অজু তুই ভুল বুঝেছিস। চোখ যখন অন্ধ হয়ে যায়নি, তখন একটু পড়াশোনা কর। তারপর পলিটিক্স করিস।'

—'দাদা তোমার কম্যুনিজম রাখো। আমরা ও-সব জানি।'

—'কী জানিস বল্?' অশোকের স্বরের উত্তাপ বাড়ল।

—'সব জানি। আর এও জানি তোমরা দেশের শত্রু।'

—'অজু, চুপ করলি?'

অজয় নিজের মনে গুমগুম করতে লাগলো।

অশোক উত্তপ্ত স্বরে বললে, 'ফ্যাসিস্ট এজেন্ট! বড়োলোকের দালাল। ...স্টুপিড, জানিস দাঙ্গা কেন হয়? জানিস প্যালেস্টাইনের কথা? জানিস আয়ারল্যান্ডের কথা, মূর্খ?'

রমাপদ চৌধুরীর *অঙ্গপালি* গল্পটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দাঙ্গার বীভৎসতার পাশে মাতৃত্বের স্নিগ্ধতা। দাঙ্গার ঘৃণা আর বিদ্বেষের ফসল সন্তান হয়ে এসেছে সবিতার গর্ভে।

সেই সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে, বড় করেছে, তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে :

কালো আকাশের অন্ধকার চিরে হঠাৎ একদিন আগুন জ্বলে উঠেছিলো দিকে দিকে। আর চিৎকার। রক্তপায়ীদের কোলাহল আর অসহায় মানুষের আর্তনাদ ভেসে উঠেছিলো আকাশে বাতাসে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো সবিতার। হঠাৎ-জাগা চোখে ভয় নেমেছিলো ওর। বাবা মা ভাই বোন সকলের মুখের ওপর দেখতে পেয়েছিলো ও শঙ্কিত বিস্ময়ের ছাপ। ধোয়া চাদরের মতো ফ্যাকাশে মুখে অপেক্ষা করেছিলো ওরা। অপেক্ষা, অপেক্ষা। তারপর। পশুর মতো চোখে আর প্রেতের মতো শরীর নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো তারা। সেই ছায়া-কালো-কালো মানুষগুলো। বাইরে শুধু অন্ধকার আর কালির বৃষ্টি, কিন্তু বৃষ্টির রিমঝিম ছাপিয়ে ভেসে আসছিলো ক্রুদ্ধ জনতার মধ্যে রক্তের চিৎকার। ওরা এগিয়ে এলো। কারো হাতে মশাল, কেউ বা কৃপাণপাণি। তারপর কি যেন ঘটেছিলো। ভালো করে মনেও পড়ে না সবিতার। হয়তো বা চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলো ও। বোবা আর বোকা চোখ চেয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখছিলো। রক্ত আর রক্ত।

বাবা, মা, ভাই, বোন। কত দিন, কত কর্মহীন বিষণ্ণদুপুর কাটিয়েছে ও ভেবে ভেবে, কত না নিঘুম রাত। তারা কি বেঁচে আছে? সবিতার জীবন থেকে অন্তত মুছে গেছে তারা। কে জানে, ওকে বাদ দিয়েই হয়তো নানা রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে ওদের সংসার। বংশের সাদা ফুটফুটে পাখনাটার ওপর যে কালির চিহ্ন পড়েছিলো সেটুকু মুছে ফেলে আবার হয়তো সংসার গড়ে তুলেছে ওরা। সবিতাকে ভুলে গেছে। সবিতাও ভুলতে চেষ্টা করেছিলো ওদের। কি হবে মিথ্যে দুঃখ করে। ব্যর্থ অনুশোচনায়। হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার করলো, মাতৃত্বের স্নিগ্ধাবেশে ওর দেহ ভরে উঠেছে। চোখে মধুময় ক্লান্তি, অবাঞ্ছিত, অযাচিত হতে পারে। স্নেহ আর ভালোবাসা নয়, ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিনিময়ে পাওয়া সন্তান। তবু। সব অপরাধ যেন ক্ষমা পেলো সবিতার কাছে। ওর আপন দেহের রক্তমাংসে-গড়া সন্তানকে বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তোলবার চেষ্টা করবে ও, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

যদিও, গল্পের অন্তে তার সেই স্বপ্ন এক-লহমায় চুরমার হয়ে যায় :

ভিজে কাপড়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বকু। বকু বললে, এমনি অসুখ তোমার, আবার এত রাতে চান করলে?

মা লজ্জিত হয়ে বলল, কি করবো বল। সারাটা দিন ছেলেটাকে নিয়ে মাখামাখি করলাম।

—করলেই বা। অবোধ্য অভিমান বকুর গলায়।

মা মুখে বললে, কোলে করে মানুষ করছে বলে তো আর আমাদের ছেলে নয় বাপু।

করুণকন্যা গল্পেও দাঙ্গা-পীড়িত আরেক যুবতী অরুন্ধতীর কথা লেখেন রমাপদ চৌধুরী। তারও কোলে এক দাঙ্গার সন্তান, আর সেই করুণকন্যার চারপাশে প্রতিবেশীদের সমবেদনার ছলে বিদ্রূপের, অবিশ্বাসের আবহ :

> *এমন যে হবে তা জানতো অরুন্ধতী। বুকের মমতা যেদিন এই অবাঞ্ছিত সন্তানের সঙ্গে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে রাজী হয়নি, সব হারানোর জীবনে এই সামান্য পাওয়ার উজ্জ্বল রামধনুটুকু যেদিন মুছে ফেলতে চায়নি ও, সেদিন থেকেই তা জানে অরুন্ধতী। কিন্তু, মা-র কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই যেন সমস্ত শরীর ওর ক্রোধে আক্রোশে জ্বলে উঠলো।*
>
> *—যাক, ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন দিদি, এই খুব। পড়শী প্রৌঢ়ার এই কথাটাই যেন জ্বালা ধরিয়ে দিল ওর চোখে।*
>
> *ছেলেকে কোলে নিয়ে কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। দৃঢ় ক্রোধের গলায় বললে, ভালোয় ভালোয় যে আসিনি তার সাক্ষীও এনেছি।*
>
> *ওমা, তেজ কেন মেয়ের এত, ভাবলে সবাই। পাঁচ বছর ধরে জাতজন্ম খুইয়ে কোলে একটা ছেলে নিয়ে ফিরতে হলো যাকে, কোথায় সব সময় মুখ লুকিয়ে থাকবে, চোখাচোখি হলে মাথা হেঁট করবে, তা নয়—স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব! তবু সান্ত্বনা দেবার ভান করে কেউ কেউ বললে, তোমার তো দোষ নয় মা, তুমি কি করবে।*
>
> *আড়ালে অবশ্য ঠোঁট টিপে ইশারায় হাসাহাসি করলে ওরা। অর্থাৎ, এখন তো বলছে দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিলো, দাঙ্গায় না কিসে ভগবান জানেন।*
>
> *অরুন্ধতীর আর কি করবার আছে, বিছানায় লুটিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া আর কি উপায় আছে ওর।*

এই কান্নাই গল্পের শেষে বিদ্রূপের হাসি হয়ে ফুটে ওঠে অরুন্ধতীর চোখে। দাঙ্গা এই গল্পের পরোক্ষ প্রেক্ষিত রূপে পাঠককে পীড়িত, ত্রস্ত করতে থাকে।

সমরেশ বসুর *আদাব* গল্পটি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত শহরে দুই দরিদ্র শ্রমজীবীর আত্মোপলব্ধির গল্প। ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত দাঙ্গার বছরেই সমরেশ এই গল্পটি লেখেন। *আদাব*-ই তাঁর প্রথম-প্রকাশিত গল্প। হিন্দু-মুসলমান মানুষদুটি মৃত্যুভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে অনুভব করে দারিদ্র্যের কোনও ধর্ম থাকে না। আতঙ্কের মধ্যে দু-জন একাত্ম হয়ে পড়ে। বিপদই মুছে দেয় সব ভেদরেখা। তার আগে সমরেশ তাঁর কুশলী লেখনীতে ঘনিয়ে তোলেন আতঙ্ক-বাস্তবের, অন্ধকার সময়ের শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতি :

> *রাত্রির নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।*
>
> *শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই—দা, শড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তাছাড়া*

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরারা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যুবিভীষিকায় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলেছে। বস্তিতে বস্তিতে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে-স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

...

দু-দিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উলটে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না—'আল্লাহো আকবর' কি 'বন্দেমাতরম!'

হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠলো। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।...নিশ্চল নিস্তব্ধ।

বোধহয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে-আস্তে মাথা তুলল লোকটা...ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটা মাথা। মানুষ। ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী নিস্পন্দ, নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা-ধীর...। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু, না মুসলমান? এ-প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফ্যালে—হিন্দু না মুসলমান?

—আগে তুমি কও। —অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে...প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, আবার অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে,—বাড়ি কোনখানে?

—বুড়িগঙ্গার হেইপারে—সুবইডায়।—তোমার?

—চাষড়া—নারাইনগঞ্জের কাছে...কী কাম কর?

—নাও আছে আমার, নায়ের মাঝি!—তুমি?

—নারাইনগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষে অন্ধকারের মধ্যে দুজনে দুজনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে।...হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দু-পক্ষেরই উন্মত্ত ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

ধারেকাছেই য্যান লাগছে।—সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

হ, চলো এইখান থেইক্যা উইঠা যাই।—মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল : আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ অভিপ্রায় নেই তো! সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল। চোখে চোখ পড়তেই বলল, বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাকো।

মাঝির মনটা ছ্যাৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—ক্যান।

ক্যান? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল, ক্যান কী, মবতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে-মনে দৃঢ় হয়ে উঠল।—যামু না তো কি এই আন্দাইরা গলির ভিতর পইড়া থাকুম নাকি।

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল—তোমার মৎলবটা তো ভালো মনে হইত্যাছে না। কোন জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমার মারনের লেইগা?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই ; বইয়ো। মানুষের মন বোঝো না।

সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকার গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ-ছেলে মেয়েদের কথা...তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে...কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়া-কওয়ি—আবার মুহূর্তপরেই কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে? কী অভিশপ্ত জাত!...সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা?—সুতা-মজুর পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু-একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খশ-খশ শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠি ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

—হালার ম্যাচবাতি গেছে সেঁতাইয়া।—আর-একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

আরে জ্বলব, জ্বলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু-একবার খশ-খশ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

সোহান্ আল্লা!—নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।...ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

তুমি?...

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দু-জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড়ো-বড়ো হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট করে উঠে দাঁড়াল। বলল,—হ, আমি মোছলমান।—কী হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে-ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু...

মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কী আছে?

পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখানা শাড়ি। কাইল আমাদের ঈদের পরব, জানো?

আর কিছু নাই তো—সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দ্যাখো।—পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

আরে না-না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো?

ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি, একটা সুইও নাই। পরানটা লইয়া আপন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুরকে তার জামা কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দুজন বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগ-সহকারে দুজনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

আইচ্ছা...মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা—আমারে কইতে পারোনি—এই মাইর-দইর কাটাকুটি কীসের লইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ তো তোমাগো লিগওয়ালাগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কীসের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল—হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই, মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দুগা লোক মরব, আমাগো দুগা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব।

—আবে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলা-মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে হইল বিধবা বইন আর পোলা-মাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপর। কই কী আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি ; নইলে এমুন কামড়াকামড়িটা লাগে কেমবায়?—নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু-হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

—হ।

—আমার কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন জুটাইব কোন্ সমুদ্দি ; নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কী? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েব মশায় পিত্যেক

মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইবার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত যান্ হুজরতের হাত, বখশিস দিত পাঁচ, নায়েব কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দু বাবু আইব আমার নায়ে।

গল্পের শেষে রাত-পাহারার পুলিশের গুলিতে মাঝির মৃত্যু হয়। সুতা-মজুর বিহ্বল চোখে দেখে সেই বীভৎস, নিরর্থক মৃত্যু। আমরা বুঝি, হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্ব, পরিপাশের নানা বিরোধিতায়, যেন অসম্ভবই, শেষপর্যন্ত।

মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬) *রাম-রহিমের কথা* গল্পে এই সম্পর্কের টানাপোড়েন নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রাম-রহিমের মৃত্যুতে তাদের শোকপাথর দুই মা সাজুমনি আর পাঁচুবিবি সমব্যথী হলেও সাম্প্রদায়িক আতঙ্কে কান্নারুদ্ধ হয়ে থাকে। দুই পুত্রহারা মা, দুই সখি ও সমব্যথী সাম্প্রদায়িক আতঙ্কে একসঙ্গে মুখোমুখি বসে কাঁদতেও পারে না। অভিমান জমে তাদের দু-জনের মধ্যবর্তী শূন্যতায় :

সাজুমণি সবই শুনে যায়। সকলেরই চোখে পড়ে ওর পরিবর্তন। গরিবের ঘরে এমন শোক কে কবে দেখেছে? গরিব তিনদিন কাঁদে। আবার সংসারে ফিরে আসে, কাজকর্ম খাটাখাটনি করে। এমন অশ্রুহীন নির্বাক হয়ে কে থাকে?

বউ বলে, কান পেতে থাকো কেন?

—শুনবো বলে।

—তার ডাক শুনবে বলে?

—না রে না।

—তবে কার? তুমি অমন পাথর মেরে থাকলে আমি কীসে ভরসা পাবো? সাজুমণি শীর্ণ হাত বাড়ায়।

—আমার ভরসা। আমি তো তোদের ফেলিনি বউ।

—তবে কি শুনবে বলে অমন করছ?

সাজুমণি শ্রান্ত গলায় বলে, রহিমের মা! সেদিন কেঁদেছিল? সে জানে আমার জ্বালা, আমি জানি তার জ্বালা। তাকে পেলে কাঁদতে পারতাম। বুকটা হালকা হতো।

—সে কখনো আসে মা? কোন মুখে আসবে?

—কেন, যেমন যেতে-আসতে দাঁড়াতো? রহিম গেল মিটিনে, রাম গেল মুড়ি-বাতাসা বেচতে। দুজনেই নিদোষে মরল, তাতে রহিমের মার মুখ কেন ছোটো হবে? সে বা কী দোষ করেছিল, আমি বা কী দোষ করেছিলাম।

—টাকা পাবে বলে সব শত্তুরতা হয়েছে।

—রামের বদলে টাকা তো চাইনি আমি। কারুকে খেলার ছলেও মারেনি, হাংগামা দেখলে দৌড়ে ঘরে আসতো, তাকে এমন কুপিয়ে থেঁৎলে...

—মুকুলের মা রোজ ঘাটে বসে কাঁদে।

—রহিমের বউ?

—হ্যাঁ। বলে, আল্লার বিচার নেই।

—সাজুমণি ঈষৎ হাসে।

—ঠাকুর-দেবতা সাধু-ফকির, কার-বা বিচার আছে? নে, ঘুমো। সে এলে কাঁদতাম খানিক। কার সঙ্গে কাঁদবো?

বউ চুপ করে থাকে।

—আসতেও পারতো।

—ভাবে লোকে কী বলবে!

—হবেও বা। আমিও তো যেতে পারছি না সেইজন্যই। কিন্তু আর কার কাছে গেলে আমি কাঁদতে পারবো বউ?

সাজুমণির গলায় বড়ো বিপন্ন হাহাকার।

অন্যদিকে, কয়েকদিন পরে :

হাঁটতে-হাঁটতে পাঁচুবিবি ঈষৎ রাগত গলায় বলে, বুকে পাথর চাপা বা দিয়ে মরছো কেন? কানতে পারোনি?

—তুমি বা এক ডাক ফুকরে গলা বুজলে কেন?

—ওরা মুখ চেপে ধরলো।

—তুমি আমার মুখ বন্ধ করে দিলে।

তারপর, শেষরাতে, চাঁদের দিকে চেয়ে সাজুমণি ফুলে-ফুলে কাঁদে। সেই নিরুত্তর কান্নার কাছে ম্লান হয়ে যায় ধর্মান্ধ মানুষের সমস্তরকম সাম্প্রদায়িক বিভেদ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *ভারতবর্ষ* গল্পটিও একটি মৃত্যুর প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের ধর্ম-খণ্ডিত পৈশাচিকতাকে বিদ্রূপে জর্জরিত করে। এক অনাদৃত বৃদ্ধার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান যে-ভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে, তা এই দেশ, সমাজ ও ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রকট করে। বেঁচে থাকতে যে-বৃদ্ধা ছিল গ্রামের দুই সম্প্রদায়ের কাছেই ঘোর অবাঞ্ছিত, মৃত্যুতে সে হয়ে ওঠে দু-দলেরই কাঙ্ক্ষিত মূলধন :

হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। মাঠ পেরিয়ে একটা চ্যাংদোলা আসছে। সেটা যখন বাজারে পৌঁছালো তখন জানা গেল ব্যাপারটা। সেই বুড়ির মড়াটাই তুলে নিয়ে আসছে মুসলমানপাড়ার লোকেরা। আরবি মন্ত্র পড়ছে ওরা। মাথায় টুপিও পরেছে কেউ-কেউ।

যারা ফেলে দিয়ে এসেছিল, তারা হিন্দু। তারা অবাক হয়ে এবং রেগে গিয়ে জানতে চাইল—কী ব্যাপার?

না—বুড়ি যে মুসলমান।

প্রমাণ?

প্রমাণ অনেক। অনেকে তাকে শুনেছে বিড়বিড় করে আল্লা বা বিসমিল্লা বলতে। এমনকী গাঁয়ের মোল্লাসায়েব অকাট্য শপথ করে বললেন—আজ ফজরে (ভোরের নমাজের সময়) যখন নমাজ সেরে এদিকে বাস ধরতে আসছি, তখনই বুড়ি মারা যাচ্ছিল। ওকে স্পষ্ট কলমা পড়তে শুনলাম। তা—কে জানে, বুড়ি মরছে? আমি যাচ্ছি শহরে—মামলার দিন। তাই দেখা হলো না ব্যাপারটা। ফিরে এসে শুনি ওকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তৌবা। তৌবা। তা কি হয় আমরা বেঁচে থাকতে? তাই কবরে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

গাঁয়ের ভটাচাজমশাই সবে বাস থেকে নেমেছেন। উঁকি মেরে সব দেখে-শুনে বললেন—অসম্ভব। আমিও তো মোল্লার সঙ্গে একই বাসে আজ শহরে গিয়েছিলুম। আমি কি কালা? আমি স্পষ্ট শুনেছি, বুড়ি বলছিল শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি!...

তাঁর সপক্ষে অনেক প্রমাণ জুটে গেল। নকড়ি নাপিত দিব্যি করে বলল—কাল আমি কামাতে বসবো বলে বটতলায় এসেছিলাম। দেখলাম বসা যাবে না। তখন বুড়িকে স্পষ্ট বলতে শুনেছি আপন মনে বলছে—হরিবোল, হরিবোল।

—ভুল শুনেছো! ফজলু সেখ বলল।—আমি স্বকর্ণে শুনেছি, বুড়ি লা ইলাহা ইল্লাল্লা বলছে।

নিবারণ বাগদি রাগী লোক। একসময় দাগি ডাকাত ছিল। চেঁচিয়ে উঠল—মিথ্যে। লাঠিয়াল।

করিম ফরাজি এখন খুব নমাজ পড়ে এবং বান্দা মানুষ। একদা সে ছিল পেশাদার লাঠিয়াল। নিবারণের চ্যাচানি বরদাস্ত করবে কেন সে? আরো চেঁচিয়ে বলল—খবর্দার।

বচসা বেড়ে গেল। তর্কাতর্কি উত্তেজনা হল্লা চলতে থাকল। তারপর দেখা গেল একদল লোক সেই বাঁশের চ্যাংদোলাটি নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। দেখতে-দেখতে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়াল চারদিকে। দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হতে থাকল। আর তারপরই দেখা গেল গ্রাম থেকে অনেক লোক দৌড়ে আসছে। সবার হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

চ্যাংদোলাটা তখন পিচের ওপর। বুড়ির মড়ার দু-পাশে স্পষ্ট দুটো জনতা দাঁড়িয়ে গেছে। দু-দলের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। পরস্পরকে লক্ষ করে গালাগালি চলছে। মাঝে-মাঝে মোল্লাসায়েব চেঁচিয়ে উঠছেন—মোছলেম ভাইসকল! জেহাদ জেহাদ! নারায়ে তকবির—আল্লাহ আকবর।

অন্যদিকে ভটচাজমশাই গর্জে বলছেন—জয় মা কালী। যবন নিধনে অবতীর্ণ হও মা! জয় মা কালী কি জয়।

ধুন্ধুমার গর্জন প্রতিগর্জন এবং দেখা গেল, বিপন্ন আইনরক্ষক বেচারা নীল উর্দিপরা চৌকিদার তার লাঠিটি উঁচিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং দু-পক্ষকেই কিছু বলার চেষ্টা করছে। যখনই মুসলিমপক্ষ এক পা এগিয়ে আসে সে মরীয়া হয়ে লাঠিটা পিচে ঠুকে গর্জায়—সাবধান! আবার হিন্দুপক্ষ এগোলে সে একই ভাবে সেদিকে লাঠি ঠুকে চেঁচায়—খবর্দার!

কতক্ষণ সে এই মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে—সে এবার পর্যায়ক্রমে পাগলের মতন দুদিকে একবার করে পিচে লাঠি ঠুকতে শুরু করল। খট খট খট শব্দে কাঁপতে থাকল।

তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। বুড়ির মড়াটা নড়ছে। নড়তে-নড়তে উঠে বসার চেষ্টা করছে। দু-দিকের সশস্ত্র জনতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। চৌকিদার হাঁ করে দেখছে।

তারপর বুড়ি উঠল। উঠে দু-দিকে তাকাল—ভিড় দুটোকে দেখল। মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। সেই বিকৃত মুখে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠল সে।

চৌকিদার এতক্ষণে মুখ খুলে বলল—বুড়িমা। তুমি মরোনি!

—মর, তুই মর। তোর শতগুষ্টি মরুক।

দু-দিকের ভিড়ও চেঁচিয়ে উঠল—বুড়ি! তুমি মরোনি।

—তোরা মর। তোরা মর মুখপোড়ারা!

—বুড়ি, তুমি হিন্দু না মুসলমান?

বুড়ি খেপে দিয়ে বলল—চোখের মাথা খেয়েছিস মিনষেরা? দেখতে পাচ্ছিস নে? ওরে নরকখেকোরা, ওরে শকুনচোখোরা! আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে? চোখ গেলে দেবো—যা, যা, পালাঃ।

বলে সে নড়বড় করে রাস্তা ধরে চলতে থাকল। ভিড় সরে তাকে পথ দিল। শেষ রোদের আলোয় সে দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল।

এইভাবে বৃদ্ধাকে যেন মুমূর্ষু ভারতবর্ষের এক অমোঘ প্রতীক করে তোলেন গল্পকার।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এই সারল্য আর জটিলতার বিবরণ অন্যভাবে ছড়িয়ে রয়েছে প্রফুল্ল রায়ের *মাসি* গল্পটিতে। দাঙ্গার নৈরাজ্যে তাঁতিবাড়ির যুবতী-বধূকে অপহরণ করেছিল ইয়াছিন শিকদার। নারীমাংসের স্বাদ পেতে লোলুপ ইয়াছিন সেই যুবতীকে নিয়ে তুলেছিল ফজল মাঝির নৌকোয়। ফজল সেই অন্যধর্মী অসহায় যুবতীকে রক্ষা করতে স্বধর্মী ইয়াছিনের বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। এই যুগপৎ রিরংসা আর মানবধর্মের বর্ণনা করেছেন লেখক খুবই মর্মস্পর্শী ভাষায় :

আবার ইয়াছিনের সেই ভয়ংকর গলা আর হাসি শোনা গেল, 'বেশি ঘ্যান ঘ্যান করবি না মাগি, এক্কেবারে শ্যাষই কইরা ফালামু।'

সেই নারীকণ্ঠটি এবার মরিয়ার মতো শোনাল, 'হেই করেন, তাইলে, আমি

বাইচা যাই। আপনে আমার হোয়ামিরে মারছেন।'

'হোয়ামিরে মারছি। পুরান হোয়ামিতে কতদিন আর হোয়াদ থাকে? নয়া হোয়ামি লইয়া অহন ঘর করবি। মন-ম্যাজাজ তাজা অইব।' বলার সঙ্গে-সঙ্গে একটানা অট্টহাসি চলল ইয়াছিনের।

এইবার অমানুষিক গলায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটি। বোরখার আড়ালে এমন একটা আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ কোথায় লুকিয়ে ছিল, ভেবে দিশেহারা হয়ে গেল ফজল।

চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে ত্রস্ত চকিত নারীকণ্ঠটি শোনা গেল, 'আমারে ছুইবেন না, ছুইবেন না। এই আপনের ধর্মের বিচার। এইর লেইগা আগো হাত থিকা আমারে ছিনাইয়া আনছেন? আপনে কইছিলেন না আমারে কইলকাতায় পৌঁছাইয়া দিবেন। আমারে ছুয়েন না—আঃ—'

'ইশ, সতী বেউলা একেবারে! ছুয়েন না!' টেনে-টেনে বলল ইয়াছিন।

তারপরেই ছইয়ের মধ্যে নতুন করে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়ে গেল। নৌকাটা ঢেউয়ের মাথায় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। এত দুলছে, যে-কোন সময় ডুবে যেতে পারে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ফজল। তার আগেই তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটি, 'আমারে বাঁচাও মাঝি, বাঁচাও। আমার সব্বনাশ কইরা ফালাইল।'

সে চিৎকার ফজলের শিরা-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা ফুঁড়ে চেতনায় বিঁধে গেল যেন।

ওপরে অবারিত আকাশ, হু-হু বাতাস, নিচে উথল-পাথল নদী। দুটি সওয়ারি ছাড়া কেউ নেই কোথায়ও। মনের মধ্য থেকে সলিমার স্বপ্নটা অনেক আগেই মুছে গেছে। শিরায়-শিরায় রক্তস্রোতে কী এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল ফজলের। চোখদুটো বাঘের চোখের মতো জ্বলে উঠল। সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন। ভয়ংকর গলায় ফজল চেঁচিয়ে উঠল, মিঞাছাব—

ডাকটা শেষ হবার আগেই হালের বৈঠাটা বাঁ হাতে শক্ত করে চেপে ধরে ডান হাতখানা আড়কাঠের নিচে ধারালো কোঁচের ফলাগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিল সে। আজ সারাটা রাত আবছা আকাশ আর মিটমিটে অগণিত তারার দিকে তাকিয়ে সলিমার স্বপ্ন দেখার সুন্দর একখানা সাধ ছিল তার। কিন্তু কে জানত, সেই সাধটার পাশে এমন একটা কদর্য দুর্যোগ ওত পেতে আছে।

ডাকটা কানে যাওয়ামাত্র ছই খুলে বাইরের পাটাতনে এসে বসল ইয়াছিন শিকদার। সঙ্গে সঙ্গে একরকম ঝাঁপিয়েই বেরিয়ে এল মেয়েটা। নৌকা কাৎ হয়ে ডোরায় জল উঠল। মেয়েটা সেইরকম অমানুষিক স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'আমারে বাঁচাও মাঝি, আমারে বাঁচাও। আমি তাঁতি-বাড়ির বউ। দাঙ্গায় আমার হোয়ামিরে মারছে অরা। আর এই—'

মেয়েটার গলায় অশরীরী একটা আত্মা যেন ভর করেছে। ফজলের স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে স্বরটা শিরশিরিয়ে বসে গেল। হৃৎপিণ্ডের ওপর কী একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল অতর্কিতে। নিজের অজ্ঞাতসারে ফজলের হাতের থাবা থেকে কোঁচটা সাঁ করে ছুটে গেল। অব্যর্থ লক্ষ্য। ইয়াছিন বাধা দেবার আগেই সেটা তার পাঁজরে গেঁথে গেল। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল ইয়াছিন শিকদার, 'ইয়া-অ-আ—'

তারপরেই নৌকার ভার খানিকটা হাল্কা করে ইয়াছিনের শরীর ধলেশ্বরীর খরস্রোতে পাক খেতে-খেতে কোনদিকে মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে কোঁচের ফলাগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে আবার ডোবার তলায় চালান করে দিয়েছে ফজল।

আতঙ্কে শ্বাসনালীটা বোধহয় চেপে চেপে আসছিল মেয়েটার। আঙুল ফেটে ঝি-ঝি করে বুঝি-বা রক্ত ছুটবে। চোখের মণিদুটো হয়তো ঠিকরেই বেরিয়ে আসবে।

শান্ত, যেন কিছু ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে ফজল শুধলো, 'আপনে কই যাইবেন?'

আবছা স্খলিত স্বরে মেয়েটি বলল, 'এইখানে আমার কেউ নাই। দাঙ্গায় সব পলাইছে। হোয়ামি মরছে। কইলকাতায় আমার এক ভাশুর আছে। হেইখানেই যাইতে চাই।'

ফজল আর-কোনো প্রশ্ন করল না। নৌকার গলুইটা শুধু তারপাশা স্টিমারঘাটার দিকে ঘুরিয়ে দিল।

আবার একটানা খরস্রোত, সোঁ-সোঁ ঢেউ, সাঁই-সাঁই বাতাস।

ভোরে পুব আকাশে এক আস্তর ছায়া ছায়া আলোর যখন ছোপ ধরল ঠিক সেইসময় তারপাশা স্টীমারঘাটায় এসে লগি পুঁতল ফজল।

নৌকার পাটাতনে নিস্পন্দের মতো বসে রয়েছে মেয়েটি। মুখের ওপর ভোরের ফুটি-ফুটি আলো এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে·চোখ-দুটো চমকে উঠল ফজলের। চকিতের জন্য মেয়েটির মুখে যেন সলিমার আদল ফুটে বেরুল।

স্টিমারঘাটায় অসংখ্য মানুষের জটলা। যাযাবরের মতো দেশের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে।

একসময় মেয়েটিকে নিয়ে ওপরে টিকিটঘরের দিকে এগিয়ে এল ফজল। বলল, 'ট্যাকা দ্যান, আপনের টিকিট কিনা দিই।'

মাথা নিচু করে মেয়েটি জানাল, তার কাছে টাকা-পয়সা কিছুই নেই।

এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ফজল। তারপরই চকিতে মনে পড়ে গেল, কোমরের গোপন গেঁজেতে যৌবনের সুন্দর স্বপ্ন কিনে আনার মূল্য রয়েছে।

·একটু দ্বিধা করল ফজল। বুকের ভেতরটা একটু দুলে উঠল। তারপরই নিজের প্রাণের দিকে সবলে পিঠ ফিরিয়ে বিরাট জনসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলকাতার

টিকিট কিনে আনল একটা।

গল্পটি কিছুটা অতি-নাটকীয় মনে হলেও, লেখকের সহিতত্ব এবং মানবধর্মের আদর্শ এখানে খুবই গভীর। সর্বোপরি, এ-রকম ঘটনা যে সমস্ত সর্বনাশের পটভূমিকায়ই ঘটে, ঘটতে পারে, তা-ও আমাদের অজানা নয়।

প্রফুল্ল রায় *অনুপ্রবেশ* গল্পটিতেও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েন, দেশবিভাগের নির্মমতার প্রেক্ষিতে, খুবই গভীর করে এঁকেছেন। পূর্ববাংলা-বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই গল্পের বিস্তার। উদ্বাস্তু মুসলমানদের দুর্দশাকে কীভাবে ভোট-রাজনীতির মূলধন করা হয়, তা-ই এই গল্পের প্রতিপাদ্য। ধর্মবান হিন্দুর কাছে মুসলমান অস্পৃশ্য হলেও, তাদের ভোট যে অস্পৃশ্য নয়, তা প্রকট হয়ে পড়ে এই গল্পে :

> *আরো কিছুদিন কেটে যায়। এর মধ্যে সীমান্তের ওপার থেকে আরো কয়েক শ লোক এসে পড়ে।*
>
> *এদিকে নির্বাচনের কারণে এ অঞ্চলের আবহাওয়া ক্রমশ তেতে উঠতে থাকে। তারই ভেতর এক ঝিম-ধরা দুপুরে দুটো লোক এসে ভোটার্স লিস্টে তাদের নাম তুলে নিয়ে যায়। আরো কয়েকদিন বাদে রামবনবাসের সুপারিশে তাদের রেশন কার্ড হয়ে যায়।*
>
> *দিন মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা ভয় আতঙ্ক—সবই ছিল কিন্তু কেউ এসে এতকাল ঝঞ্ঝাট বাধায়নি। কিন্তু ভোটার লিস্টে নাম ওঠা এবং রেশন কার্ড হয়ে যাবার পর একদিন বিকেলে আজীবলালের শ'তিনেক লোক চিৎকার করতে করতে এসে হানা দেয়।*
>
> *'ঘুসপেঠিয়া হিন্দুস্থানসে—'*
>
> *'দফা হো, দফা হো।'*
>
> *'বিদেশী—'*
>
> *'ভারত ছাড়ো, ভারত ছাড়ো।'*
>
> *ঘণ্টাখানেক হল্লা করে লোকগুলো চলে যায়।*
>
> *তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে শওকত আর ফরিদ বারহৌলিতে 'চতুর্বেদী ধাম'-এ চলে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত মুখে সব ঘটনা রামবনবাসকে জানায়।*
>
> *রামবনবাস এতটুকু উত্তেজিত হন না। নিস্পৃহ সুরে বলেন, 'শোর মচানে দো শালে লোগোকো। ভোটার লিস্টে তোমাদের নাম উঠেছে, রেশন কার্ডও হয়ে গেছে। এখন তোমরা ইন্ডিয়ান। কোনো ভুচ্চরের ছোঁয়ার ক্ষমতা নেই তোমাদের চামড়ায় হাত ঠেকায়। চিন্তা মাত করনা। শুধু আমার ভোটের কথাটা মনে রেখো।'*
>
> *'জি। জান গেলেও ভুলব না।'*
>
> *ঘণ্টাখানেক বাদে শওকতের সঙ্গে কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদের সেই*

সৃষ্টিছাড়া বসতিতে ফিরে যেতে যেতে ফরিদের মাথায় সেই ভাবনাটাই বার বার ঘুরে আসতে থাকে। বৃটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানী, তারও পর বাংলাদেশী। চুনাও-এর কারণে চল্লিশ বছর বাদে তারা নতুন আইডেনটিটি পেয়ে যায়। এখন তারা আবার ভারতীয়।

দূরমনস্কের মতো হাঁটতে-হাঁটতে মনে-মনে চুনাওকে হাজার বার সেলাম জানায় ফরিদ।

অনুপ্রবেশ গল্পটিতে বাঙালি মুসলমানের আত্ম-পরিচয়ের সঙ্কট, সংখ্যালঘু হীনম্মন্যতার প্রকাশ ঘটেছে ফরিদ চরিত্রটির মাধ্যমে। স্বভূমি, স্বপরিচয়ের সন্ধানে সে সতত নিরাপত্তার অভাববোধে আক্রান্ত হয়েছে। প্রফুল্ল রায় তার মানসিকতার যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে ফরিদ হয়ে ওঠে গোটা সংখ্যালঘু সমাজেরই এক নিরাশ ও উৎকণ্ঠ প্রতিনিধি। লেখকের বর্ণনায় :

হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ফরিদ। স্কুলে এবং কলেজে খানিকটা ইতিহাস পড়েছে সে। হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের কথা সে বলতে পারবে না। সেইসব সময়ে তাদের বংশেব আদি পুরুষেরা কোথায় ছিল, কী-ই তখন তাদের পরিচয়, সে সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণা নেই ফরিদের। গত দুশো বছরের কথাই সে শুধু বলতে পারে। কয়েক জেনারেশন ধরে তখন তারা বৃটিশ ইন্ডিয়ার প্রজা—ভারতীয় মুসলমান। দেশভাগের পর ঢাকায় গিয়ে তারা হয়ে যায় পাকিস্তানী। তারপর নিশ্চিতভাবে না হলেও বাংলাদেশে থাকার কারণে হয়ত বা বাংলাদেশী। আর এই মুহূর্তে ভোরের ঝাপসা আকাশের তলায় ইন্ডিয়ার মাটির ওপর যখন পা ফেলে এগিয়ে চলেছে তখন তাদের কী আইডেনটিটি, সে জানে না।

ইতিহাসের সেই আদিযুগের দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীদের মতো তারা চলেছে একটি স্বদেশের জন্য, একটি সুনিশ্চিত আইডেনটিটির সন্ধানে। আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা, কে বলবে।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সিদ্ধি অসামান্য। বিভিন্ন-বিষয় গল্পের মধ্যে মুসলমান-জনজীবন, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তাঁর গল্পে প্রায়শই ছায়া ফেলেছে। প্রসঙ্গত আমরা শ্যামলের *তেওট তালে কনসার্ট* নামে গল্পটি মনে করতে পারি। এই গল্পে শ্যামল গণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে এক বিচিত্র-চরিত্র বৃদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন। বরিশালের আদি-বাসিন্দা গণেন্দ্রনাথ বরিশালের গৌরনদী অঞ্চলের ইতিহাস লিখছেন। তাঁর ইতিহাস-জ্ঞান একেবারেই স্বকপোলকল্পিত, ভেদবুদ্ধিতে আবদ্ধ। তাঁর কাছে ইতিহাস 'অতি সরল বস্তু'। তিনি সেই সরল, ভেদজ্ঞানসম্পন্ন ইতিহাস-চেতনায় জানান :

আমরাই গৌরনদীর সাবেক বাসিন্দা। ওরা আসে পরে।

কবে এসেছিল ওরা?

সাজাহান তখন দিল্লিতে মোগল বাদশা—তখন ওরা প্রথম আসে বরিশালে। আসিয়া ওরা ধীরে ধীরে হইয়া গেল সংখ্যাগুরু। মেজরিটি। সেই সুবাদে আমরা এক লাথি খাইয়া অপমানে লাঞ্ছনায় এপারে চলিয়া আসলাম। এই ত আমাদের ইতিহাস। এ এক অন্যায় ইতিহাস।

ইতিহাসের এই অন্যায় তো চিরকালের। ইতিহাস তো এই রকমই গণেনবাবু। যারা মিলেমিশে থাকে তাদের কিছু হয় না।

ওরা ত ইরান তুরানের মানুষ। গৌরনদী ওদের হয় কী করিয়া?

...

বললাম ওরা ইরান তুরানের মানুষ নয়। আমাদের সমাজপতিদের অত্যাচারে অপমানে জেরবার হয়ে আমাদের অনেকেই ওই ধর্ম নেয়। তারাই শেষে গত একশো বছরে মেজরিটি হয়ে উঠেছে।

দেশভাগের ফলে বরিশাল ছেড়ে চলে আসার কারণে গণেন্দ্রনাথ সাধারণভাবে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে পড়েছেন। দেশভাগের কার্যকারণ তলিয়ে ভাবতে পারেননি তিনি। অথচ, বরিশালের প্রতি তাঁর আকর্ষণ থেকেই গিয়েছে। ইতিহাস লেখার ছলে তিনি আটবার গৌরনদীতে গিয়েছেন। মিশেছেন সেখানকার মানুবজনদের সঙ্গে। সেইসব মানুষদের অধিকাংশই মুসলমানদের। স্বভাবত-রক্ষণশীল গণেন্দ্রনাথ গৌরনদীর মুসলমান তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে মেশার সময় ভুলে গিয়েছেন নিজের রক্ষণশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা—মুসলিম-তরুণীকে নিজের হাতে নায়িকা সাজাবার বাসনার কথা অকপটে জানিয়েছেন। শ্যামল এই স্ববিরোধী মানুষটির মাধ্যমে যেন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কেরই স্ববিরোধিতা স্পষ্ট করেন :

...দুর্গাপূজার দিন সকালে বন্ধু মুসলমানরা পান, কাচি, হলুদ, কই মাছ দেখাইত—এ কথা কি জানেন।

মাথা নাড়ি। না জানা ছিল না।

তা জানবেন কেন? আধুনিক হইছেন যে! মহব্বত আলি ফোঁটা কাটিয়া কীর্তন গাইতেন। তখন মুসলমানদের ছিল ভালবাসা। গোঁড়ামি ছিল না। রমেশ দত্ত ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বরিশালে পোস্টিং পান। গ্রাম দেখিয়া বলেন—এক একটি গ্রাম যেন অমরাপুরী। আমরা আর মুসলমানরা মিলিয়া নবান্ন করছি। পাষাণময়ী অপেরার গান ভোলতে পারি না। বৈকুণ্ঠ নট্ট কোম্পানির অধিকারী ছিলেন শশী বাইন। জারিগান গাইত আকবর, মহব্বত আলি, খোরসেদ আলি, মোনাসেখ। ছিল কবিগান, ত্রিনাথের গান। উকিল শিক্ষকরা থিয়েটার করবেন কর্ণ, চাণক্য, আলমগীর, ভাস্কর পণ্ডিত, শিবাজী, প্রফুল্ল। প্রফুল্ল চ্যাটার্জি প্রথম বৈদিক অভিনয়ে নাম করেন। কে যেন প্রফুল্লবাবুকে বলে—আপনি শিশির ভাদুড়ির চেয়েও ভাল। জবাবে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন—নাট্য জগতে শিশিরবাবু ঈশ্বর। ঈশ্বরের কোনো

উপাধি নাই। কত আর বলব। হাডুডুতে এক নম্বর ছিলেন গৌলার দত্তা সেন। তারপর নাম করে আপ্তাজদ্দি মোত্তাজদ্দি। জানেন—নবান্নর উদ্বৃত্ত দিয়া পিঠা হইত। তারে আমরা কইতাম—চন্দ্রকাই। যাত্রার কথা মনে পড়ল। বলি শোনেন—স্ত্রী ভূমিকায় রাখালদাস আর রেবতী দে সবাইরে মাতাইয়া রাখছিল। ১৯২৯-এর কার্তিক। বিশ্বনাথ সাহার বাড়ি। ছবির মত দেখতে পাইতেছি—ধ্রুব পালায় দ্বিতীয়া মহিষী রাখালদাস। প্রথমা মহিষী রেবতী। দ্বিতীয়া মহিষীর নিষ্ঠুরতায় চটিয়া গিয়া দর্শক আবদুল, রহিম হাওলাদার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বললেন—ওই মাগীটারে পিটাও। এই হইল আমার জিলার—গৌরনদীর অভিনয়। প্রেমের অভিনয় করত রাখালদাস নায়িকা সাজিয়া। ফিসফাস কথাবার্তা। অমনি শোনা যাইত—সাইলেন্ট প্লিজ্! পরে কাননদেবীর যোগাযোগ দেখছি কলিকাতায়। সেখানে পায়ে আলতা পরানোর দৃশ্য ভোলা কঠিন। চর গুমরিয়ার পাটের অফিসে নারী চরিত্রে রাখালের অভিনয় দেখিয়া পাট কোম্পানির ইংরেজ সাহেব সাজঘরে আসেন। পরীক্ষা করিয়া দ্যাখেন—রাখাল সত্য সত্যই নারী কি না। এই হইল অভিনয়ের স্ট্যান্ডার্ড। আর একটা কথা বলি। গর্ব করিবার মত বলিয়াই গর্ব করি। নট্ট কোম্পানির কনসার্টে তেওট তাল একবার শুনিলে সারা জীবন বুকের মধ্যে বাজে। আপনি শুনলে আপনারও বাজিত। আমি শুনছিলাম। আমার আজও বাজে।

...

গণেন্দ্রনাথ যেতে যেতে বলল, আপনি আমার 'অসবর্ণ' লেখাটি পড়িয়া চটছেন। মতপার্থক্য হইতেই পারে। এইবার আপনি আমার উপন্যাস পড়েন—মিলন মন্দির—অগ্নিকন্যা—দুই ভাগু। দ্যাখবেন খানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র চরিত্ররা মিলিয়া মিশিয়া ঘোরতেছে। সেটা যে কথাসাহিত্য কিনা। বোঝালেন নি—

এই ভাবেই গল্পের গণেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্ববিরোধিতার এক অনন্য অভিজ্ঞান।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি* গল্পে মুসলমান-সমাজের পরিচয় খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খে বর্ণিত। সাধারণভাবে এই গল্পে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবতারণা নেই। ধনী ও দরিদ্র মুসলমান-চরিত্রই এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু, সুখেন চরিত্রটির নারীলিপ্সার অনুষঙ্গে নিমেষে প্রকট হয়ে পড়ে মুসলমান-সমাজের প্রতি সংখ্যাগুরু-হিন্দুর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি :

দু-চোখ থেকে দুটি লকলকে জিভ বার করে সুখেন্দুবাবু হাসিনার যৌবনময় শরীরটা চাটতে লাগলো। নেশার ঝোঁকে একবার ভাবলো, হ্যাঁ, একটা সরেশ মাল বটে। একে পাওয়া যায় না? কত টাকা লাগবে?

পরক্ষণেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসলো সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেশা কাটাবার চেষ্টা করলো। মনে মনে বললো, ওরে বাবা, মোছলমানের ঘরের মেয়েছেলে, এদিকে নজর দিতে গিয়ে কি শেষে গর্দানটা খোয়াবো? কোথায় কী গোলমাল হয়ে যাবে, তারপর যদি দাঙ্গা-ফাঙ্গা বেধে যায়? কাজ নেই বাবা! গনি চৌধুরী বলেচে এই শীতে লখনৌ বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই ভালো, সেখানে গিয়ে যত খুশী বাঈজী-ফাইজি, তারা একেবারে খানদান মোছলমান, এখানকার কোনো শালা টের পাবে না।

সুনীলের *দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি* গল্পের মতোই *সাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী* গল্পে বিক্ষিপ্তভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তিক্ততা, সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার পরোক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় :

হাজিপুরের হাট ভালো জায়গা নয়। অনেক টাকার লেনদেন হয়, তাই শকুনিদের নজর আছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খটাখটি লাগাবার কিংবা হাঙ্গামা উস্কে দেবার মতন লোকেরও অভাব নেই। দোকানীরা অধিকাংশ হিন্দু হলেও মহাজন মুসলমান। নতুন এমএলএ বিষ্ণু সিকদারের দাপট এখনো যথেষ্ট। এইসব মিলিয়ে এখানে মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় আছে সূক্ষ্ম সুতোর ওপর, যে-কোনো সময় সেটা ছিঁড়ে যেতে পারে।

হাজু তো জোরে হাঁটতে পারে না, সে অবাক চোখে মিছিলটা দেখে। ঠিক যেন একটা মস্তবড়ো দাঁড়ানো সাপের মতন এঁকেবেঁকে। কাছেই একটা বাঁশের সাঁকো, সেই সাঁকো দিয়ে খাল পার হয়ে ওরা ওদিকের মাঠে নামবে। তারপর শুরু হবে লড়াই।

হাজু এর আগে কখন সুলেমানপুরে এসেছিলো, তখন ঐ সাঁকোটা সে দেখেনি। ওটা এর মধ্যে কে বানালো? এই লড়াইয়ের জন্যই বানিয়েছে?

শান্তিপ্রিয় অথবা ভীরু শাজাহান লড়াই-দাঙ্গা থেকে দূরে থাকতেই অভ্যস্থ। পরবর্তী সময়ে পানশালার বাথরুমে সারিবদ্ধ পিঁপড়েদল দেখে গ্রামের বিবদমান মানুষদের সেতু পেরোনোর কথা মনে পড়ে তার। মনে হয়, পিঁপড়েবাহিনী যাচ্ছে কোনও সংগঠিত দাঙ্গা বাধাতে। দেওয়ালে জলরেখার গণ্ডি কেটে সেই পিঁপড়ে-বিবাদ থামাতে চায় সে। সেই অসামান্য প্রতীকের বর্ণনা দেন সুনীল :

পিঁপড়ের সারি এসে থেমে গেলো সেই জলের রেখার কাছে।...হাজু দারুণ অবাক।...সে ফিসফিস করে বললো, সেই ভালো বাপজানেরা, কী দরকার ওদিক পানে যাবার। শুধু শুধু দাঙ্গা-কাজিয়া করে কী লাভ? এদিকেও তো কত জায়গা রয়েছে।

এই নির্বিরোধী হাজুরাই অন্যভাবে উপস্থিত হয় দেবেশ রায়ের *উদ্বাস্তু* গল্পে। ভারতে সংখ্যালঘু হাজুদের যে-সঙ্কট, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু অণিমাদের সঙ্কট, তার চেয়ে আলাদা

কিছু নয়। কেবল সেখানে ভূমিকাটি পাল্টে যায়—এ-দিকের মুসলমান-সংখ্যালঘু ও-দিকে সংখ্যাগুরু হয়ে হিন্দু-সংখ্যালঘুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে। গল্পটি অবশ্য এতটা সরলীকরণ-ভিত্তিক নয়। অস্তিত্বের, আত্মপরিচয়ের সঙ্কটকে দেবেশ এই গল্পে নানা মাত্রায়, প্রেক্ষিতে, অবস্থানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করেছেন। এক সম্ভাবনার বিপরীতে স্থাপন করেছেন ভিন্ন সম্ভাবনা। যেমন :

ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। তার শুরুতেই এনামুল দলবল সহ সান্যাল বাড়িতে চড়াও হয় ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে অণিমাকে তার সঙ্গে বিয়ে না-দিলে সান্যাল বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে হত্যা করা হবে। সান্যাল মশাই এনামুলের বাবা মইনুল হকচৌধুরীকে এ-কথা জানালে তিনি পুলিশকে জানিয়ে দেন যে এনামুল তার দলবল নিয়ে ঐ পাড়ার শান্তিরক্ষা করছে। ফলে পুলিশ ঐ এলাকায় আসে না ও এনামুল ঐ এলাকার একমাত্র কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। একদিন রাত্রি গোটা দশেকের সময় প্রথমে বাড়িতে ভীষণ ঢিল পড়তে থাকে। সান্যাল বাড়ির সবাই দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে। ঘণ্টাখানেক পরে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিতে-দিতে একদল লোক সান্যাল বাড়ি ঘিরে ফ্যালে। এবং বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলে দরজা না-খুললে সেই মুহূর্তে আগুন দেয়া হবে। সেই সময়ই এনামুল এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে—"দরজাটা একবার খুলুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" বাধ্য হয়ে দরজা খুলতে হয়। এনামুল বলে, যদি তারা সপরিবারে হকচৌধুরী পরিবারে আশ্রয় নেয় তবেই একমাত্র বাঁচার সম্ভাবনা। অনন্যোপায় সান্যাল পরিবারকে বাধ্য হয়ে এনামুলদের বাড়িতে এসে উঠতে হয়। সেখানে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁদের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বাঁচতে হয়েছে।

মাঝেমাঝেই এনামুল ঘরে ঢুকত ও সবার সামনেই অণিমাকে বাতাস করতে কী ঘাম মুছিয়ে দিতে বলত। তখন সান্যাল পরিবারের পরিবারত্ব নেই, আত্মরক্ষাই একমাত্র সমস্যা, দেব-মন্দিরের পূজার্থীর যেমন প্রয়োজন শুধু নিজের প্রার্থনা পূরণের। সেজন্য বলিদানের রক্তও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। এবং অণিমার প্রতি এনামুলের এই অশিষ্ট ও অশ্লীল ব্যবহারে এরা প্রত্যেকে আত্মরক্ষার স্বস্তি পেত। যেন অণিমা নামক প্রতিরোধক না-থাকলে ঐ অশিষ্টতা ও অশ্লীলতা হত্যার নেশা হয়ে উঠত, যেন অণিমার শরীরের ওপরকার চামড়া এনামুলকে তার শরীরের ভেতরকার রক্তের প্রতি দৃষ্টি হানবার সময় দেয়নি। যদি ঐ চামড়াটাকে রক্ষা করবার কোনো চেষ্টা করা যেত, তাহলে ভেতরের রক্ত দিয়ে সে চেষ্টার দাম শোধ করতে হতো।

আইনগত অনুসন্ধানের কাজে কাম, লোভ, অত্যাচার, বলাৎকার ইত্যাদি যে-সমস্ত বিষয়ের উৎস ও উদ্দেশ্য থাকা স্বাভাবিক—তাকে যথেষ্ট মূল্য না-দিলে ঘটনার সত্যতা যাচাই হয় না। অণিমার শরীরের প্রতি এনামুলের লোভ স্বীকার

> *না-করলে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। কেন দশ-পনেরোদিন হকচৌধুরী বাড়িতে থাকার পর এনামুল যখন প্রস্তাব দিল অণিমাকে রেখে গেলে সে তাদের ভারত ইউনিয়ানে যাবার ব্যবস্থা করে দেবে, তখন সান্যাল পরিবার সম্মত হলো। দাঙ্গার কয়েকদিন হত্যা করার জন্য ও নিহত হবার ভয়ে মানুষের উল্লাস ও আর্তনাদ, আগুনের নীরব লেলিহানতাকে ঘোষণা করে মানুষের সমবেত কণ্ঠস্বর, সংস্কারগুলোকে খানখান করে ভেঙে ফেলেছিল।*
>
> *অণিমাকে পাকিস্তানে রেখে আসতে হেমচন্দ্র সান্যাল নিশ্চয়ই একবারে সম্মত হন নাই। কিন্তু এতগুলি লোকের প্রাণ নষ্ট আর অণিমার কূল নষ্ট—এর মধ্যে যোগ-বিয়োগ করে তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন কোনটা লাভজনক। এবং তিনি অণিমাকে পাকিস্তানে রেখেই ভারত ইউনিয়নে চলে আসেন।*

এই ভয়াবহ ঘটনাকে বিপরীতভাবেও লেখেন দেবেশ—যেন একটিই ঘটনা বিনির্মিত হয় :

> *...সেই মরণপুরীতে একমাত্র ভরসা ছিল এনামুল। তারই স্রোতে ভেসে এসেছে এই হকচৌধুরী পরিবার। এনামুল সহই কেবল এঁদের বিশ্বাস করা যায়। দিনে চারবার করে দরজা ঠেলে খাবার দিয়ে যেত। এবং সান্যাল পরিবারের জন্য এখানে আলাদা বাসন-কোসনের ব্যবস্থা ছিল না। সর্বক্ষণ চারদিকে হত্যাকারী ও আহতের উল্লাস ও আর্তনাদ আগুনের নিঃশব্দ লেলিহানতাকে ঘোষণা করে মানুষের চীৎকার—এক এক ধাক্কায় সংস্কারগুলোকে খানখান করে ভেঙে দিচ্ছিল; ভূমিকম্প যেমন এক-এক ধাক্কায় পৃথিবীতে কী চিরস্থায়ী তা যাচাই করে নেয়। আর সেই মৃত্যুপরিবৃত অবস্থাতে সবাই বুঝছিল যে অণিমা আর এনামুলের প্রেম সেই তরণী যাতে এই তুফানের দরিয়া পার হবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অণিমা-এনামুলের প্রেম না-থাকলে এ-বাড়িতে সান্যাল পরিবার আসতে পারত না ও সরকারকে এনামুলের বাবা এ-অঞ্চলে শান্তিরক্ষার কাজে বাধ্য করতেন না ও এনামুল শান্তিবাহিনী তৈরি করে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আগুন নেবানো ও আহতের উদ্ধার সাধন করতে যেত না। এগুলো অঙ্কের মতো এত প্রমাণিত ছিল যে সেই অবস্থায় সান্যাল পরিবার আর হকচৌধুরী পরিবার সমবেতভাবে এই ভালোবাসাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিল, ধোঁয়া বা ধুলো থেকে চোখের মণিদুটোকে রক্ষা করার জন্য যেমন আমাদের স্নায়ু অচেতনেই কাজ করে। মুহূর্তে-মুহূর্তে প্রাণগুলি যে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচছিল, তাদের কাছে এ-ছিল আলোর মতো স্বচ্ছ।*
>
> *আর এ-কথা সেদিন সবচাইতে বেশি করে বুঝেছিল অণিমা। আগে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যদি-বা অণিমার সঙ্গে এনামুলের আলাদা দেখা-সাক্ষাৎ হতো, দাঙ্গার অবস্থায় তার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। দিন-রাতে এনামুল তিন-চারবার মাত্র এদের ঘরে ঢুকত।*

স্নেহ প্রেম ইত্যাদি প্রমাণ করা অসুবিধাজনক ঘটনাগুলিকে আইনগত অনুসন্ধানের কাজে সাক্ষ্য হিশাবে উপস্থিত করা সমীচীন না হলেও, এনামুলের সঙ্গে অণিমার অবিচ্ছিন্ন দেখা-সাক্ষাৎ না-হওয়া অথচ বাইরের ঘোরাঘুরির পর পরিশ্রান্ত এনামুল যখন ও-ঘরে ঢুকত তখন ঘাম মুছবার জন্য গামছাটা বা হাওয়া খাবার জন্য পাখাটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অণিমার এগিয়ে দেওয়া প্রমাণ করে যে, যদি এনামুলের প্রতি অণিমার প্রেম পরিণতিমুখী হয়েই থাকে তবে তা নিশ্চয়ই এই সময়, আর কোনো সময়েই নয়। কারণ সংস্কারগুলো তখন খানখান হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল আর সেই মৃত্যুপরিকীর্ণ অবস্থায় সান্যাল পরিবারের অতগুলি লোকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডধ্বনি অণিমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে তার প্রতি এনামুলের ভালোবাসার শক্তি দর্শাচ্ছিল। নইলে পনেরো-বিশদিনের অনবরত চেষ্টায় যখন মইনুল হকচৌধুরী সান্যাল পরিবারের ভারত ইউনিয়নে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তখন অণিমা ভারতে যেতে অস্বীকৃত হলো কেন।

দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের নানা দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বের এই বিপরীতমুখী বিচারের মাধ্যমে দেবেশ রায় একটি সত্যের অভিমুখে পৌঁছতে চেয়েছেন যে, সব সব গৃহীত সত্যের ভিতরে থাকে কোনও-না-কোনও মিথ্যা, আর মিথ্যার ভিতরেও নিহিত থাকে কোনও ন্যূনতম সত্য।

দিব্যেন্দু পালিতের (১৯৩৯) *আলমের নিজের বাড়ি* ও *হিন্দু* গল্পদুটি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। প্রথম গল্পে আলম ও রাকার আবাল্য সম্পর্ক, প্রেম ও পরিণতির ব্যর্থতা যেমন গভীর বেদনাবাহী হয়ে ওঠে ; তেমনই *হিন্দু* গল্পটির অন্তিমে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ পাঠকের বড় প্রাপ্তি হয়ে ওঠে।

প্রথম গল্পে ঢাকা-কলকাতার পঁয়তাল্লিশ মিনিটের উড়ান-দূরত্ব পেরোতে তিনবছর কেটে যায় আলমের। রাকার সঙ্গে তার সম্পর্কের মাঝখানে রয়েছে রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্মের বাধা। অবশেষে মৈত্রীর সেমিনারের সুযোগে আলম ফিরছে কলকাতায় তার একদা-নিজস্ব বাড়িতে, যে-বাড়িটি আলমের বাবার থেকে কিনেছিলেন রাকার বাবা। আলমের বাবা বাড়ি বিক্রি করে চলে গিয়েছিলেন ঢাকায়। কলকাতা তাঁকে ধরে রাখেনি। ঢাকা থেকে একইভাবে সত্তরে কলকাতায় এসেছিলেন রাকার বাবা অনন্তশেখর। বাড়ি বদলে গিয়েছিল দুই পরিবারের—বদলেছিল দেশ, প্রতিবেশী, আকাশ, বাতাস। সেই পরিবর্তনের আগে :

ফাঁকা চেম্বারে কম্পাউন্ডার সাহেবকে সামনে বসিয়ে (আলমের বাবা) *বোঝাতেন অনেক তত্ত্ব। পার্টিশন হয়েছে দু'ভাবে। এক রাজনৈতিক, আর এক মানসিক। দ্বিতীয়টায় মাউন্টব্যাটেন সই করেনি। আগে একই স্টেথসকোপ লাগাতাম রাম আর জামালের বুকে। সেদিন আর নেই। আমার পেশেন্টদের মধ্যে এখন রাম নেই, রহিম আছে; যদু নেই, জামাল আছে ; কানাই নেই ; করিম আছে। রাম,*

যদু, কানাইরা সব চলে গেল ডাক্তার গুপ্তর কাছে। একই কলেজের এমবি দুজনে, একই মানুষের অ্যানাটমি শিখেছি। কাটা-ছেঁড়া সেই মানুষের গায়ে নামের লেবেল ছিল না।

প্রেমে এই 'লেবেল' অস্বীকার করেছিল আলম ও রাকা। দীর্ঘ অসাক্ষাতে সীমান্ত পেরিয়ে দু-জনের চিঠি আসত, যেত। শব্দ দিয়ে দু-জন দু-জনকে ছুঁয়ে থেকেছে দীর্ঘ তিনবছর। রাকাই যেন শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছিল আলমের নিজের বাড়ি, ইট-কাঠ-কংক্রিটের বাড়ির সমার্থক, পরিপূরক, কোমল। সেই আক্ষরিক ও মানসিক বাড়িতে ফিরে আলমের সামনে শেষপর্যন্ত উন্মোচিত হল নতুন সত্য—বাধা ও বিচ্ছেদের ধর্ম ও সত্যের। রাকা আলমকে লিখল শেষ চিঠি :

আমার ব্যাপারে তুমি যতোটা, তোমার ব্যাপারে—আমার ধারণা ছিল, আমিও ঠিক ততোটাই। তোমার শেষ চিঠিটা পেয়ে যখন মানে বুঝলাম, তখনই ওলট-পালট হয়ে গেল সব। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখলাম, তোমাকে আসতে লিখেছিলাম তুমি আসতে পারবে না জেনেই। তোমার উদ্দেশ্য তো তা নয়—তুমি আমাকে উপড়ে নিয়ে যেতে চাও। তোমার কাছে আমি কতো যে কৃতজ্ঞ। কিন্তু, আলম, সে-মনের জোর আমারই নেই। কী একটা বাধা আছে—কী একটা লাগছে কোথায়। সেটা যে কী বুঝিয়ে বলতে পারব না। এই বাধার দেয়ালটা ভাঙবার মতো জোর যখন পাচ্ছি না, তখন দেয়ালটা আরো উঁচু করবার দরকার কি। এই বাধাটার জন্যেই তোমার আমার ঠিকানা বদল হয়ে গেল, আমাদের আগে আরো অনেকের হয়েছে। বাধাটা না থাকলে হয়তো কোনোদিনই পরিচয়ের সুযোগ হতো না আমাদের—এই অক্ষরের পর অক্ষর সাজানো ভালোবাসাও দরকার হতো না। তোমার মতো একজন সৎ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলতে পারতাম না জেনেই পালিয়ে যাচ্ছি। এই চিঠির ভাষাটাও একটু রোমান্টিক লাগতে পারে—তারও কারণ হয়তো এই যে তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি। পালিয়ে যাচ্ছি, তার কারণ তোমার ভালোবাসাটা আরো খাঁটি। যে-কষ্ট তোমার হবে, আমার তা হবে না। যদি পারো ক্ষমা করো। যদি পারো খোঁজখবর নিও। যদি চিঠি দাও জবাব দেবো। তাছাড়া মিথ্যে জেনেও তো আমরা অনেক বিষয়কে সত্য করে জিইয়ে রাখতে ভালোবাসি। বাসি না?

যেন, সম্পর্কের ভিতর ছড়িয়ে পড়ল অদৃশ্য দাঙ্গার আগুন, বিচ্ছেদ। পাঠকের সামনে ঘনীভূত হল এক অনন্ত বিষাদ।

দিব্যেন্দুর *হিন্দু* গল্পটি অন্য সময়, অন্য প্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিস্তার ও সঙ্কীর্ণতা বর্ণনা করে :

'কেয়া বাত হ্যায়। জানকীনাথজি আপ? ইতনা সুবহ।'

গঙ্গাজলের পাত্রটি মথুরানাথের হাত থেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল বিন্দিয়া।

'জি। আনাহি পড়া।' জানকীনাথ তাকালেন বিপিনের দিকে, 'তুম বোলো বিপিন। আপ বৈঠিয়ে না, পণ্ডিতজি!'

মথুরানাথ বসলেন না। সন্দেহের চোখে তাকালেন বিপিনের দিকে।

'বাবুজি—', ইতস্তত করে বলল বিপিন, 'উয়ো আদমিকো আভি হটানা হোগা ঘরসে—'

'কিউ।'

'কারণ, উয়ো মুসলমান হ্যায়।'

স্তম্ভিত চোখে বিপিনের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকলেন মথুরানাথ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া উয়ো হোঁস মে আয়া হ্যায়?'

'জি নেহি।' জানকীনাথ বলল, 'লেকিন সারে ওর লোক এইসে হি কহ রহা হ্যায়। উয়ো নাঙ্গা থা—বদনমে পহচান ভি থা—'

মথুরানাথের মুখে কথা ফুটল না।

'ইয়ে সচ হ্যায়, বাবুজি।' বিপিন বলল, 'কাল রাত দয়ারাম বোলা থা হমকো—বেহুঁস মে উয়ো মরিজ "হায় আল্লা" বোলা—'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সচেতন হলেন মথুরানাথ।

'ঠিক হ্যায়। লেকিন—উয়ো এক বেহুঁস মনুষ্য ভি তো হ্যায়। আভি আরাম হোনে দেও, ফির চলা যায়গা। মেরা ধরম এইসে হি কহতা হ্যায়।'

'আপকা ধরম আপহি কো রহনে দিজিয়ে, পণ্ডিতজি।' কঠিন গলায় এবার বলল জানকীনাথ, 'সিচুয়েশন কুছ খারাপ লাগতা হ্যায়। কেয়া আপ রামপুরকে নেহি জানতে হেঁ। কেয়া আপ চাহতে হেঁ কি ইধর হামলা শুরু হো যায়—ফির এক রায়ট লাগে?'

তখন স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

জানকীনাথ বলল, 'উয়ো মরিজকো বন্দোবস্ত ম্যায় হি করুঙ্গা আপকো কোই হানি নেহি হোগা। আপ আরাম কিজিয়ে, পূজাপাঠ কিজিয়ে। ইয়ে ছোটিসি বাত হ্যায়।'

সম্ভবত তা-ই। সামান্য ঘটনা এটা। তবু বড় একটা নিঃশ্বাস সংবরণ করলেন মথুরানাথ। অদ্ভুত শারীরিক অস্বস্তিতে ঘোর লাগল তাঁর। কান গরম, জ্বালা করে উঠল চোখের কোণদুটো। নামাবলীর ভিতর দিয়ে পৈতে স্পর্শ করে শিথিল ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন তিনি, 'হে রাম! হে কৃষ্ণ।'

এই বিভেদের, এই অস্পৃশ্যতার ধর্ম সহনীয় হয়নি প্রকৃত ধার্মিক মথুরানাথের কাছে। তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন ধর্মান্ধ সমাজ বিশ্বাস করল '*প্রকৃত হিন্দু*' মানুষটির '*ধর্মাচরণে ভুল ভুল ছিল না এতটুকু। গঙ্গাই আশ্রয় দিয়েছে তাঁকে।*' তখন পীরপুর ঘাটের নাম পাল্টে দিল তারা, মথুরানাথের নামে ঘাটের নাম রাখা হল। নিচে লেখা হল : '*কেবল*

হিন্দুয়ো কে লিয়ে! গল্পটিতে মানবতা আর অমানবিকতার, মানবধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতার আশ্চর্য সহাবস্থান ঘটিয়েছেন লেখক।

সাম্প্রদায়িকতা আর সম্মিলনের অজস্র গল্প লিখেছেন আবুল বাশার। সমকালে বাংলা কথাসাহিত্যে তিনিই সবিশেষ ভাবিত হয়েছেন বিষয়টি নিয়ে। তাঁর *একই বৃন্তে* গল্পসংগ্রহটিতে এইসব গল্পগুলি সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলনটির ভূমিকায় প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন :

> *লেখক হিসাবে বাশারের মিলন প্রত্যাশা সর্বস্পর্শী, বিচিত্র এবং বহু মাত্রার সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে লিখতে হয় মানুষের গল্প, তাই ফাঁকি চলে না। বেরিয়ে আসে নানারকম ক্ষত আর চটার দাগ। তার গল্পে দেশকাল ঘনিয়ে আসে। বোঝে সে, অসহায় দীর্ঘশ্বাসে যে, মিলনই সবচেয়ে অলীক। বিশেষত কুরাষ্ট্রে এবং ভ্রান্ত ধর্মধারণায়। তার আবার লড়াই শুরু হয়। শঙ্কিত তবু সুনিশ্চিত সেই লড়াই। তার গল্পে তাই আসে মোল্লাতন্ত্রের সঙ্গে মুক্তমন মুসলমান জীবনের লড়াই, শরীয়তের সঙ্গে মায়ফতী সাধক সাধিকার লড়াই, হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি বজায় রাখার লড়াই। হিন্দু-মুসলমান, শিয়া-সুন্নীর করুণ অন্তর্বিরোধ সে লক্ষ্য করে এবং বুঝতে পারে রাজনৈতিক মানুষরা সব বাতি নিবিয়ে পথে কাঁটা ছড়িয়ে যাচ্ছে।*
>
> ..
>
> *গল্পগুলি সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এই কথাটুকু বললেই বোধহয় সবটা বলা হয় না। বাশার আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'মানুষের ধর্ম ভাল। ধর্মবুদ্ধি খারাপ। বোধ আর বুদ্ধি তো এককথা নয়। বোধের মধ্যে থাকে মায়া, বুদ্ধিতে থাকে যুক্তির আস্ফালন।'*

এই কেন্দ্রীয় ভাবনাই আবর্তিত হয়েছে আবুল বাশারের সঙ্কলনভুক্ত *চন্দ্রদীপ, জন্মান্তর, দুই অক্ষরের গল্প, চোত পবনের কেচ্ছা, অন্য নকসি, বড় জোর দুই মাইল, নিশি কাজল, কাসীদ, কান্নার কল* ইত্যাদি গল্পে। সম্প্রীতি, বিভেদ, সম্প্রদায়ের-ভিতর-সম্প্রদায়, সম্পর্ক, সম্পর্কচ্যুতি, একাকিত্ব, যূথবদ্ধতা, প্রেম, চক্রান্ত, প্রকৃতি ও রক্তপাত বাশারের গল্পগুলিতে অন্য মাত্রা বিস্তার করে। প্রকৃতপক্ষে, সমকালে বাশার ছাড়া আর অন্য-কোনও লেখক এই বিষয়টিকে এতখানি গুরুত্ব দেননি। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তাঁর উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, আমরা দেখেছি। সম্ভবত, তথাকথিত সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে সম্প্রদায়গত সঙ্কটের স্বরূপ ও অভিঘাতটি তিনি সমকালীন 'হিন্দু' লেখকদের তুলনায় বেশি অনুভব করেছেন। সর্বোপরি, দুই সমান্তরাল সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অন্যদের চেয়ে বেশি। ফলে, সে-সব উপাদান ও অভিজ্ঞতাকে তিনি যে সাহিত্যে রূপ দেবেন অনন্য গভীরতায়, তা খুবই স্বাভাবিক।

সে-জন্যই *নিশিকাজল* গল্পের পিসির মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হারাবার হাহাকার ফুটিয়ে তুলতে পারেন অকপট বিশ্বাসযোগ্যতায়। পিসি বলেন : '*জীবনের অভ্যাস কী*

অদ্ভুত দ্যাখ। ভুল হয়ে যাচ্ছেরে। আজান পড়বে, প্রদীপ ছোঁয়াব। তাই না? ভুল তো হবেই। ছন্দটা যে হারিয়ে যাচ্ছে রে। সুরটা যে কেটে গেল বাছা!"

এই সুর-ছন্দ কাটার প্রসঙ্গটি ফিরে আসে *জন্মান্তর* গল্পে, যেখানে হিন্দু সুধারানির মন্দির মেরামত করে যে-মুসলমান যুগীন, সে দাঙ্গার পরে আর সেই কাজ করতে পারে না। কেননা, *'সমাজে নাকি কথা উঠেছে মুসলমানকে দিয়ে দেবী-ঘর বানানো অশুচিতা।'* কিন্তু, এই বিচ্ছেদে শেষ হয় না বাশারের পরিক্রমা। মুসলমান-শ্রমিক যুগীন সুধারানীর *'মিঠেলি খয়রা' 'সোলেমানি চোখ'* আবিষ্কার করে।

দুই অক্ষরের গল্প একইভাবে বিবৃত করে নাজিয়া-উৎপলের প্রেম, *চোত পবনের কেচ্ছা*-য় বিবদমান দুই পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে নিজেদের ভুল, *চন্দ্রদীপ* গল্পে *'জাতিধর্মগোত্রহীন মানুষ'*-এর পরিচয় উদঘাটিত হয়। সব মিলে বাশারের গল্প হয়ে ওঠে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এক জটিল ও গভীর অভিজ্ঞান।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর (১৯৫২) *দীন-ইলাহি* গল্পে নুরুল-স্বাতীর প্রেমও সমাজ, রাষ্ট্রের কোপে ও বিদ্রূপের মুখোমুখি হয়। এই প্রেমময় দম্পতি কেবল নুরুলের মুসলিম-নাম-পরিচয়ের কারণে হিন্দু-পাড়ায় অবাঞ্ছিত হয়ে থাকে, ঘর পায় না। তাদের সামাজিক বিপন্নতার ছবি আঁকা হয় এই গল্পে :

> *স্বাতী লাইব্রেরি কার্ড বের করেছিল, নুরুল আইডেনটিটি কার্ড। নুরুলের কার্ডটা দেখে ও সি বলল—নুরুল আলম? গভমেন্ট সার্ভিস। ছিঃ একটা হিন্দু মেয়ের সর্বনাশ করছেন? সাসপেন্ড হয়ে যাবেন।*
>
> *নুরুল বলল, আমরা ম্যারেড।*
>
> *—বললেই হলো?*
>
> *—আমাদের সার্টিফিকেট আছে, রেজিস্ট্রির।*
>
> *—কোথায় দেখি?*
>
> *—সঙ্গে-সঙ্গে কেউ রাখে? ঘরে আছে।*
>
> *—কাল দেখিয়ে যাবেন, এখন যা আছে রেখে যান।*
>
> *—যাবার ভাড়ার জন্য দুটো টাকা রাখি, অ্যাঁ?*
>
> *[তোমরা তো আচ্ছা বুদ্ধু, যাও না, কড়েয়া, রাজাবাজারে, পার্কসার্কাস, খিদিরপুরের দিকে। ওদিকে তো তোমার জাতভায়েরা থাকে। মিডল ইস্টের টাকায় মসজিদ উঠছে সব—]*
>
> *সেদিন অফিসে চুপচাপ কাজ করছিল নরুল। বনানীদি শাড়ি খশখশ করে খেজুর করছে। নতুন শাড়ি পরে এলেই পাবলিক রিলেশন বেড়ে যায় ওঁর। কেউ বলল খুব ভালো দেখাচ্ছে, কেউ বলল, বয়েসটা তোর দশ বছর কমে গেছে রে। মাধুরীদি একটু ঠোঁটকাটা। বলল, ইস কী ক্যাটকেটে, মুসলমান-মুসলমান রং, তখনি এই রে বলেই জিভ কাটল। একটু পরেই মাধুরীদি বলল, কী ভাই, বাড়িটাড়ি পেলে?*

ওঁর কী দোষ? স্বাতীও তো বলে। নুরুল একবার বলেছিল এইসব জায়গায় আমরা ঘর ভাড়া পাবো না, চল আমরা পার্কসার্কাস, কড়েয়া, খিদিরপুরের দিকে চেষ্টা করি। স্বাতী বলেছিল ঐ-সব জায়গায় কীরকম মুসলমান-মুসলমান গন্ধ। নুরুল একবার স্বাতীকে নিয়ে গিয়েছিল ওর এক দাদার বাড়ি। ওর বাবার জেঠিমা হন তিনি। নিজেদের বাড়ি। বুড়ি তো স্বাতীকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করল। নুরুলকে বলল, অ্যাদ্দিনে দাদিকে মনে পড়ল, শুনেছি বিয়ে করেছিস, ইজাব-কবুল করেছিলি তো বাবা? নুরুল বলল, দেশে গিয়ে করে নেবো দাদি। বুড়ি বলল, সেটা তো জায়েজ হবে না বাবা, ইজাব, কবুল, ওলী, খোৎবা ছাড়া মুসলমানের বিয়ে হয় না ধন। তোর জ্যাঠা খুব দুঃখ করছিল, তুই রোজা রাখিস না, নামাজও পড়িস না, আখেরে খারাপ হবে ধন। এখন তোমরা মিশছ—মেশো, কথাবার্তা কও, কিন্তু খোৎবা না-পড়ে স্বামীস্তিরির ঐ কাজটা কোরোনি বাপ, ওটা হারাম...

তখন ঐ বাড়ির তিন ভাড়াটের রান্নার ফোড়ন। পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ তো পৃথিবীময় একরকম, বৌদ্ধদেরও খেতে দেখেছে দার্জিলিং-এ। বীফও। তবে মুসলমানী গন্ধটা, যেটা স্বাতী বলেছিল, সেটা ঠিক কী তা স্বাতীও বলতে পারেনি, তবে নুরুলের নিজেরও এইসব এলাকা ভালো লাগে না। অনেক কারণ। যেমন হয়তো হঠাৎ দরকার পড়ল গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ডটা, পাশের বাড়ি খোঁজ করে পাওয়া যাবে খিদিরপুরে? রাজাবাজারের মুসলিম পাড়ায়? তাছাড়া ঐ সব অঞ্চলেই কি আর ফাঁকা ঘর আছে? ঘরের ভিতর ঘর হচ্ছে, বারান্দায় পার্টিশন, সংসার বাড়ছে, যাবে কোথায়? তার উপরে আবার বাইরের লোক? দাদিমাকে বললে হয়তো টেম্পোরারি থাকতে দিত, দোতলায় তিনটে ঘর। তার আগে খোৎবা পড়তে হবে, ইজাব-কবুল, দোয়া দরুদ, এটা ফরজ, ওটা ছোন্নত...ভাবা যায়?

পরে, ঘটনাচক্রে, নুরুল বাধ্যত নাম পাল্টে 'নারায়ণ' হয়। কিন্তু সেখানেও জটিলতা গ্রাস করে তাকে, রক্তপাত হয়, গল্পটি পৌঁছয় এক মর্মান্তিক পরিণতিতে :

সেদিন সরস্বতী পুজো। বাড়িওলি স্বাতীকে বলেছে সকাল সকাল স্নান সেরে নিয়ো। ঠাকুরমশাই প্রথমেই আমাদের পুজোটা সেরে দেবে। বাড়িওলার ছেলেটা, যে নুরুলদের ছাত্র, স্বাতীর গ্লাডস্টোনের বইটা নিয়ে গেল, কারণ ঐটাই সবচেয়ে মোটা। স্বাতী এলোচুলে। নুরুলের মনে পড়ে কলেজলাইফে, যখন হস্টেলের কালচারাল সেক্রেটারি ছিল। হস্টেলের সরস্বতী পুজো। সারারাত জেগে রঙিন কাগজের শিকল বানানো, খিঁচুড়ি আর বাঁধাকপি। ঠাকুরমশাই পুজো করার সময় জিজ্ঞাসা করলেন কার নামে সংকল্প বাক্য পড়া হবে? অমিতাভ বললে—কেন, আমাদের সেক্রেটারির নামে।

—সেক্রেটারির নাম কী?

—নুরুল আলম।

ঠাকুরমশাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে—কী বললে?

অমিতাভ বলে—বলছি তো নুরুল আলম।

—গোত্র?

নুরুল বলেছিল, মনুষ্য গোত্র...

—নারায়ণবাবু, আসুন, অঞ্জলি দিয়ে যান। বাড়িওলা ডাকছে।

সকালবেলায় অফিসে পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে হয়েছিল, সেটাই বোধহয় ভলো হত।

বলো—ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিতং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত...

নুরুলের দুই হাতের তালুতে নিষ্পাপ ফুল পাপড়িগুলি দলিত, মথিত হতে থাকে...

[আর পড়া যায় না।—লাস্টে কি আছে?]

একটু দূরে আর একপাটি চটি খুঁজে পেল স্বাতী। নুরুল তখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নুরুল তখনও বুঝতে পারছিল কে মুছিয়ে দিল ঠোঁটের কোণের রক্ত, কার হাত পিঠের উপর ঘুরছে।

'আর ভয় নেই। আমরা এবার যাই, দিদি। আর কিছু হলে আমাদের জানাবেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমরা রক্ষা করবোই'—পার্টির ছেলেরা বলে গেল।

কার হাত পিঠের উপর ঘুরছে, নুরুল জানে। তবু কেন দরজা-জানলা-চৌকাঠের গলায় ফিসফাস শুনতে পায় নুরুল—মিথ্যেবাদীটা নারায়ণ নামে এসেছিল, আসলে নুরুল।

নুরুল বিড়বিড় করে—আমি তো একই, আমি তো সেই একই, শুধু নামটা...

ইমদাদুল হক মিলনের (১৯৫৫) গল্প-সংকলন *দেশভাগের পর* (১৯৯৮) হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রবহমানতায় এক অনবদ্য সংযোজন। রাজনীতি কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে একই দেশভূমির মাঝখানে। রাজনীতির চালে জন্মভূমি, ভিটেমাটি, কর্ষণমৃত্তিকা ছেড়ে কাঁটাতারের এপারে চলে আসতে হয়েছে অসহায় মানুষকে। কিন্তু, সেইসব উদ্বাস্তু মানুষের স্মৃতি হারানো মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে আজীবন আলোড়িত হয়েছে। সংকলনভুক্ত এগারোটি গল্পেই ছড়িয়ে গিয়েছে হাহাকারের সুর, মর্মস্পর্শী ভালবাসার আকুতি, আবেগ।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা প্রায়শই এই দেশভাঙার রাজনীতি প্রত্যক্ষ করেছি। নিরাশ্রয় ইহুদি আর উদ্বাস্তু বাঙালি এ-ক্ষেত্রে একসূত্রে বাঁধা। মিলন তাঁর গল্পে ওই হিংস্র, ষড়যন্ত্রী ভাঙনের পাশে রেখেছেন অকৃত্রিম ভালবাসা। যেন, কাঁটাতারের উপর স্থাপন করেছেন মিলন-উন্মুখ প্রজাপতি। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই এই সংকলনের গল্প-চরিত্র পবন ঠাকুর, নিতাইচরণ, উমাচরণ, গগনবাবু, সোনা দাস, মণীন্দ্র ঠাকুর, শ্রীনাথ,

বিরু, লতিফ, সনাতনী, পাচি, রুহি, কমললতা, প্রতিমা, শাহিন, কুসুমরা বারবার ভালবাসার অকূল টান অনুভব করেছে। যেন, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে অগ্রাহ্য করে উজ্জীবিত হতে চেয়েছে কূলপ্লাবী ভালবাসায়।

এপার বাংলার হিন্দু-লেখকরা যে-ভাবে মুসলমান-সংখ্যালঘুর প্রতি আন্তরিকতা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের কথাসাহিত্যে, তেমনই ওপার বাংলার লেখকরা সহমর্মিতা অনুভব করেছেন সংখ্যালঘু হিন্দুর প্রতি। তসলিমা নাসরিনের উপন্যাসে যেমন আমরা এই প্রবণতা লক্ষ করেছি, ইমদাদুল হক মিলনের গল্পেও রয়েছে সেই অমোঘ সমবেদনা। হিন্দু-মুসলমান চরিত্রের সহাবস্থানে তা গভীরতা-সঞ্চারী হয়েছে। যেমন সংকলনের *মেয়েটির কোনও অপরাধ ছিল না* গল্পে :

> *চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছিল কুসুমের, বুক ভেসে যাচ্ছিল। উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে, চাঁদের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর মুখের উপর উপুড় করেছিল কীটনাশকের শিশি। সেই তরল আগুন বুক পুড়িয়ে থেমে যায় কুসুমের। মুহূর্তে ঝাপসা করে ফেলে চোখের দৃষ্টি। আস্তেধীরে উঠোনের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কুসুম। চাঁদের আলোয় নাকের ফুলখানা জ্বলজ্বল করে তার। জড়িয়ে-আসা ঝাপসা চোখে কুসুম তবু দেখতে পায়, আশ্চর্য সুন্দর একখানা নদী বয়ে যায়। নদীতীর অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃক্ষ। বৃক্ষতলায় অপেক্ষার কষ্ট বুকে নিয়ে বসে আছে এক দুরন্ত প্রেমিক। সে কোনও শাসন মানে না, ধর্ম মানে না।*

আমরা বুঝি, ধর্ম-না-মানা ওই প্রেমিক ও তার প্রেমই কেবল সত্য, চিরন্তন, শাশ্বত। আমরা বুঝি, সাম্প্রদায়িক রক্তপাত যেমন সত্য, ভালবাসার করস্পর্শও কিছু মিথ্যা নয়। বোঝা যায়, নির্বিকার, নির্বিচার, নিরর্থক রক্তপাতের মধ্যে সাহিত্য সেই করস্পর্শ, অমোঘ ও শেষ সত্য। বাংলা কথাসাহিত্য সেই সহিতত্ত্বের কথা বলেছে একেবারে সূচনালগ্ন থেকে। সময়কে অবলম্বন করেও সাহিত্য সততই দেশ-কালের উর্ধ্বে এক চিরন্তন মানবতার গান গায়। বাংলা কথাসাহিত্যও যে সেই বন্দনাগান থেকে কখনও বিরত থাকেনি—আমরা তা লক্ষ করেছি এক পরিব্যাপ্ত সময়সীমায়। দেখেছি, সময়, সমাজ, মানুষের বিবিধ অভিঘাত, প্রবণতা। সমকালীন রক্তপাতের পাশে, এই মিলন-সাহিত্যই আমাদের প্রাণিত করতে পারে এক স্বপ্ন-ভবিষ্যতের দিকে।